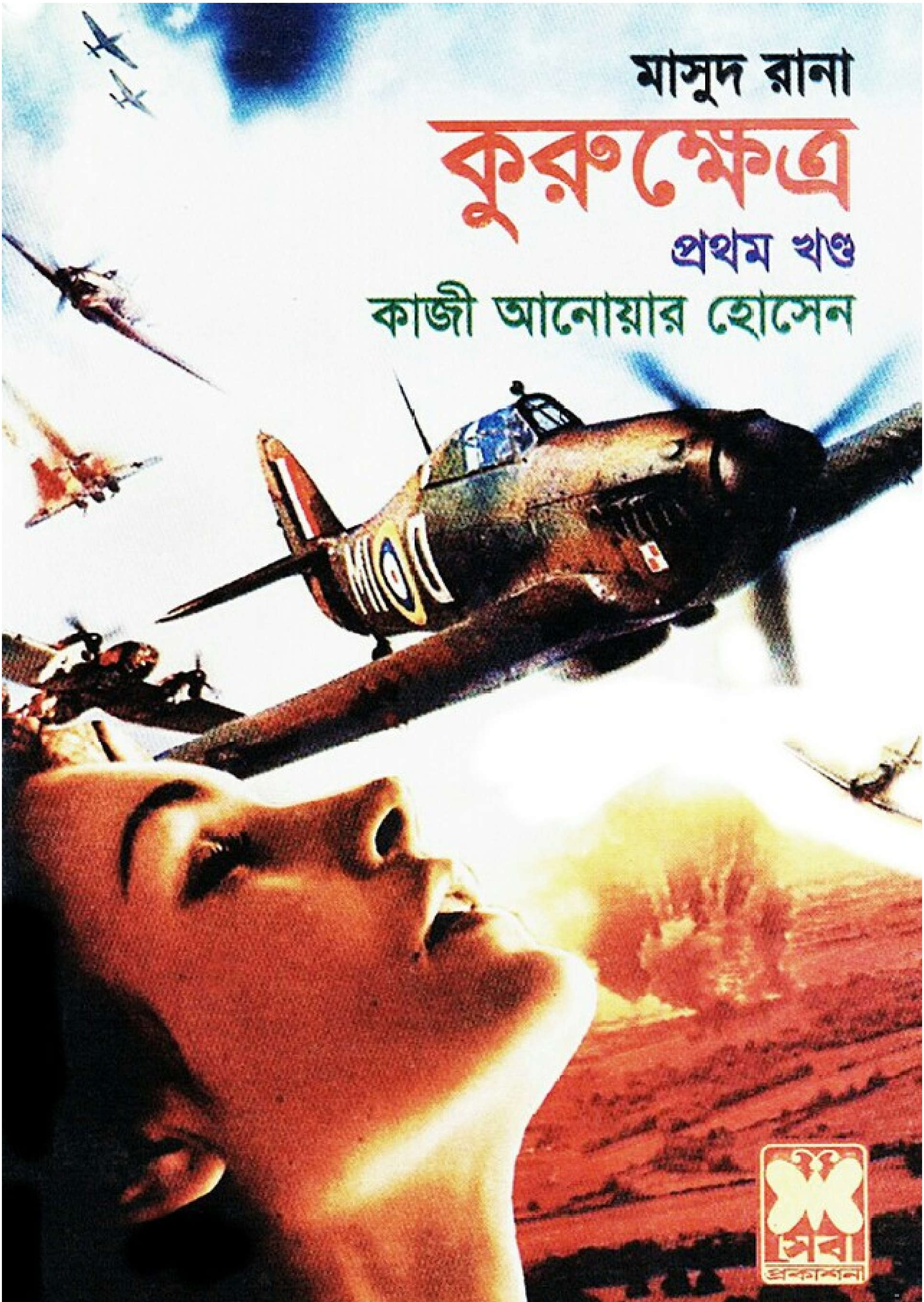
মাসুদ রানা
কুরুক্ষেত্র
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্রেঞ্চ আল্পস পর্বতমালার জমাট বরফের ভিতর
পাওয়া গেল একশো বছরের পুরনো এক লাশ,
কাছেই বরফশীতল হ্রদের গভীরে ডুবে আছে
একটি পুরনো বিমান। কারা যেন উঠেপড়ে লেগেছে
ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য।
ওদিকে মহামারীর মত আটলান্টিকের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে
এক ভয়ঙ্কর শৈবাল, স্কটিশ দ্বীপপুঞ্জে
তাণ্ডব শুরু করেছে হিংস্র একদল পিশাচ!
সবকিছুই একসূত্রে গাঁথা।
ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেল মাসুদ রানা।
পর্দার অন্তরালে থাকা অসম্ভব ক্ষমতাশালী
শত্রুর বিরুদ্ধে নামতে হলো অসম লড়াইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪০৬

কুরুক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7406-8

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

এক

আগস্ট, ১৯১৪। ফ্রেঞ্চ আল্পস্ পর্বতমালা।

বরফের মুকুট পরা রাজসিক পাহাড়গুলোর মাথার উপর মস্ত এক চাঁদোয়া হয়ে ঝুলছে সুনীল আকাশ। আর সেখানেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য যুঝছে থিয়োডর বুভারি। কয়েক মিনিট আগে বাতাসের এক অদৃশ্য দেয়ালে আচমকা ধাক্কা খেয়েছে তার বিমান, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠেছে গোটা ফিউজলাজ। ভয়ে শুকিয়ে গেছে জিভ, মাথা ঝন ঝন করছে থিয়োডরের। কোনোমতে কিছুটা সামলে নিয়ে এখন ভয়াবহ টার্বিউলেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে ও। আতঙ্ক চেপে রেখে স্মরণ করতে চাইছে ফ্রেঞ্চ ফ্লাইং ইন্সট্রাকটরের শিখিয়ে দেয়া নিয়মকানুন, সাধ্যমত সামাল দিচ্ছে বিপদটা।

একটু পরেই বাতাসের অত্যাচার ভেদ করে বেরিয়ে গেল থিয়োডরের *মোরান-সলনিয়ের* বিমানটা। গোটা শরীরে স্বস্তি অনুভব করল ও বিপদটা কেটে যেতে, নিজের অজান্তেই মুদে ফেলল দু'চোখ—তার ফলে দেখা দিল নতুন বিপদ। ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়ল থিয়োডর, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাক খেতে শুরু করল বিমান। চোখের পলকে নেমে গেল কয়েকশো ফুট।

সংজ্ঞাহীনের মত এলিয়ে থাকলেও থিয়োডর ঠিকই অনুভব

করতে পারল, কানের পর্দায় বাতাসের চাপ কমে গেছে। ঝট্ করে সিধে হলো ও, মাথা ঝাঁকিয়ে কাটাবার চেষ্টা করল ঘোরটা। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কণ্ট্রোল নিয়ে। আলতো হাতে লেভেল করে আনল বিমানকে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করল উচ্চতা। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, ঠাণ্ডা বাতাস খচ্ করে বিঁধছে ফুসফুসে। বিড় বিড় করে নিজেকে অভিসম্পাত দিল থিয়োডর—এভাবে চোখ বোজা ঠিক হয়নি। আরেকটু হলেই ঘটে যাচ্ছিল দুর্ঘটনা। ফলাফল হতো ভয়াবহ—ব্যর্থ হয়ে যেত ওর অভিযান।

না, ব্যর্থ হওয়া চলবে না ওর। তা হলে মারা যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ!

মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে কথাটা বার বার উচ্চারণ করল থিয়োডর। নতুন উদ্যম সৃষ্টি হলো বুকে। ঘোলা হয়ে যাওয়া গগলসের কাঁচ পরিষ্কার করে সামনে তাকাল ও। এক বিন্দু মেঘ বা কুয়াশা নেই কোথাও, বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। দিগন্তকে ঢেকে রেখেছে বরফে ছাওয়া উঁচু-নিচু নানা আকারের পর্বতশৃঙ্গ; পাহাড়ি উপত্যকায় মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছে ছোটখাট গ্রাম। সোনালি রোদে স্নান করছে যেন প্রকৃতি।

দু'চোখ ভরে এই অপরূপ শোভা দেখল থিয়োডর, তারপর কান পাতল ইঞ্জিন একজস্টের আওয়াজ শোনার জন্য। আশি হর্সপাওয়ারের চার স্ট্রোক *নোম* রোটারি ইঞ্জিনটা ঠিকমতই কাজ করছে... অন্তত ওটার আওয়াজে কোনও গড়বড় নেই। তারপরও নার্ভাস ফিল করছে ও, মনে পড়ে যাচ্ছে একটু আগে কী ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছিল। নতুন একটা অভিজ্ঞতা ওটা থিয়োডরের জন্য—ভয় কাকে বলে, সেটা এতদিন জানত না ও। সবচেয়ে বড় কথা, ভয়টা মৃত্যুর নয়... ব্যর্থতার। ইস্পাতকঠিন মনোবল রয়েছে ওর, কিন্তু ব্যথা-বেদনার অনুভূতি মনে করিয়ে দিচ্ছে—শরীরটা

রক্তমাংসে গড়া। মনোবলই সব নয়।

শরীরে এক ধরনের আড়ষ্টতা অনুভব করছে থিয়োডর। বিমানের উন্মুক্ত ককপিটটা আকারে অত্যন্ত ছোট, নড়াচড়ার জায়গা নেই। তার ওপর ওর গায়ে শীতের ভারী পোশাক—উলের সোয়েটার, টার্টলনেক... একদম তলায় বৈমানিকদের এক প্রস্থ কভারঅল। উলের একটা স্কার্ফ জড়িয়ে রেখেছে গলায়; মাথা আর কানকে রক্ষা করছে চামড়ার একটা হেলমেট; চোখে গগলস্; দু'হাত ঢাকা পড়ে আছে ইনসুলেটেড লেদার গ্লাভসে। পায়েও দিয়েছে ক্লাইম্বার বুট। সবমিলিয়ে পোলার কণ্ডিশনের জন্য আদর্শ একটা সাজ, তবু কেন যেন আটকাচ্ছে না ঠাণ্ডা—জামাকাপড়ের পরত পেরিয়ে একেবারে হাড্ডিমজ্জায় গিয়ে আঘাত হানছে। কাঁপছে থিয়োডর... ফ্লাইঙের সময় যতটা অ্যালার্ট থাকা দরকার, ততটা থাকতে পারছে না। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক—*মোরান-সলনিয়ের* চালাতে গেলে অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখতে হয়।

চরম ক্লান্তির মাঝেও স্রেফ একরোখামির বশে নিজেকে কাজ করতে বাধ্য করছে থিয়োডর। এই একরোখা স্বভাবটাই ওকে দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের একজনে পরিণত করেছে। ওর ধূসর দুই চোখ আর রুক্ষ চেহারার দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওখানে সারাক্ষণই লেগে থাকে অস্বাভাবিক এক দৃঢ়সংকল্পের ছাপ। শিকারী ঈগলের সঙ্গে কেবল এর তুলনা চলে। মজার ব্যাপার হলো, এই পাখি ওদের পরিবারের প্রতীকও বটে। এ-মুহূর্তে থিয়োডরের বিমানের লেজে আঁকা ফ্যামিলি ক্রেস্টে দেখা পাওয়া যাবে তিন মাথাঅলা একটা হিংস্র ঈগলের।

আবার বিড়বিড় করল থিয়োডর—*ব্যর্থ হওয়া চলবে না; তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে!* কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল গোঙানির মত শব্দে। সারা ইয়োরোপের ব্যবসায়ী সমাজ

যে-বাজখাঁই কণ্ঠ শুনে কেঁপে ওঠে, তার সঙ্গে এখনকার কণ্ঠটার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা নিয়ে ভাবিত হলো না থিয়োডর, হাত বাড়িয়ে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল একটা ছোট ফ্লাস্ক, ওতে উইস্কি রয়েছে... ওর নিজের বাগানের আঙুর থেকে তৈরি মদ। ছিপি খুলে লম্বা দু'ঢোক পেটে চালান করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন বইতে শুরু করল আগুনের ঝড়। চোখের পলকে অনেকটাই কেটে গেল শীত-জনিত আড়ষ্টতা। সিটের মধ্যে নড়ে-চড়ে বসল থিয়োডর। মানসচোখে ভেসে উঠল গরম সুইস চকলেট আর তাজা পাউরুটির ছবি—পর্বতমালার ওপারে গেলেই পাওয়া যাবে খাবার। হাসি পেল ওর—দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজন হবার পরও সামান্য চকলেট আর পাউরুটির স্বপ্ন দেখছে! ওর স্বপ্নে তো আসা উচিত ছিল রাজভোজের ছবি!

অ্যালকোহলের প্রভাবেই হোক, কিংবা পরিস্থিতির কারণে... মনটা আচমকা ফুরফুরে হয়ে গেল থিয়োডরের। ওর এস্কেপ-প্ল্যান চমৎকারভাবে কাজে লেগেছে, এবং এখন পর্যন্ত সব এগোচ্ছে ঠিকঠাকভাবে। পারিবারিক কাউন্সিলে বিরুদ্ধাচরণ করায় নজরবন্দি করা হয়েছিল ওকে... ওর কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল সবাই। কিন্তু থিয়োডরও ছাড়ার পাত্র না। গত সন্ধ্যায় মদ খেয়ে মাতাল হবার ভান করেছে ও, বাটলার ওকে বেডরুমে নিয়ে শুইয়ে দেবার পর নিঃসাড়ে পড়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। রাত গভীর হলে দরকারি জিনিসপত্র ভরেছে ব্যাকপ্যাকে, তারপর শ্যাতোর জানালা গলে বেরিয়ে এসেছে ওখান থেকে। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় এরপর পৌঁছেছে এয়ারফিল্ডে, সেখান থেকে নিজের বিমান নিয়ে টেকঅফ করতে কোনোই অসুবিধে হয়নি।

ফ্লাস্কে চুমুক দিতে দিতে কম্পাস আর ঘড়ি দেখল থিয়োডর। ঠিক কোর্সেই এগোচ্ছে, শিডিউলেও খুব একটা পিছিয়ে পড়েনি।

সামনের নিচু পাহাড়চূড়াগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, লম্বা জার্নির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ও। খুব শীঘ্রি জুরিখের পানে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ করবে।

পোপের প্রতিনিধির সঙ্গে কী আলাপ করবে, সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল; হঠাৎ মনোযোগ টুটে গেল স্টারবোর্ড উইঙের দিক থেকে বিচ্ছিরি একটা শব্দ ভেসে আসায়। ডানদিকে মাথা ঘোরাতেই চমকে উঠল থিয়োডর, চোখে পড়ল ছিন্নভিন্ন এয়ারফয়েল আর ডানার গায়ে বড় বড় কয়েকটা গর্ত—গুলির আঘাত!

স্রেফ বৈমানিক-সুলভ ইন্সটিঙ্কটের বশে পরের কাজগুলো করল থিয়োডর। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ঘোরাল বিমানকে; ইচ্ছাকৃতভাবে মোচড় খেল, গোঁত্তা খেল আকাশের বুকে—যেন একটা আহত পাখি। গুলির ধারা এড়াবার প্রয়াস আসলে এসব। দ্রুত আকাশে চোখ বোলাল ও। ছ'টা বাইপ্লেন দেখতে পেল, *ভি* ফরমেশনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। উত্তেজিত হলো না থিয়োডর, শান্তভাবে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল বিমানের, যেন আনপাওয়ারড্ ল্যাণ্ডিঙের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভারী একটা পাথরের মত আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করল মোরান-সলনিয়ের।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজটা আত্মহত্যার শামিল, কারণ শত্রুপক্ষ ওকে সহজেই নাগালে পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে হামলাকারী বিমানগুলোর মডেল চিনতে পেরেছে থিয়োডর, ওগুলো *এভিয়াটাক*, ফরাসি ডিজাইনে তৈরি জার্মান বিমান, মূলত রিকনিসান্স কাজের উপযোগী। একটা মেশিনগান ফিট করা আছে বটে, তবে ওটা শুধুমাত্র উপরদিকে ফায়ার করতে পারে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ায় ঝপ্ করে নীচে নেমে গেল মোরান-সলনিয়ের, হামলাকারীদের ফায়ারিং আর্কের বাইরে।

মাথার উপর দিয়ে এভিয়াটাকগুলো ওকে পেরিয়ে যেতেই আবার ইঞ্জিন চালু করল থিয়োডর, নাকটা একটু উঁচু করে উঠে এল শত্রুপক্ষের পিছনে।

শিকারী এবার শিকারে পরিণত হয়েছে।

সবচেয়ে কাছের এভিয়াটাকের উপর নিশানা স্থির করল থিয়োডর, তারপর ট্রিগার চাপল। *মোরান-সলনিয়ের*-এর ডগায় বসানো *হচকিস* গান থেকে ট্রেসার বুলেটের ধারা বেরুল বিকট শব্দ করে; সরাসরি গিয়ে আঘাত করল এভিয়াটাকের লেজে। চোখের পলকে আগুন ধরে গেল ক্ষত-বিক্ষত বিমানটাতে, ধোঁয়ার মেঘ তুলে মাটির দিকে খসে পড়ল ওটা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরেকটা এভিয়াটাককে ঘায়েল করল থিয়োডর। সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল অবশিষ্ট হামলাকারীদের। পাশার ছক উল্টে গেছে। ভি-ফরমেশন ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তারা। ওদেরকে ধাওয়া করল না থিয়োডর, করে লাভও নেই। এলিমেণ্ট অভ সারপ্রাইজের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। সতর্ক হয়ে গেছে শত্রু, ওদেরকে আর ঘায়েল করা যাবে না। বরং চারদিক থেকে হামলা করে ওকেই বেকায়দায় ফেলে দেবে ওরা। কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে বিমান ঘুরিয়ে ফেলল ও, প্রায় খাড়াভাবে উঠে এল এক হাজার ফুট, ঢুকে পড়ল ঘন মেঘের একটা কুণ্ডলীতে। কুয়াশার মত গাঢ় ধূসর পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল মোরান-সলনিয়ের... প্রতিপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে।

বিমানকে লেভেলে এনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করল থিয়োডর। গুলির আঘাতে ডানার ফ্যাব্রিক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের কাঠামো। মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল ও, ভেবেছিল মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিঠটান দেবে, গতির জোরে পরাস্ত করবে শত্রুদেরকে, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। এভিয়াটাকের চাইতে মোরান-সলনিয়ের দ্রুতগামী

বটে, তবে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় নয়। পালাতে পারছে না, ইচ্ছে না থাকলেও লড়াইয়ে নামতেই হবে ওকে।

পরিস্থিতি গুরুতর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় ভারী; গোলাবারুদের দিক থেকেও তারা শক্তিশালী। কিন্তু ভয় পেল না থিয়োডর, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ওর মোরান-সলনিয়ের যথেষ্ট খেলা দেখাতে পারবে। অত্যন্ত উন্নত এক বিমান, রেসিং প্লেন থেকে ডেভেলপ করা হয়েছে, আঙুলের সামান্য ছোঁয়াতেই সাড়া দেয়। এমনিতে সমান্তরালভাবে অন্তত দুটো ডানা থাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের যে-কোনও বিমানে, কিন্তু মোরান-সলনিয়েরের রয়েছে মাত্র একটা—মিড-উইংড্ মনোপ্লেন ওটা। বুলেট শেপের বিমানটার দৈর্ঘ্য মাত্র বাইশ ফুট, তাই নড়াচড়া করতে পারে অতি সহজে—খুব কম সময়ে। চোখা নাকটার মাথায় রয়েছে প্রপেলার, ঠিক পিছনে মাথা তুলে রেখেছে মেশিনগান—সিংক্রোনাইজিং মেকানিজমের কল্যাণে উড়ন্ত অবস্থায় প্রপেলার ব্লেডগুলোর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে ফায়ার করতে পারে। মেকানিজমে ত্রুটি দেখা দিলেও ভয় নেই, ব্লেডগুলো মেটাল ডিফ্লেক্টরে মোড়া, বুলেটের আঘাতে কিছুই হবে না। সব মিলিয়ে সে-আমলের বিচারে একেবারে অত্যাধুনিক এবং অনবদ্য একটা আকাশযান ওটা।

লড়াইয়ে নামার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিল থিয়োডর। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল সিটের তলায়। ইস্পাতের তৈরি একটা স্ট্রং-বক্স আছে ওখানে, পাশে একটা মখমলের থলে। থলেটা কোলের উপর তুলে নিল ও, মুখের বাঁধন খুলে ভিতর থেকে বের করে আনল একটা ধাতব শিরোস্ত্রাণ বা হেলমেট। জিনিসটা প্রাচীন, নকশাকাটা; অনেক বছর থেকে ওদের পরিবারে আছে। আনমনে ওটার সারফেসের খোদাইয়ে একটা আঙুল বোলাল থিয়োডর। ধাতব হেলমেটটা বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু ওটার

স্পর্শে শিরায়-উপশিরায় অদ্ভুত এক উত্তাপের সৃষ্টি হলো। মনোবল বেড়ে গেল চোখের পলকে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে হেলমেটটা মাথায় দিল থিয়োডর, লেদার কাভারিঙের উপর দিয়ে অনায়াসে বসে গেল ওটা। ভাইজর-টা অদ্ভুত, ঠিক যেন একটা মানুষের মুখ—চেহারা অনেকটা থিয়োডরেরই মত, চোখের জায়গাদুটোতে কেবল ফুটো রয়েছে। ওখান দিয়ে ঠিকমত দৃষ্টি চলে না, তাই ভাইজর-টা উপরদিকে তুলে দিল ও। তারপর দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে আঁকড়ে ধরল বিমানের কণ্ট্রোল স্টিক।

মেঘের আবরণ পাতলা হয়ে এসেছে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকছে সূর্যরশ্মি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মেঘের সীমানা পেরিয়ে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল মোরান-সলনিয়ের। দ্রুত আশপাশে নজর বোলাল থিয়োডর, এভিয়াটাকগুলোকে দেখতে পেল কয়েকশো ফুট নীচে—ডুবন্ত জাহাজকে ঘিরে ক্ষুধার্ত হাঙরের পাল যেভাবে চক্কর দেয়, ঠিক সেভাবে ওর অপেক্ষায় ঘুরপাক খাচ্ছে। শিকারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে এল।

একটু বাঁক নিয়ে বিমানটাকে স্থির করল থিয়োডর, ওর পিছু নিল এভিয়াটাকগুলো। ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে পেতে চাইছে ওকে। এক ঝটকায় সিটবেল্টটা শক্ত করে এঁটে নিল থিয়োডর, নিজের দিকে টানতে শুরু করল কণ্ট্রোল স্টিক। দ্রুত নাক উঁচু হতে থাকল মোরানের—প্রথমে খাড়া, তারপর উল্টে যাচ্ছে। আসলে দর্শনীয় একটা ব্যাকওয়ার্ড লুপ নিচ্ছে বিমানটা।

হতভম্ব হয়ে ওর এই কৌশল দেখল এভিয়াটাকের বৈমানিকেরা, ভাবতেও পারেনি থিয়োডর এই ধরনের একটা ইভেসিভ ম্যানুভার করতে পারে। লুপ যখন শেষ হলো, তখন এভিয়াটাকগুলো সামনে, মোরান চলে গেছে পিছনে। আবারও শিকারীতে পরিণত হয়েছে নিঃসঙ্গ বিমানটা। মুচকি হাসি ফুটল

থিয়োডরের ঠোঁটে, ফায়ার ওপেন করল। তবে এই দফা আগের চাইতে সতর্ক হয়ে গেছে শত্রুরা, ওর মতলবও আঁচ করতে পেরেছে। শাঁই শাঁই করে ডানে-বাঁয়ে সরে গেল ওরা। বুলেটের ধারা একটা এভিয়াটাকের টেইল ফিনে আঁচড় কাটল শুধু। ওটাকেই প্রথম টার্গেট হিসেবে বেছে নিল থিয়োডর, নাক ঘুরিয়ে ধাওয়া শুরু করল।

এঁকে-বেঁকে ঘন ঘন দিক বদল করল এভিয়াটাক, মোরানের লাইন অভ ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য। থিয়োডরের কৌশলটার পুনরাবৃত্তি করতে চাইল, ব্যাকওয়ার্ড লুপ নিয়ে যেতে চাইল ওর পিছনে। কিন্তু দ্রুতগামী মোরানের কাছে সব কৌশলই হার মানল। আঠার মত এভিয়াটাকের লেজে লেগে থাকল মোরান, কিছুতেই পিছু ছাড়ল না। ধাওয়া করছে বটে তবে গুলি ছুঁড়ল না থিয়োডর, অ্যামিউনিশনের স্বল্পতার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও, নিশ্চিত না হয়ে একটা গুলিও আর অপচয় করতে চায় না।

ছুটতে ছুটতে চওড়া এক উপত্যকার মুখে পৌঁছুল এভিয়াটাক, উল্টো ঘোরার পথ রুদ্ধ করে ওটাকে ভিতরে ঢুকতে বাধ্য করল থিয়োডর। তারপর মোরান-সলনিয়ের নিয়ে ঢুকে পড়ল নিজেও। দু'পাশে পাহাড়ি প্রাচীর, ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে এভিয়াটাকের, হচকিস গান থেকে ফায়ার করল থিয়োডর। ডানে-বাঁয়ে দোল খেয়ে কোনোমতে নিজেকে বাঁচাল এভিয়াটাকের পাইলট, তারপর নীচের দিকে ডাইভ দিল—মোরানের লাইন অভ ফায়ারের বাইরে চলে যেতে চাইছে। ছাড়ার পাত্র নয় থিয়োডর, ও-ও ডাইভ দিল। মাটি থেকে এখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে ছুটছে বিমানদুটো।

উপত্যকার উপর চকিতে নজর বোলাল থিয়োডর। ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, গোলাঘর, আস্তাবল আর ফসলের খেত চোখে পড়ছে—এলাকাটা কৃষিপ্রধান। দূরে, উপত্যকার একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা গ্রাম। সরু একটা নদী চলে গেছে উপত্যকার

বুক চিরে, গ্রামটার প্রবেশপথে রয়েছে একটা পাথরের তৈরি সেতু, নদীর উপর দিয়ে গেছে ওটা। উঁচু-নিচু জমি আর পাহাড়ি ঢালের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য নদীর উপর দিয়ে ছুটছে এভিয়াটাক, পিছন পিছন মোরান-সলনিয়ের। নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বার বার ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতে হচ্ছে, তাই গুলি করতে পারছে না থিয়োডর।

হঠাৎ অনুকূল পরিস্থিতি দেখতে পেল ও। বড় একটা বাঁক ঘুরতেই নদীর ধারা প্রায় সরলরেখার মত হয়ে এল, গ্রামের প্রবেশপথের সেতুটা রয়েছে এই সরলরেখার শেষ মাথায়। সেদিকে সোজা ছুটে যাচ্ছে এভিয়াটাক, কোনও আড়াল নেই। লক্ষ্য স্থির করে ফায়ার করল থিয়োডর। গুলির শব্দ শুনে স্রেফ ইন্সটিঙ্কটের বশে ভয়াবহ একটা কাজ করে বসল এভিয়াটাকের পাইলট, বামদিকে কাত হয়ে ফাঁকি দিতে চাইল ট্রেসার বুলেটের ধারা। এর ফলও পেয়ে গেল হাতেনাতে। গুলির হাত থেকে বাঁচল বটে, কিন্তু কাত হওয়ায় সাঁই করে নীচে নেমে গেল বিমান, একটা পাখা আঘাত করল নদীর বুকে। যেন ল্যাং মারা হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেল এভিয়াটাক, আছড়ে পড়ল পানিতে। ডানা আর প্রপেলার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্রথম আঘাতে, পানির সারফেসে পর পর কয়েকটা ডিগবাজি খেল প্লেনের ফিউজলাজ—প্রতিবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কাঠামোটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তলিয়ে গেল পানির নীচে।

এভিয়াটাকের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে সজোরে ছুটে গেল মোরান-সলনিয়ের। থিয়োডরের ঠোঁটে হালকা এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে। ককপিট থেকে গ্রামের দিকে তাকাল, ওখানকার নিরীহ বাসিন্দারা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, হতভম্ব চোখে তাকিয়ে দেখছে ঘটনাটা। কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে উচ্চতা বাড়াতে গেল থিয়োডর, পরমুহূর্তে চমকে উঠল। উপর থেকে একটা ছায়া নেমে

এসেছে ওর গায়ে। চোখ তুলতেই দেখল, আরেকটা এভিয়াটাক উদয় হয়েছে মোরানের উপরে, উচ্চতা কমিয়ে গায়ের উপর প্রায় চড়ে বসার চেষ্টা করছে। নতুন একটা শব্দ কানে আসতেই ঝট্ করে পিছনে তাকাল—তৃতীয় এভিয়াটাকটাও এসে গেছে, রয়েছে ওর ঠিক পিছনেই!

ফাঁদটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। মোরানকে বক্স ফরমেশনে ফেলে দিয়েছে দুই এভিয়াটাক—উপরে উঠতে দিচ্ছে না, দিচ্ছে না গতি কমাতেও। ভয়াবহ একটা পরিণতি ঘটতে চলেছে—পাথুরে সেতুটার গায়ে আছড়ে পড়বে বিমান, ধ্বংস হয়ে যাবে। সেতুর দিকে তাকাল থিয়োডর, গাধায় টানা খড়ভর্তি একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে পড়েছে মাঝখানটায়, ওটার চালক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তীব্র বেগে ছুটে আসতে থাকা তিনটে পাগলা বিমানের দিকে।

তাগিদ অনুভব করল থিয়োডর। কিছু একটা করতে হবে... এক্ষুণি! নইলে নিশ্চিত মৃত্যু! কন্ট্রোল স্টিক ছেড়ে ঝট্ করে একটা হাত কোমরের কাছে নিয়ে গেল ও, একটা হোলস্টার আটকানো আছে বেল্টের সঙ্গে, ওটা থেকে বের করে আনল নিজের নিত্যসঙ্গী পিস্তলটা। ছোট্ট অস্ত্রটা এভিয়াটাকের ক্ষতি করবার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। পিস্তল ধরা হাতটা খোলা ককপিটের উপরে প্রসারিত করল ও, গুলি করতে শুরু করল।

ইঞ্জিনের ভারী গর্জন ছাপিয়ে কানে বাজল পিস্তলের তীক্ষ্ণ শব্দ, মোরানের ঠিক উপরে থাকা এভিয়াটাকের পেটে একসারিতে সৃষ্টি হলো কয়েকটা গভীর গর্ত। থিয়োডরের কপাল ভাল বলতে হবে, একটা বুলেট ফিউজলাজের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হলো, ককপিট ফুটো করে বেরিয়ে গেল ওটা। বিমানের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি, পাইলটও অক্ষত, তবে গুলিটা ভয় পাইয়ে

দিল তাকে। পাগলের মত কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে সরে গেল সে মোরানের উপর থেকে।

থিয়োডরও কন্ট্রোল স্টিক টানতে শুরু করল। ধীরে ধীরে নাক উঁচু করল মোরান-সলনিয়ের, সেতুর সীমানায় গিয়ে ধনুকের মত একটা পথে সাঁই করে উপরে উঠল... একেবারে শেষ মুহূর্তে। ল্যাণ্ডিং হুইলের বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল ওয়্যাগনটা, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল শুকনো খড়। তবে নিরাপদেই সেতু পেরিয়ে যেতে পারল বিমানটা।

মোরানের মত সৌভাগ্য হলো না পিছনে থাকা এভিয়াটাকের। সেতুর দূরত্ব ঠিকমত আঁচ করতে পারেনি পাইলট, ব্যস্ত ছিল থিয়োডরকে ধাওয়া করায়। মোরান-সলনিয়ের সরে যেতেই আচমকা সে দেখতে পেল বাধাটাকে, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তুমুল গতিতে সেতুর গায়ে আছড়ে পড়ল এভিয়াটাক। সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো ইঞ্জিন। জ্বলন্ত একটা আগুনের গোলা হয়ে নদীর বুকে খসে পড়ল এভিয়াটাকের ধ্বংসাবশেষ।

গ্রামের সীমানায় একটা ছোটখাট জটলা সৃষ্টি হয়েছে, অবাক হয়ে সবাই দেখছে দৃশ্যটা। চারপাশে নজর বোলাল থিয়োডর, গুলি খাওয়া এভিয়াটাকটাকে দেখা গেল না কোথাও, বোধহয় ভয় পেয়ে চম্পট দিয়েছে। গ্রামের ঘরবাড়ির উপর দিয়ে বাঁক নিয়ে ফিরতি পথ ধরল থিওডর, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবে।

কিছুদূর যেতেই উপত্যকার মুখের কাছে একটা আলোর ঝলকানি চোখে পড়ল—ধাতব একটা আকৃতির গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যরশ্মি। চতুর্থ এভিয়াটাক! চেহারায় কাঠিন্য ভর করল থিয়োডরের, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল কন্ট্রোল স্টিক, গতি বাড়িয়ে সরাসরি ছুটে যাচ্ছে শত্রুর দিকে, *হচকিস* মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে তৈরি।

প্রায় একই সময় ফায়ার ওপেন করল দুই পক্ষ। দুই বিমানের মধ্যকার দূরত্ব তখন তিনশো গজ। ট্রেসার বুলেটের ধারা ছুটে আসতে দেখেই মোরানকে পাক খাওয়াল থিয়োডর, গুলির সমান্তরাল দুই সারির মাঝখানে অবস্থান নিল, ফায়ার করতে থাকল একই সঙ্গে। পুরোপুরি রক্ষা পেল না তাতে, মোরানকে নড়তে দেখে এভিয়াটাকও পাক খেতে শুরু করেছে, তবে গতি অনেকটা শ্লথ। তারপরও ভারী অ্যামিউনিশনের আঘাতে গভীর অনেকগুলো ক্ষত সৃষ্টি হলো মোরান-সলনিয়েরের বাইশ ফুট দীর্ঘ ফিউজলাজে। এরচেয়ে বেশি ক্ষতি হলো এভিয়াটাকের—*হচকিস* মেশিনগানের বুলেট ওটার একটা ডানা প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল, গুঁড়িয়ে দিল প্রপেলার আর ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে খসে পড়ল বিমানটা মোরানের সামনে থেকে।

এভিয়াটাকের পরিণতি দেখার আর চেষ্টা করল না থিয়োডর, তুমুল বেগে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এল ও। তারপর শরীর এলিয়ে দিল সিটে। বিজয়ের আনন্দে ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ঝুলছে। মোরানের ফিউজলাজে গুলি লাগলেও বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। অনায়াসেই এই বিমান নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে ও।

•

এই আত্মপ্রসাদটাই হলো থিয়োডর বুভারির জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

ওর অজান্তে ধীরে ধীরে পিছনে উদয় হলো দ্বিতীয় এভিয়াটাক—পিস্তলের গুলি খেয়ে যেটা পালিয়ে গিয়েছিল। বিপদ সম্পর্কে থিয়োডর সচেতন হবার আগেই ফায়ার ওপেন করল ওটা। টেইল সেকশন গুঁড়িয়ে গেল মোরানের, ছুরি দিয়ে মাখন কাটার ভঙ্গিতে ফিউজলাজকে দু'টুকরো করে ফেলল বুলেটের বৃষ্টি। তারপরও ক্ষান্ত দিল না এভিয়াটাকের পাইলট, ফায়ার করতে থাকল।

হঠাৎ বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল থিয়োডর। চোখ নামাতেই দেখল, টার্টলনেক সোয়েটারের সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে লাল রঙে, উষ্ণ রক্ত গড়িয়ে নামছে শরীর বেয়ে, কোলের কাছটায় সিটের উপর জমা হচ্ছে রক্তের পুকুর। গুলি লেগেছে ওর গায়ে! মুখের ভিতরও নোনা স্বাদ পাচ্ছে ও।

ব্যথায় সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে, সেটাকে সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল থিয়োডর। নিচু হয়ে সিটের তলা থেকে বের করে আনল ইস্পাতের তৈরি স্ট্রং-বক্সটা। ওটার হাতলের সঙ্গে একটা ভি-স্ট্র্যাপ আছে, কবজিতে বেঁধে ফেলল ওটা। তারপর সিটবেল্ট খুলে মুক্ত করল নিজেকে। পরমুহূর্তে গোঁত্তা খেল মোরান-সলনিয়ের, পুরোপুরি উল্টে যেতেই ককপিট থেকে স্ট্রং-বক্সসহ পড়ে গেল থিয়োডর। বিমান ওকে পিছনে ফেলে সরে যেতেই কাঁধের কাছে বেরিয়ে থাকা রিপকর্ড টানল। খুলে গেল প্যারাশুট।

বাতাসে ভাসতে ভাসতে এখন নীচে নামছে থিয়োডর, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। ধূসর একটা পর্দা নেমে আসছে ওর চোখের সামনে। জ্ঞান হারাবার আগে এক ঝলকের জন্য চোখে পড়ল বরফে ছাওয়া একটা জলাশয় আর ওটার পাশে উঁচু হয়ে থাকা গ্লেসিয়ারের দৃশ্য।

শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে থিয়োডরকে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছে মানসিক যাতনা। ব্যর্থ হয়েছে ও। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে এখন, ঠেকাবার আর কেউ রইল না। শেষবারের মত কেশে উঠল থিয়োডর, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত, তারপরই নিথর হয়ে গেল দেহটা।

ছাতার মত ফুলে থাকা প্যারাশুটটাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল এভিয়াটাক, এক পশলা গুলি করল। গুলির আঘাতে হারনেসে ঝুলতে থাকা থিয়োডরের দেহ ঝাঁকি খেল শুধু, কোনও

ব্যথা-বেদনা অনুভব করল না। সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে ও। ধীরে ধীরে ক্ষত-বিক্ষত লাশটা নেমে যাচ্ছে বরফে ছাওয়া গ্লেসিয়ারের দিকে। সূর্যের আলোয় অপার্থিব দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওর মাথায় পরা প্রাচীন শিরোস্ত্রাণটা।

দুই

সাম্প্রতিক সময়। স্কটিশ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জ।

রেগে বোম হয়ে আছে এডিথ ম্যাকলিন... রাগটা নিজেরই উপর। কোন্ দুঃখে যে *আউটকাস্ট* নামের রিয়্যালিটি শো-তে যোগ দিতে গিয়েছিল! ব্যাপারটা এখন গলার ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে, কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। চুক্তি ভাঙলে অনুষ্ঠানের প্রযোজক পিটার হ্যালোরান ওর নামে মামলা ঠুকে দেবে। অথচ পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ বিকেলে জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরা একটা বিশাল গর্তের উপর দিয়ে দড়ি বাইতে হয়েছে ওকে। নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল অবশ্য, হাত ফসকালেও আগুনে পড়ত না, সেফটি লাইনে বাঁধা হারনেস ওকে রক্ষা করত। তারপরও দড়ি বাইতে যে-কষ্টটা পোহাতে হয়েছে, সেটা নরকযন্ত্রণার শামিল। গত দু'মাস ধরে বলতে গেলে রোজই এমন সব অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, অন্তত আরও তিন সপ্তাহের আগে অনুষ্ঠানটা শেষ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। বলা যায় না, ভাল রেটিং পেলে মেয়াদটা দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে।

আতঙ্ক জাগানোর মত একটা ব্যাপার!

বিশ্ববিখ্যাত রিয়্যালিটি শো *ফিয়ার ফ্যাক্টর* এবং *সার্ভাইভার*-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে *আউটকাস্ট।* সৃজনশীলতা কিংবা নতুন কিছু করবার চিন্তা নেই নির্মাতাদের মধ্যে, জনপ্রিয় শো-দুটোর প্রতি দর্শকদের আকর্ষণের ফায়দা লোটার জন্যই *আউটকাস্ট* তৈরি করা হয়েছে। ফরম্যাটেও তেমন কোনও বৈচিত্র্য নেই। দশজন প্রতিযোগীকে নির্জন একটা দ্বীপে তিন মাসের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে ওদেরকে, টিকে থাকতে হবে। বিচ্ছিরি সব চ্যালেঞ্জ—জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরা গর্ত পাড়ি দেয়াটা আসলে কিছুই না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওদেরকে পোকামাকড় বা সরীসৃপে ভরা ডোবা বা জলায় ডুব দিতে হয়, জ্যান্ত কাঁকড়াও খালি হাতে টুকরো টুকরো করে চিবুতে হয়েছে একবার। দর্শকদের জন্য এসবের সঙ্গে বাড়তি *আকর্ষণ* হিসেবে রাখা হয়েছে প্রতিযোগীদের দ্বন্দ্ব। কে কতটা নীচে নামতে পারে, কে কার পিঠে ছুরি বসাতে পারে, কে কত ঝগড়াঝাঁটি করতে পারে... এসবেরও প্রতিযোগিতা চলছে। মুলোর মত সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্রথম পুরস্কার—এক মিলিয়ন ডলার। আট-দশদিন পর পর একজন করে প্রতিযোগী বাদ পড়ে দর্শক ভোট এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের মতামতের ভিত্তিতে, শেষ পর্যন্ত থাকবে দু'জন, তাদের নিয়ে হবে গালা-ফাইনাল। রিচার্ড কনেলের বিখ্যাত গল্প *দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম*-এর আদলে পরস্পরকে শিকার করবে তারা। শেষ পর্যন্ত যে বিজয়ী হবে, সে-ই পাবে প্রতিশ্রুত এক মিলিয়ন ডলার।

টাকার লোভেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে এডিথ, ভেবেছিল নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। লম্বা, একহারা শরীর ওর: নিয়মিত ব্যায়াম করায় ফিটনেসও ভাল।

সার্ভাইভালের পরীক্ষায় উতরে যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, বিশ্বাসটা ততই টলে যেতে শুরু করেছে। *আউটকাস্ট*-এ শারীরিক ফিটনেসের কোনও মূল্য নেই, এখানে মূল্য রয়েছে শুধু চেহারা-সুরত, আর দর্শকপ্রিয়তার। নির্মাতারা ফেয়ার প্লে-তে বিশ্বাসী নয়, অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য খেয়াল-খুশিমত যাকে-তাকে বাদ দিচ্ছে, কিংবা টিকিয়ে রাখছে। ভোটাভুটির যে-বিধানটা আছে, সেটা সম্পূর্ণ লোক-দেখানো। ইতিমধ্যে ছ'জন প্রতিযোগী বাড়ি ফিরে গেছে, শো-এর প্রযোজক পিটার হ্যালোরানের মর্জি অনুসারে। শেষ চারজনের একজন হলো এডিথ নিজে, তবে এই পজিশনে পৌঁছুনোর পিছনে ফিটনেস বা দক্ষতার কোনও ভূমিকা নেই, সব কৃতিত্ব রূপ-যৌবনের। অত্যন্ত সুন্দরী ও—মুখটা ডিম্বাকৃতি, পটলচেরা চোখ, মাথাভর্তি একরাশ ঘন সোনালী চুল। হাঁটার সময়ে শিকারী বাঘ-সিংহের মত মনোহর ঢেউ ওঠে সারা শরীরে, জামার ভিতর দুর্বিনীত স্তন জোড়া কাঁপে। বেশিরভাগ সময়ে বিকিনি পরা অবস্থায় ক্যামেরার সামনে হাজির হতে হয় ওকে, তখন সম্ভবত হিমালয়ের মুনি-ঋষিদের ধ্যানও টুটে যায়। ওর অপূর্ব দেহ-সৌষ্ঠব দেখার জন্যই অসংখ্য দর্শক প্রতি সোমবার রাতে বসে থাকে টিভির সামনে। এমন একজন প্রতিযোগীকে হটিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারবে না কোনও বুদ্ধিমান প্রযোজক... এবং পিটার হ্যালোরান মোটেই বোকা নয়।

এতেই কপাল পুড়েছে এডিথের। *আউটকাস্ট* এখন ওর কাঁধে সিন্দাবাদের ভূতের মত সওয়ার হয়ে আছে, তাকে নামানোর কোনও উপায় নেই। গত সপ্তাহে একবার চেষ্টা করে দেখেছিল এডিথ, কুইজ রাউণ্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাল জবাব দিয়েছিল সহজ সব প্রশ্নের। ভেবেছিল পয়েন্ট না পাওয়ায় ওকে বাদ দিতে বাধ্য হবে নির্মাতারা, দর্শকরাও এমন বেকুব একজন

প্রতিযোগীকে দেখে বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় শুটিং হওয়া রেজাল্ট এপিসোডে দেখা গেল—বহাল তবিয়তে টিকে আছে ও। বরং কুইজ রাউণ্ডে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েও বাদ পড়েছে জেমস হাওয়ার্ড—ভারমন্ট থেকে আসা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

আনমনে মাথা নাড়ল এডিথ। নাহ্, আর কোনও আশা নেই। প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত ওকে এই নরকতুল্য দ্বীপেই কাটাতে হবে। চারপাশে নজর বোলাল ও। কী এক জায়গা! সভ্যতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লাগেনি এখানে। ঝোপঝাড়, গাছপালা, পাথুরে টিলা আর খানাখন্দে ভরা আদিম পরিবেশ বিরাজ করছে সবখানে। দ্বীপটার নাম বেশ হাস্যকর—*পি আইল্যাণ্ড।* অর্থ করলে দাঁড়ায়, প্রস্রাব দ্বীপ! প্রথম দিন এ নিয়ে প্রতিযোগী আর শুটিং ক্রু-রা বেশ একচোট হাসাহাসি করেছে। প্রযোজক পিটার হ্যালোরান অবশ্য বেশ গম্ভীর ছিল। বুঝতে পেরেছিল, অনুষ্ঠানে এই নাম ব্যবহার করলে তার কপালে খারাবি আছে। তাই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, 'আজ থেকে এই দ্বীপের নাম স্কাল আইল্যাণ্ড... খুলি দ্বীপ। সবাই এই নামেই ডাকবে জায়গাটাকে, ঠিক আছে? খবরদার, আসল নাম কেউ উচ্চারণ কোরো না!'

'কিন্তু দ্বীপটা তো খুলির মত না,' ঠাট্টা করে বলেছিল একজন। 'ডিমের ভাঙা কুসুমের মত! *ব্রোকেন এগ আইল্যাণ্ড* বললেই বেশি মানানসই হবে।'

কথাটা শুনে আরও জোরে হেসে উঠেছিল সবাই।

'রসিকতা করছ আমার সঙ্গে?' খেপে উঠে বলেছিল হ্যালোরান। 'পাছায় লাথ মেরে যখন ইউনিট থেকে তাড়াব, তখন দেখা যাবে, কত রস থাকে তোমার!'

ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল জটলা। হ্যালোরান আদেশের সুরে বলেছিল, 'আজ থেকে এটা স্কাল আইল্যাণ্ড। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছিল সবাই। বিড়বিড় করে এডিথ শুধু বলেছিল, 'হ্যাঁ, খুলি দ্বীপই বটে। তোমার গোবর ভরা মাথার খুলি!'

বুকের ভিতর ছটফটানি অনুভব করল এডিথ। নাহ্, কিছু একটা না করলেই নয়। মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন নেই ওর, এই দ্বীপ ছাড়তে পারলেই খুশি। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল প্রযোজক পিটার হ্যালোরানের দিকে। হাতে ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে জেমস হাওয়ার্ডকে সান্ত্বনা দেয়ায় ব্যস্ত লোকটা। লম্বা পা ফেলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এডিথ।

'মি. হ্যালোরান?' ডাকল ও।

ঢুলু ঢুলু চোখে এডিথের দিকে তাকাল হ্যালোরান। 'এডিথ! মাই ডিয়ার! তুমি এখানে কেন? ড্রিঙ্ক দরকার?' জড়ানো গলায় বলল সে। মদের নেশায় টলছে। 'নাকি অন্য কিছু?' চোখ টিপল কথাটা বলে।

'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে,' ইশারাটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল এডিথ।

'পরে বললে হয় না?' হাসল হ্যালোরান। হাতের গ্লাস দেখাল। 'এখন তো ফুর্তির সময়! কাম, জয়েন আস!'

'না, এখুনি কথাটা বলতে চাই আমি!' জোর দিয়ে বলল এডিথ। 'ফুর্তিটা কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি করুন।'

মুখ দিয়ে গোঙানির মত একটা শব্দ করল হ্যালোরান। 'মেয়েমানুষ!' হাওয়ার্ডের দিকে ফিরে ফিসফিসাল। তারপর মুখোমুখি হলো এডিথের। 'বলো তোমার জরুরি কথা।'

'আমি চলে যেতে চাই, মি. হ্যালোরান। আই ওয়ান্ট টু লিভ দ্য শো।'

যেন কারেন্টের শক খেয়েছে, এমন একটা ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেল হ্যালোরান, সিধে হয়ে দাঁড়াল। নেশা ছুটে গেছে। অবিশ্বাসের

সুরে বলল, 'কী বললে তুমি?'

'কানে কম শোনেন নাকি?' রাগী গলায় বলল এডিথ। 'আমি *আউটকাস্ট* থেকে চলে যেতে চাইছি।'

'ক...কিন্তু কেন?'

'আই হেট দিস প্লেস। জীবনে এরচেয়ে জঘন্য জায়গা দেখিনি আমি, এমন দুর্দশাও পোহাইনি...'

বাধা দিয়ে হ্যালোরান বলল, 'এর জন্য মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার আছে। ওটা না পেলেও প্রতি সপ্তাহে পার্টিসিপেশন ফি বাবদ প্রচুর টাকা পাচ্ছ!'

'টাকা চাই না আর আমি। এই নরক থেকে মুক্তি চাই!'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল হ্যালোরানের। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এডিথের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বোঝার চেষ্টা করছে, মেয়েটা সত্যিই চলে যেতে চাইছে, নাকি ভুয়া হুমকি দিয়ে ওর পকেট থেকে কিছু খসাতে চাইছে।

'ওভাবে তাকানোর কিছু নেই, মি. হ্যালোরান,' বুঝতে পেরে বলল এডিথ। 'আমি সিরিয়াস।'

শব্দ করে একটা শ্বাস ফেলল হ্যালোরান। পাশ থেকে একটা ক্যাম্পচেয়ার টেনে নিয়ে বসল তাতে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল, তারপর মুখ খুলল।

'যেতে চাইলেই তো আর যেতে পারবে না, মাই ডিয়ার এডিথ,' শান্ত গলায় বলল সে, মাতলামি করছে না আর। 'নিয়মকানুন আছে। ইচ্ছা করলেই হাওয়ার্ড যেমন থেকে যেতে পারে না, তেমনি তুমিও খেয়াল-খুশিমত চলে যাবার আবদার জুড়তে পারো না।'

'আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম,' বলল এডিথ। 'এখানে নিয়মকানুনের কোনও বালাই নেই। সব চলছে একজন মাত্র মানুষের মর্জি অনুসারে... আপনার মর্জি! কাজেই চাইলে যাকে

খুশি বিদায় করতে পারেন আপনি, রাখতেও পারেন। এই যেমন আজ বেচারা হাওয়ার্ডকে তাড়িয়ে দিলেন। যাবার তো কথা আমার! গত কয়েকটা রাউণ্ডে ইচ্ছে করে ঠিকমত পারফর্ম করিনি আমি, তারপরও দেখি বহাল তবিয়তে টিকে আছি। অথচ হাওয়ার্ড... ওর মত সিরিয়াস আর কেউ ছিল না টিমে...'

জেমস হাওয়ার্ড কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হ্যালোরান মুখ খোলায় বাধা পেল। 'হাওয়ার্ডকে দলে টানার চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলল প্রযোজক। 'ও এখন বাতিলের খাতায় চলে গেছে। উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলে বরং বিপদে পড়বে। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে মামলা ঠুকব আমি, পার্টিসিপেশন ফি-র সমস্ত টাকা ফেরত চাইব। কী হাওয়ার্ড, কিছু বলতে চাও?'

সভয়ে মাথা নাড়ল হাওয়ার্ড।

কুটিল ভঙ্গিতে হাসল হ্যালোরান। এডিথের দিকে তাকাল। 'বুঝেশুনে কথা বলা উচিত তোমার, এডিথ। নইলে তোমাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাব আমি... মানহানির অভিযোগে।'

'ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করাতে চাইছেন, না?' থমথমে গলায় বলল এডিথ। 'সত্যকে চাপা দিতে চাইছেন?'

'নাটক কোরো না,' বিরক্ত গলায় বলল হ্যালোরান। 'ভয়াবহ কোনও অন্যায় করছি না আমি। কাম অন, দিস ইজ শোবিজ! এখানে মেধা কিংবা শারীরিক শক্তির চাইতে রূপের মূল্য বেশি। নিজেই বলো, দর্শক টানার ক্ষমতা কার বেশি—তোমার, নাকি হাওয়ার্ডের? দর্শক কাকে দেখতে চায়—কুৎসিত এক জিনিয়াস, নাকি রূপবতী একজন তরুণী?'

'তারমানে আমাকে যেতে দেবেন না আপনি?' ফুঁসতে ফুঁসতে বলল এডিথ।

'না, ডিয়ার। গালা-ফাইনালে তোমার পজিশন পাকা করে রেখেছি আমি বহুদিন আগেই। বাকিরা এখন ফাইট করছে

তোমার প্রতিপক্ষ হবার জন্য।'

'আমি যদি রাজি না হই?'

'সেক্ষেত্রে লম্বা একটা সময় কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াতে হবে তোমাকে,' শীতল গলায় বলল হ্যালোরান। 'মুখটা অমন বাঁকা কোরো না, এডিথ। তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিনি আমি। ফর গডস্ সেক, ভালমত ভেবে দেখো! ফার্স্ট প্রাইজটা বলতে গেলে তোমার হাতের মুঠোয় তুলে দিচ্ছি আমি। এক মিলিয়ন ডলার! এরপরও তুমি চলে যেতে চাও?'

জবাব দিল না এডিথ; নীরব হয়ে গেল। ভাবতে শুরু করেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই রাগটা পড়ে যেতে শুরু করল। ঠিকই তো, এমন সুযোগ ক'জনে পায়? মিলিয়নেয়ার হবার জন্য তো লোকে আত্মা পর্যন্ত বিসর্জন দেয়! ওকে তো কেবল ক'টা দিনের কষ্ট সইতে হবে। পারবে না?

চেহারায় সন্তোষ ফুটল ধুরন্ধর প্রযোজকের। বলল, 'মনে হচ্ছে, ঠিক লাইনেই এবার চিন্তা শুরু করেছ। যাও, গিয়ে একটা ঘুম দাও। সকালে জাগার পর দেখবে, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কী ভুলটাই না করতে যাচ্ছিলে, সেটা ভেবে নিজেকে গাল দেবে।'

ফাঁদে পড়ে গেছে এডিথ। শেষ চেষ্টার সুরে বলল, 'কিন্তু তাঁবুতে আমার ঘুম আসে না! এয়ার-কণ্ডিশন আর গরম পানি ছাড়া আমি কোনোদিন থাকিনি...'

'আহ্হা! এ আবার এমন কী?' বলে উঠল হ্যালোরান। 'যাও, আজ রাতের জন্য তোমার ইচ্ছেপূরণ করে দিচ্ছি। ক্রু-দের ট্রেইলারে একটা কামরা খালি আছে। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দাও। এসি, হট ওঅটর... সব পাবে। কাল সকালে নাহয় তাঁবুতে ফিরে যেয়ো।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে তাকাল এডিথ। 'ওরা তাতে মাইণ্ড করবে না?'

'বলব তোমার শরীর খারাপ, তাই আজ রাতে ক্রু-দের কোয়ার্টারে থাকছ। তারপরও যদি মাইণ্ড করে, তা হলে ওদের আমি...' কুৎসিত একটা গালি দিল হ্যালোরান।

শ্রাগ করল এডিথ। 'ঠিক আছে, আমি তা হলে ট্রেইলারে যাচ্ছি।'

'এত তাড়া কীসের?' বলল হ্যালোরান। 'আজ রাতে ক্যাম্পফায়ার-পার্টি আছে তো! এই তো, একটু পরেই শুরু হবে।'

মুখ বাঁকাল এডিথ, এ আরেক উপদ্রব। দু'চারদিন পর পরই পার্টি দেয় হ্যালোরান। পার্টি মানে আগুন ঘিরে নাচানাচি আর মাতলামির উৎসব। সবাই যে ব্যাপারটা পছন্দ করে, তা নয়। কিন্তু প্রযোজককে খেপানোর সাহস নেই কারও, তাই ইচ্ছে না থাকলেও সব প্রতিযোগী আর প্রোডাকশন ক্রু-কে অংশ নিতে হয় ওতে। তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। ওকে তোয়াজ করছে হ্যালোরান, সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

'ধন্যবাদ, মি. হ্যালোরান,' বলল এডিথ। 'তবে আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। খুব অস্বস্তি লাগছে। শাওয়ার নিয়ে শুয়ে পড়ব যত দ্রুত সম্ভব।'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যালোরান। 'বেশ, তা হলে আর জোর করব না। আফটার অল, ইউ আর দ্য স্টার অভ মাই শো। যাও, সকালে দেখা হবে। প্রোডাকশন বয়কে জিজ্ঞেস করলেই ট্রেইলারটা দেখিয়ে দেবে।'

'সো নাইস অভ ইউ! গুড নাইট, মি. হ্যালোরান।'

'গুড নাইট, ডিয়ার।'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এডিথের। ঘুম ভাঙলেও নড়ল না, কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড়ে শুয়ে রইল। তারপর হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে হাতঘড়ি তুলল চোখের সামনে। লিউমিনাস ডায়াল

বলছে—রাত দেড়টা বাজে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর—গভীর, শান্তিময় ঘুমটা এমন অসময়ে ভেঙে গেল কেন? পরমুহূর্তেই আবছাভাবে শুনতে পেল হৈ-হল্লার আওয়াজ... আনন্দময় নয়, আতঙ্কের! দলবদ্ধভাবে আর্তনাদ করেছে যেন অনেকে। ঘুমের মধ্যেও শুনতে পাচ্ছিল শব্দটা, মনে হচ্ছিল স্বপ্নের কারসাজি; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সত্যিই হচ্ছে শব্দটা। এই ভয়ানক শব্দই জাগিয়ে তুলেছে ওকে ঘুম থেকে।

বিছানা থেকে নামল এডিথ। হচ্ছেটা কী বাইরে? হ্যালোরানের পার্টিতে সবসময় কোনও না কোনও কাণ্ড ঘটে, আজও মনে হচ্ছে কিছু ঘটেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি নিশ্চয় তারই ফলাফল। গায়ে একটা রোব জড়াল ও, উঁকি দিল দরজা ফাঁক করে।

কাউকে দেখা গেল না কোথাও, হৈ-হল্লার আওয়াজ শুধু বেড়ে গেল দরজা খোলায়। প্রতিযোগীদের ক্যাম্পের দিকে তাকাল এডিথ, নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড, ওখানে কেউ নেই। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সৈকতের দিক থেকে, মনে হচ্ছে ওখানেই আজ আসর বসিয়েছে হ্যালোরান।

কাঁধ ঝাঁকাল এডিথ, এখন আর ঘুম আসবে না। খিদেও পেয়েছে। পার্টিতে যাবে বলে ঠিক করল। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, সবাই আজ এভাবে চেঁচাচ্ছে কেন? জিন্স আর টি-শার্ট পরে ট্রেইলার থেকে নেমে এল ও, গাছপালার মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া হাঁটাপথ ধরে লঘু পায়ে এগোল সৈকতের দিকে।

চেঁচামেচি আর হট্টগোলের আওয়াজ বেড়ে গেছে আরও। উল্লাস নয়, এ আওয়াজ আতঙ্ক আর যন্ত্রণার। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল এডিথের। কিন্তু থামল না, কী এক দুর্দমনীয় আকর্ষণে এগিয়ে চলল। একটু পরেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সৈকতের প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল নরকযজ্ঞ।

দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য, ভীতিকর... কিন্তু বাস্তব। *আউটকাস্ট*-এর ক্রু-রা হামলার শিকার হয়েছে, আর হামলাকারীরা মানুষ নয়! চোখের সামনে একদল কুৎসিত, লোমশ, দ্বিপদী, হিংস্র প্রাণী দেখতে পেল এডিথ; এমন প্রাণী জীবনে কোনোদিন দেখেনি ও। উন্মত্ত ভঙ্গিতে অসহায় মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা, ধারালো নখ-দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলছে নরম মানবদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে এডিথের সঙ্গী-সাথীরা, নিথর হয়ে পড়ছে হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে।

পিটার হ্যালোরানকে খুন হতে দেখল এডিথ—তার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ল একটা প্রাণী, বিশাল এক কামড় দিয়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল। ছিন্নভিন্ন শ্বাসনালী দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুল হ্যালোরানের, নেতিয়ে পড়ল দেহটা নিমেষে। ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল এডিথ। আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কোলাহল। ঝট্ করে সিধে হলো প্রাণীগুলো, মাথা ঘোরাল সৈকতের প্রান্তে... এডিথের দিকে!

কয়েক মুহূর্ত কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করল, তারপরই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল প্রাণীগুলো, ছুটে এল নতুন শিকারের দিকে। উল্টো ঘুরল এডিথ, ছুটতে শুরু করল জানপ্রাণ দিয়ে, কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে, পালাতে হবে ওকে। যেভাবেই হোক!

সচেতনভাবে নিজেদের ক্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল এডিথ, ওখানে লুকানোর জায়গা নেই, কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তাই ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল দ্বীপের জঙ্গলের গভীরে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, মাথার ভিতরটা দপদপ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ—যত না তৃষ্ণায়, তারচেয়ে বেশি আতঙ্কে! সবচেয়ে বড় কথা, প্রাণীগুলো পিছু ছাড়েনি, ধাওয়া করে চলেছে, খুব কাছেই

শোনা যাচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ।

আর একটু দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল এডিথ। কিন্তু পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আবার। তাকিয়ে দেখল, গাছপালার আচ্ছাদন পেরিয়ে দ্বীপের পাহাড়ি অংশে পৌঁছে গেছে ও। সামনেই সংকীর্ণ গিরিপথের মত একটা জায়গা। ঢুকে পড়ল ওখানে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা বাঁক দেখতে পেল ও। বাঁকটা ঘুরেই দেখল সামনে আর পথ নেই—বিরাট বিরাট বেলে পাথরে বন্ধ হয়ে আছে পথ। কমপক্ষে দশ ফুট উঁচু হবে পাথরের স্তূপটা। ছোটবড় অসংখ্য ফাটল দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে। উল্টো ঘোরার উপায় নেই, প্রাণীগুলোর সামনে পড়লে খুন হয়ে যেতে হবে। স্তূপটা টপকানোর সিদ্ধান্ত নিল এডিথ।

মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে একটা ফাটলে ডান পা রেখে হাতড়ে হাতড়ে উপরে আরেকটা ফাটলে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরল ও। অন্য পা দিয়ে নীচের দিকে একটা ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল ফাটলটায়। মাটি থেকে সাত-আট ফুট উপরে সরু একটা পাথরের তাকের মত দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ধাক্কায় তাকটার উপরে উঠে পড়তে পারল এডিথ। ওখান থেকে চূড়াটা তিন ফুটের বেশি হবে না। ছোট ছোট দুটো ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল ও চূড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, তাকাল নীচে। বাঁকের ওপাশে পৌঁছে গেছে প্রাণীগুলো, ভয়াবহ হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

শোয়া থেকে উঠে বসল এডিথ, পাথরস্তূপের অন্যপাশ দিয়ে নেমে যেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। পিশাচগুলো পৌঁছুনোর আগেই। পাথরের স্তূপের উপরটা ভীষণ এবড়োখেবড়ো। বসা অবস্থায়ই কুঁজো হয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল ও অন্য প্রান্তের দিকে, যাতে নীচ থেকে ওকে দেখা না যায়। সামান্য দূরত্ব পেরোতেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো।

শেষ মাথায় পৌঁছে নীচে তাকাল এডিথ। এদিকে মাটি প্রায়

পনেরো ফুট নীচে। অসংখ্য খানাখন্দ রয়েছে স্তূপের এ-পাশের দেয়ালেও। স্তূপের প্রান্তভাগ দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে পেছন দিকে একটু হেলে শরীর ঢিল করে দিল ও। লাফ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কয়েক সেকেণ্ডের চেষ্টায় পা দুটো একটা খোঁড়লে আটকাতে পারল, কিন্তু হাতে ধরার মত কোনও জায়গা খুঁজে পেল না। হিংস্র গর্জন ভেসে এল খুব কাছ থেকে, প্রাণীগুলো এসে পড়েছে! লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল এডিথ। যা হয় হবে; এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, যেন হাত-পা না ভাঙে। গোড়ালির একটুখানি মাত্র বেধে আছে খোঁড়লে। একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করেছে পা দুটো।

নীচে খানিকটা সমতল জায়গা। ওখানেই লাফ দিয়ে পড়তে চায় এডিথ। টলমল করতে করতে ঝাঁপ দিল ও।

সশব্দে মাটিতে পড়ল এডিথ। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারল না। পায়ের নীচ থেকে সরে গেল অবলম্বন... বিনা নোটিশে ধরণী দ্বিখণ্ডিত হলো, হুড়মুড় করে ধুলোবালির একটা ধারার সঙ্গে খসে পড়ল এডিথ নীচে। ধপাস করে একটা শক্ত পাথরের উপর আছাড় খেল ও, ককিয়ে উঠল ব্যথায়। অন্ধকার দেখল চোখে, ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছে না, পতনের ধাক্কায় ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে, মচকে গেছে গোড়ালি।

অচেতনের মত অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে রইল এডিথ। চারপাশে কী ঘটছে, আর বুঝতে পারছে না। ঘোরের মধ্যে পশুগুলোর কলজে কাঁপানো চিৎকার শুনল, ওকে খুঁজে না পেয়ে খেপে গেছে। তারপর শুনল ছিঁটেফোঁটা গোলাগুলির শব্দ। সত্যি কি কল্পনা, কে জানে। শরীরের ব্যথা কমে এলে উঠে বসল ও। তাকাল চারপাশে। পাহাড়ি একটা ফাটলের ভিতর পড়ে গেছে ও, জায়গাটা সংকীর্ণ। দেয়ালের খাঁজে পা বাধিয়ে বেরুনো সম্ভব, কিন্তু ওর সে-উপায় নেই। ইতিমধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে মচকে

যাওয়া গোড়ালিটা। দুর্ঘটনাক্রমে এই ফাটলে পড়ে গিয়ে হিংস্র প্রাণীগুলোর হাত থেকে বেঁচেছে বটে, কিন্তু তা কেবল ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তিলে তিলে মরার জন্য।

সংকীর্ণ পাহাড়ি ফাটলের ভিতর বসে ফোঁপাতে শুরু করল এডিথ।

ভাগ্যদেবী কিন্তু এতটা নির্দয় হতে পারলেন না এডিথ ম্যাকলিনের প্রতি। পরদিন সকালেই মেইনল্যাণ্ড থেকে একটা কার্গো হেলিকপ্টার হাজির হলো পি আইল্যাণ্ডে, *আউটকাস্ট*-এর ক্রু-দের জন্য সাপ্তাহিক সাপ্লাই নিয়ে। দ্বীপটা সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় পেল তারা। জীবিত বা মৃত, কোথাও একজন মানুষও খুঁজে পেল না। খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজির হলো কোস্টগার্ড, সার্চ পার্টি গঠন করা হলো।

পুরো দ্বীপে তন্ন-তন্ন করে চালানো হলো তল্লাশি, সন্ধেবেলায় এডিথকে পাওয়া গেল পাহাড়ি ফাটলের ভিতরে—জ্বরে কাঁপছে, প্রলাপের ঘোরে বিড় বিড় করে বলছে অদ্ভুত একদল প্রাণীর কথা। ওর গল্প কেউ বিশ্বাস করল না, কারণ গোটা দ্বীপে একটি লাশ পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি এক ফোঁটা শুকনো রক্তও। অমীমাংসিত এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল পি আইল্যাণ্ড থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো।

তিন

এডিনবরা, স্কটল্যাণ্ড। রাত আটটা।

চেম্বারস্ স্ট্রিটের দশতলা উঁচু একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি ক্যাব। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। বুক ভরে টেনে নিল জন্মভূমির বাতাস। মনে হচ্ছে যেন বহুযুগ পর ফিরে এসেছে মায়ের কোলে। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র ন'মাস।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল হেণ্ডারসন। লিফটে চেপে উঠে এল ছ'তলায়। আনমনে প্রিয় একটা গানের সুর ভাঁজছে। করিডোর ধরে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোল, সামান্য সময়ের জন্য থামল পাশের বাসার দরজায়। বেল চাপতেই ষাটোর্ধ্ব মিসেস বেলমণ্ড দরজা খুললেন।

'ওয়েসলি! হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইয!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'তুমি ফিরে এলে?'

'গুড ইভ্‌নিং, মিসেস বেলমণ্ড,' হাসল হেণ্ডারসন। 'জী, এইমাত্র পৌঁছুলাম। কেমন আছেন আপনি?'

'ভাল, ভাল। থাকার জন্য এসেছ তো? নাকি দু'দিন পরেই আবার কেটে পড়বে?'

'না, না। আপাতত আর কোথাও যাচ্ছি না। প্রজেক্টের কাজ শেষ।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। তুমি ছিলে না, এতদিন বুকটা খাঁ খাঁ করছিল। ভাল কথা, ডিনার করেছ?'

'জী না, তবে আপনার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ফ্রেশ হয়ে কোনও রেস্টুরেন্টে চলে যাব।'

'এটা কোনও কথা হলো?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস বেলমণ্ড। 'আমি থাকতে তুমি রেস্টুরেন্টে যাবে কেন?'

'না, মানে...'

'কোনও কথা শুনতে চাই না,' বাধা দিলেন ভদ্রমহিলা। 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে জামা বদলাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

'সো নাইস অভ ইউ!' হাসল হেণ্ডারসন, সরে এল স্নেহময়ী মহিলার দরজা থেকে। চাবি বের করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের তালা খুলতে খুলতে অনুভব করল, গোটা দুনিয়ায় ওর আপন বলে যদি কেউ থেকে থাকে, তা হলে সে এই মিসেস বেলমণ্ড। বাবা-মা মারা গেছেন অনেক বছর আগে, ভাই-বোন বা আত্মীয়স্বজন নেই হেণ্ডারসনের। পাশের বাড়ির নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাটিই আদর-স্নেহ দিয়ে ওর মনের বড় একটা জায়গা দখল করে রেখেছেন। সত্যি বলতে কী, ওঁর কারণেই অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়েনি হেণ্ডারসন। ন'মাস ধরে দেশের বাইরে... বাড়ির ভাড়াটা জমালেও অনেক টাকা হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে হারাতে হতো মমতাময়ী মহিলাটিকে।

বেডরুমে ঢুকে সুটকেসটা নামিয়ে রাখল হেণ্ডারসন। জ্যাকেট আর টাই খুলতে খুলতে লক্ষ করল, টেলিফোনের আন্সারিং মেশিনের লাল বাতিটা জ্বলছে-নিভছে। তারমানে মেসেজ জমা হয়ে রয়েছে ওতে। বিছানায় বসে আন্সারিং মেশিনের প্লে বাটন চাপল ও, জুতো খুলতে খুলতে মেসেজ শুনবে।

'ওয়েসলি, দিস ইজ মরগান...' স্পিকারে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'সামথিং ইজ রং! তুমি খবরের কাগজ দেখেছ? না দেখে

থাকলে এখুনি দেখো... ফর গডস্ সেক! *টাইমস্ টুডে*... তৃতীয় পৃষ্ঠা!'

ভুরু কুঁচকে গেল হেণ্ডারসনের, ক্লাইভ মরগান ওর সহকর্মী এক বিজ্ঞানী, সদ্য শেষ হওয়া প্রজেক্টটাতে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। উঁকি দিয়ে আন্সারিং মেশিনের ডিসপ্লে দেখল—মেসেজটা পনেরো দিনের পুরনো। কীসের কথা বলছে মরগান? কী আছে ওই পেপারে?

ভাবনাটা শেষ না হতেই দ্বিতীয় মেসেজ বাজতে শুরু করল। এটাও মরগানের।

'ওয়েসলি, দোহাই লাগে! আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' আবার ঘটেছে ব্যাপারটা। আজকের *টাইমস্ টুডে*-র তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাবে খবরটা...

পরবর্তী কয়েক মিনিটে বিচলিত হয়ে পড়ল হেণ্ডারসন। সাতটা মেসেজ শোনা হয়ে গেছে ততক্ষণে, সবগুলোই মরগানের তরফ থেকে। প্রতিটাতেই একেক দিনের খবরের কাগজ দেখতে বলছে সে। কিছু একটা নিয়ে ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। ব্যাপারটা হালকাভাবে নেবার উপায় নেই। পত্রিকাগুলো জোগাড় করতে হবে।

শেষ মেসেজটা পাঁচ দিন আগের, তাতে মরগান বলছে, 'মনে হচ্ছে তুমি বাড়িতে নেই, ওয়েসলি। কিংবা বাকিদের মত তুমিও...। এনিওয়ে, এই মেসেজ যখনই পাও, দয়া করে যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে, দেরি কোরো না। সবগুলো পেপার কাটিং আমি তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা হলেই বুঝবে, আমি কেন এতটা উদ্বিগ্ন...'

তাড়াতাড়ি ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল হেণ্ডারসন, ডায়াল করল মরগানের নাম্বারে। জানা দরকার কী ঘটেছে।

বেশ কয়েকবার রিং হলো, তারপর রিসিভ করা হলো কল।

ওপাশ থেকে ধরা গলায় কেউ বলল, 'হ্যালো?'

'হ্যালো, আমি ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন বলছি। এটা কি ড. ক্লাইভ মরগানের নাম্বার?'

'জী। আমি মিসেস মরগান।'

'গুড ইভনিং, মিসেস মরগান। আপনার স্বামীকে একটু ডেকে দেবেন? আমরা পুরনো সহকর্মী।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

'জী, এডিনবরা থেকে। দেশের বাইরে ছিলাম, আজই ফিরেছি...'

'তারমানে আপনি জানেন না? ক্লাইভ তো...' ফুঁপিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'ক...কী হয়েছে ওর?'

'ও নেই, ড. হেণ্ডারসন! গত পরশু... হাঁটতে বেরিয়েছিল... রাস্তা পার হবার সময় একটা গাড়ি এসে...' কথা আটকে যাচ্ছে মিসেস মরগানের।

থমকে গেল হেণ্ডারসন। কী শুনছে ও! মরগান মারা গেছে? গাড়িচাপা পড়ে? অ্যাকসিডেন্ট? নাকি অন্যকিছু?

আর কিছু ভাবতে পারল না ও। কোনোমতে দুঃখ প্রকাশ করল, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার। হাতমুখ আর ধোয়া হলো না, স্থবির হয়ে গেল হেণ্ডারসন। মনে পড়ে যাচ্ছে ন'মাস আগের কথা।

এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রিতে শিক্ষকতা করছিল তখন ও, এমন সময় পেল চমৎকার একটা চাকরির অফার। যে-কোনও রিসার্চ কেমিস্টের জন্য ওটা একটা স্বপ্ন—সম্পূর্ণ গবেষণাধর্মী একটা প্রজেক্টে যোগ দেয়ার আহ্বান। বেতনও আকাশচুম্বী। দেরি না করে ইণ্টারভিউ দিল হেণ্ডারসন, চাকরিটা নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ইস্তফা দিয়ে প্রজেক্টে যোগ দিল।

ব্যস্ততার সীমা ছিল না কাজটাতে, সেই সঙ্গে বজায় রাখতে হয়েছে কঠোর গোপনীয়তা। প্রজেক্টের অনেকগুলো টিমের মধ্যে একটার নেতৃত্ব দেয়া হয় ওকে। ক্লাইভ মরগান ছিল ওর-ই টিম মেম্বার। ওদের গবেষণার বিষয় ছিল *এনযাইম*, বা জটিল প্রোটিন, যা বিভিন্ন ধরনের বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তৈরি করে।

চরম গোপনীয়তার মধ্যে ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে চলছিল গবেষণা। থাকা-খাওয়ার কোনও সমস্যা ছিল না, রীতিমত রাজার হালে রাখা হয়েছিল সবাইকে। নিষেধাজ্ঞা ছিল শুধু বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে। বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু মোটা অঙ্কের বেতন পাওয়ায় এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য করেনি কেউ। হেণ্ডারসনের মনে কোনও খেদ ছিল না, আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই ওর, নিজের পেশাটাই ওর জন্য সবকিছু। গবেষণায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল জগৎসংসার ভুলে।

শুরুতে অনেকগুলো দিন চমৎকার কেটেছিল। কিন্তু তারপরই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদয় হয়। হেণ্ডারসন আর মরগান-সহ বেশ কয়েকজন সরাসরি মুখোমুখি হয়েছিল নিয়োগকর্তাদের, জবাব চেয়েছিল। কিন্তু জবাব দেয়া হয়নি ওদেরকে, তার বদলে প্রজেক্টের কাজ স্থগিত করে ছুটি দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানীদের। বলা হয়েছে, প্রজেক্টের অগ্রগতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সবাইকে পরে আবার খবর দেয়া হবে। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছিল বিজ্ঞানীরা, প্রজেক্টের উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সবাই ফিরে গেছে যে-যার বাড়িতে।

অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল হেণ্ডারসন। পিছুটান নেই ওর, বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না। তাই ও চলে গিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে, বেড়ানোর জন্য। মাসখানেক ভ্রমণের পর আজই ফিরে এসেছে

ঘরে পা রাখতে রাখতে এই দুঃসংবাদ! মরগানের মৃত্যুটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অত্যন্ত সতর্ক প্রকৃতির লোক ছিল সে; না দেখে সে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির তলায় পড়বে... এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য! মনের ভিতর কুডাক শুনতে পাচ্ছে হেণ্ডারসন

দরজায় শব্দ হলো, তারপর ডাক। 'ওয়েসলি! কোথায় তুমি? আমি খাবার নিয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি এসো!'

মিসেস বেলমণ্ড

ঝট করে সোজা হলো হেণ্ডারসন। একটা কথা মনে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে।

'এ কী!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন মিসেস বেলমণ্ড। 'তুমি তো দেখছি কাপড়ই বদলাওনি.

'মিসেস বেলমণ্ড!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল হেণ্ডারসন। 'আমার চিঠিপত্র কোথায়? সব তো আপনার ঠিকানায় ফরওয়ার্ড করে রেখে গিয়েছিলাম!'

'আছে. সবই আছে। বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিয়েছি।' ডাইনিং টেবিলে খাবারের পাত্র রাখতে রাখতে আশ্বস্ত করলেন বৃদ্ধা। এখন তুমি খেতে এসো।'

'না, এখুনি দরকার চিঠিগুলো,' বলল হেণ্ডারসন। 'প্লিজ, ব্যাপারটা জরুরি।'

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হলেন বৃদ্ধা। তবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পর হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে এলেন। প্রায় ছোঁ মেরে বাণ্ডিলটা তাঁর হাত থেকে নিল হেণ্ডারসন, বাঁধন খুলে দেখতে শুরু করল একেকটা খাম। ক্লাইভ মরগানের পাঠানো প্যাকেজটা পেতে দেরি হলো না। কাঁপা কাঁপা হাতে খামের মুখ ছিঁড়ল ও, ভিতর থেকে বের করে আনল অনেকগুলো পেপার কাটিং। চোখ বোলাল ওগুলোর উপর।

শিরোনাম ভিন্ন, কিন্তু ভিতরের বিষয়বস্তু প্রায় সবক'টারই এক। যেমন:

গাড়ি দুর্ঘটনায় বিজ্ঞানীর মৃত্যু...

অগ্নিকাণ্ডে বিজ্ঞানী নিহত...

স্কিয়িং অ্যাকসিডেন্ট প্রাণ কেড়ে নিল উদীয়মান বিজ্ঞানীর...

স্ত্রী-সন্তানকে হত্যার পর বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা...

যেন মড়ক লেগেছে বিজ্ঞানী-সমাজে, গত এক মাসে মারা গেছে সাত-আটজন বিজ্ঞানী। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, মৃতদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে হেণ্ডারসন; সদ্য-সমাপ্ত প্রজেক্টে এদের সবাই ওর সঙ্গে কাজ করেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল ওর, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—*পালাও! নইলে তোমারও একই দশা হবে!*

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না হেণ্ডারসন, দেরি করবার কিছু নেইও। সুটকেস গোছানোই আছে, শুধু বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, ঘুরল মিসেস বেলমণ্ডের দিকে।

'মাফ করবেন, মিসেস বেলমণ্ড। আমাকে এখুনি আবার বেরুতে হবে।'

'বেরুতে হবে মানে! খালিপেটে কোথায় যাবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বৃদ্ধা।

'দুঃখিত, এ-মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না। আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

একছুটে বেডরুমে ঢুকে জুতো পরল হেণ্ডারসন, তারপর বেরিয়ে এল সুটকেস নিয়ে। মিসেস বেলমণ্ডকে প্রায় জোর করে বের করল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা গুঁজে দিল বৃদ্ধার হাতে।

'বাড়িটা দেখেশুনে রাখবেন...

'ওয়েসলি, মাই চাইল্ড... কী হয়েছে বলো আমাকে! তোমার চেহারা এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেন?'

'যত কম জানবেন, ততই মঙ্গল,' তাড়াতাড়ি বলল হেণ্ডারসন। 'প্লিজ, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না! আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।'

'নিশ্চয়ই...'

বৃদ্ধাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না হেণ্ডারসন। লিফটে ঢুকে পড়ল। নেমে এল গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বিল্ডিঙের উপর নিশ্চয়ই নজর রাখছে শত্রুরা। ওকে বাগে পাবার এটাই একমাত্র উপায়। মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে বেরুনোর সাহস পেল না, উল্টো ঘুরে চলে গেল বিল্ডিঙের পিছন দিকে, সার্ভিস ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কানাগলিতে।

গলির মুখে বড় রাস্তা, ওখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল হেণ্ডারসন। কপাল ভাল বলতে হবে! ডাকার ভঙ্গিতে হাত তুলতেই ছুটে এল ট্যাক্সিটা, ঘ্যাচ করে দাঁড়াল ওর জুতো থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে। দরজা খুলে উঠে বসল ও।

'এয়ারপোর্ট! জলদি!!' হুকুমের সুরে বলল হেণ্ডারসন। 'বাড়তি বখশিশ পাবে।' যোগ করল লোভ দেখানোর জন্য।

দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ট্যাক্সি। ডান দিকে একটা গলি পড়ল, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আড়চোখে তাকাল ড্রাইভার। গলির একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো একটা ক্যাডিলাক। হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একজন লোক তাড়াহুড়ো করে উঠছে তাতে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল হেণ্ডারসন, ক্যাডিলাকটাকে দেখতে পায়নি। ভাবল, যাক, নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বিল্ডিং থেকে। কেউ বাধা দেয়নি। এয়ারপোর্টে

পৌঁছুতে পারলেই হয়, যে-ফ্লাইট পাবে, সেটারই টিকেট কেটে উঠে বসবে। বিমান ওকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটা পরে দেখা যাবে।

চোরা চোখে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাচ্ছে ড্রাইভার, হেণ্ডারসনকে দেখে ভাব-সাব বোঝার চেষ্টা করছে।

হাইওয়েতে এসে পড়ল ট্যাক্সি। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে এক হাত দিয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা অ্যারোসল স্প্রের বোতল তুলে নিল ড্রাইভার।

মুখ তুলল হেণ্ডারসন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় সিটের উপর ঘুরে গেল ড্রাইভার, আরেক হাত বাড়িয়ে দিল হেণ্ডারসনের দিকে। চমকে উঠে ফিরতে শুরু করল হেণ্ডারসন। দম আটকে রেখেছে ড্রাইভার, বোতাম টিপে ওর একেবারে মুখের উপর গ্যাস স্প্রে করল সে।

কয়েক সেকেণ্ডেই সিটের উপর এলিয়ে পড়ল হেণ্ডারসন, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

সোজা হয়ে বসল ড্রাইভার, আরোহীর কী অবস্থা হলো দেখার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করল না। হাইওয়ে থেকে নেমে একটা সাইড রোডে ঢুকল ট্যাক্সি। ঠিক একেবারে পিছনে চলে এসেছে ক্যাডিলাক।

থামল দুটো গাড়িই। অজ্ঞান বিজ্ঞানীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে ওঠানো হলো ক্যাডিলাকে। ট্যাক্সিটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে ড্রাইভারও উঠল ওই গাড়িতে। রওনা হয়ে গেল অজানার উদ্দেশে।

কয়েক ঘণ্টা পর উদার হস্তের চড়-চাপড় আর পানির ছিটা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এল হেণ্ডারসনের। ঘোর ঘোর ভাব লেগে রয়েছে, ওই অবস্থাতেই আবিষ্কার করল, ছোট আকারের একটা প্রাইভেট

জেটের প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। হাত-পা বাঁধা। ইঞ্জিনের আওয়াজে মনে হলো, উড়ছে বিমানটা। মাথাটা একবার এপাশ-ওপাশ করল হেণ্ডারসন, ভাল করে তাকাল। মুখোমুখি সিটে রুক্ষ চেহারার একজন যুবক বসে আছে।

'ওয়েলকাম ব্যাক, ডক্টর!' হাসিমুখে বলল সে।

'কে তুমি?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল হেণ্ডারসন। মুখের ভেতর অস্বাভাবিক বড় লাগছে জিভটাকে। ঠোঁট জোড়া সীসার মত ভারী। অ্যারোসল স্প্রে-তে এরা কী ব্যবহার করেছে কে জানে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ও।

'আমার পরিচয় নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে,' বলল যুবক। 'রিল্যাক্স, এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাকে?' খসখসে কণ্ঠে প্রশ্ন করল হেণ্ডারসন। 'মেরে ফেলতে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল যুবক। 'মারতে চাইলে তো এডিনবরাতেই কাজটা করতে পারতাম।'

'তা হলে?'

'আপনাকে নিয়ে, ডক্টর,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল যুবক, 'আমাদের অন্যরকম প্ল্যান আছে।'

চার

ফ্রেঞ্চ আল্পস পর্বতমালা।

উঁচু-নিচু উপত্যকা আর গিরিখাদের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে একটি *অ্যারোস্প্যাশিয়াল অ্যালিউট* লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার। বিশাল প্রকৃতির মাঝে ওটাকে দেখাচ্ছে নগণ্য একটা বিন্দুর মত। কপ্টার আকাশছোঁয়া একটা পর্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি পৌছুতেই প্যাসেঞ্জার সিটে বসা স্টিভেন ক্যাসিডি নড়ে উঠল, আঙুলের ইশারায় তার সহযাত্রীকে দেখাল সামনের পাহাড়টা।

'ওটাই *ল্য ডরমেয়ার,*' বলল ও। 'মানে, ঘুমন্ত মানুষ। প্রোফাইলটা ভাল করে দেখো, ঘুমন্ত চেহারার সঙ্গে মিল পাবে ওটার।'

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আছে ক্যাসিডি, গ্লেসিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। বয়স চল্লিশ ছুঁলেও আচার-আচরণ তরুণদের মত। উচ্ছল। চঞ্চল। অত্যন্ত সুদর্শন, চুল-দাড়ি কেটে ফিটফাট থাকতে পছন্দ করে। তবে বেশ কিছুদিন ফিল্ডে কাটানোয় এখন তার চেহারা হয়ে গেছে বুশ পাইলটদের মত। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাদামি চুল বাবরি হয়ে নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত; তার ওপর মাথায় পরেছে এভিয়েটর হেলমেট, চোখে ফ্লাইং গগলস্।

পর্বতশৃঙ্গটা ভাল করে দেখল কপ্টারের দ্বিতীয় যাত্রী জেফ কলিন্স। মন্তব্য করল, 'পোয়েটিক লাইসেন্স বোধহয় একেই বলে, স্টিভ। হ্যাঁ... ভুরু, নাক আর থুতনির মত আকৃতি দেখতে পাচ্ছি বটে; কিন্তু তাই বলে মুখটাকে ঘুমন্ত ভাবা ঠিক না।'

আউটসাইড নামের একটা ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে কলিন্স, বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। ক্যাসিডির ঠিক বিপরীত বলা যায় তাকে। বয়সে তরুণ হলেও তারুণ্য নেই ওর মাঝে, সারাক্ষণ এক ধরনের ভারিক্কি ভাব বজায় থাকে। ক্যাসিডি তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সেই সূত্রেই জানতে পেরেছে আল্পস্ পর্বতমালার গভীরে চলতে থাকা সায়েন্টিফিক প্রজেক্টের খবর। বিষয়টা ইন্টারেস্টিং, ওটার উপর প্রতিবেদন লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। হাতেকলমে সবকিছু দেখাবার জন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাসিডি।

হেলিকপ্টারের বাইরে, আল্পসের নির্মল বাতাস এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করেছে। পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে বড্ড কাছে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। প্রকৃতির এই প্রতারণায় প্রভাবিত হলো না হেলিকপ্টারের অভিজ্ঞ পাইলট, কোর্স মেইনটেন করে পেরিয়ে এল পর্বতশৃঙ্গকে। সামনে একটা খাড়া রিজ দেখা গেল, ওটা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে উচ্চতা কমিয়ে আনল।

প্রকৃতির শুভ্র পটভূমিতে বিশাল একটা মাউনটেইন বেসিন দেখতে পেল কলিন্স, প্রায়-নিখুঁত একটা বৃত্তাকার হ্রদ আছে তলায়। সময়টা গ্রীষ্মকাল হলেও পানিতে ভাসছে বড় বড় বরফের চাঁই।

'*লক দ্য ডরমেয়ার*, বা ডরমেয়ার লেক,' ঘোষণা করার সুরে বলল ক্যাসিডি। 'বরফ যুগে গ্লেসিয়ার ক্ষয়ে গিয়ে উৎপত্তি হয়েছে এর, গর্তটা সেই থেকে ভরে রাখছে গ্লেশ্যাল ওআটর।'

'আমার দেখা সবচেয়ে বড় মার্টিনি অন দ্য রকস্!' কৌতুক

করল কলিন্স।

ক্যাসিডি হাসল। 'তাই বলে স্বাদ নিতে যেয়ো না। দাঁত-জিভ সব বরফ হয়ে যাবে।' আঙুল তুলে হ্রদের এক কিনার দেখাল। পাহাড়ের গা কেটে ওখানে অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে--সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া, মাঝখানে একটা বড় বিল্ডিং। ছোট-বড় নানা আকারের টিনের শেড ঘিরে রেখেছে বিল্ডিংটাকে। 'ওটা পাওয়ার প্ল্যান্ট। সবচেয়ে কাছের শহরটা মাউন্টেইন রেঞ্জের ওপারে।'

লেকের সারফেসে স্থির হয়ে থাকা একটা বড় জাহাজের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেকে নানা ধরনের ক্রেন, বুম আর উইঞ্চের ছড়াছড়ি। তা লক্ষ করে কলিন্স বলল, 'কী করছে ওরা?'

'ঠিক শিয়োর না, সম্ভবত কোনও আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট,' কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। 'বেশ কয়েকদিন হলো এসেছে।'

'লেকের মাঝখানে জাহাজ এল কোত্থেকে?'

'ওই যে, একটা নদী বেরিয়েছে লেক থেকে,' আঙুল তুলে ডানদিক দেখাল ক্যাসিডি, 'ওটা ধরে এসেছে।'

'গ্লেশ্যাল লেকে আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট? ইন্টারেস্টিং!' খুশি হয়ে উঠল কলিন্স। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। বাড়তি একটা ফিচার নিয়ে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে সম্পাদক।

কয়েক মুহূর্ত পরই সামনের দৃশ্য দেখে দুই ফিচারের কথা ভুলে গেল সে। হ্রদের একপ্রান্তে, বিশাল এক জমাট বরফের চাঁই দিয়ে রুদ্ধ করে দিয়েছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাঁজ। সোনা রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে ওখানে, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

'ওয়াও!' নিজের অজান্তেই বলে উঠল কলিন্স। 'ওটাই আমাদের গ্লেসিয়ার?'

'জী, জনাব!' নাটুকে কণ্ঠে বলল ক্যাসিডি। 'ইম ল্যাণ্ড দ্য ডরমেয়ার... মানে ঘুমন্তের জিহ্বা। সহজ ভাষায় ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারও বলতে পারো।'

বরফের বিস্তারের উপর দিয়ে একটা চক্কর দিল হেলিকপ্টার। বোঝা গেল, চওড়া এক উপত্যকাকে ঢেকে দিয়েছে এই গ্লেসিয়ার, মিশেছে ডরমেয়ার লেকের গায়ে। কালো পাথরের ভাঙাচোরা ফুটহিল ঘিরে রেখেছে গ্লেসিয়ারকে, কিনারগুলো এবড়ো-খেবড়ো। বরফের রঙও পুরোপুরি সাদা নয়, কালের প্রবাহে নীলচে বর্ণ ধারণ করেছে।

'জিভের রঙ পাল্টে গেছে,' ঠাট্টা করে বলল কলিন্স। 'ঘুমন্ত মানুষটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ভাল বলেছ,' হাসল ক্যাসিডি। 'হোল্ড অন, এবার ল্যাণ্ড করব আমরা।'

বাঁক নিয়ে গ্লেসিয়ারের উপর থেকে সরে এল হেলিকপ্টার। লেকের পাড় থেকে একশ' গজ দূরে একখণ্ড সমতল জায়গায় ল্যাণ্ড করল। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই নেমে পড়ল আরোহীরা। কপ্টারের পিছন থেকে মালামালের কার্টন নামাতে শুরু করেছে পাইলট, তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল ক্যাসিডি। কলিন্সকে পরামর্শ দিল হাঁটাহাঁটি করে হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে।

গুটি গুটি পায়ে পানির কাছে চলে গেল সাংবাদিক। হ্রদের পানি একেবারে নিথর হয়ে আছে, একটাও ঢেউ নেই। পায়ের কাছ থেকে একটা নুড়িপাথর তুলে পানিতে ছুঁড়ে মারল কলিন্স। মৃদু শব্দ হলো, ডরমেয়ার লেকের বুকে সৃষ্টি হলো ছোট ছোট তরঙ্গের। এবার কলিন্সের চোখ আটকে গেল তীর থেকে সিকি মাইল দূরে নোঙর করে থাকা জাহাজটার উপর। সারা শরীর আকাশী নীল, একপাশে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে: *নুমা!*

ভুরু কুঁচকে গেল সাংবাদিকের। নুমা, বা ন্যাশনাল

আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি সম্পর্কে জানা আছে তার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র-গবেষণাধর্মী সরকারী সংস্থা ওটা, ডিরেক্টরের নাম অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন—কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি। কিন্তু সমুদ্র থেকে এত দূরে নুমার জাহাজ কী করছে?

বুঝতে পারছে কলিন্স, ভাল একটা স্টোরির খোঁজ পেয়েছে। নুমার অভিযান যেনতেন ব্যাপার নয়। ইচ্ছে হলো এখুনি ছুটে যায় জাহাজটায়, খোঁজ নেয় অভিযান সম্পর্কে... কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। হাতছানি দিয়ে ক্যাসিডি ডাকছে ওকে। লক্কড়ঝক্কড়-মার্কা একটা সিত্রোঁ সেডান এগিয়ে আসছে ল্যান্ডিং প্যাডের দিকে, ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

একটু পরেই হেলিকপ্টারের পাশে এসে থামল সিত্রোঁ। মোটাসোটা একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে, গাড়িটা তাঁর জন্য আকারে একটু ছোটই হয়ে গেছে। মানুষটা মাঝবয়েসী, গায়ের রঙ শ্যামলা, লম্বা চুল ঝুঁটি বেঁধে রেখেছেন, মুখভর্তি ঘন কালো দাড়ি।

'ওয়েলকাম ব্যাক, প্রফেসর,' ক্যাসিডির সঙ্গে করমর্দন করে বললেন ভদ্রলোক, কণ্ঠে কড়া ফরাসি টান। তাকালেন কলিন্সের দিকে। 'আপনি নিশ্চয়ই মসিয়ো কলিন্স? দ্য গ্রেট রিপোর্টার?' হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি ড. জাঁ দ্যুবোয়া। ওয়েলকাম টু ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার।'

'ধন্যবাদ, ড. দ্যুবোয়া,' হাত মিলিয়ে বলল কলিন্স। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা কাজ করছেন আপনারা, সবকিছু নিজ চোখে দেখার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'খুব ভাল। পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্‌। স্টিভ ঠিক সময়েই পিকআপ করেছে আমাকে। একটুও অপেক্ষা করতে হয়নি।'

'আসুন তা হলে,' প্রায় জোর করেই কলিন্সের হাত থেকে ওর ডাফল ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন দ্যুবোয়া। 'ফিফি অপেক্ষা করছে।'

'ফিফি?' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ক্যাসিডির দিকে তাকাল কলিন্স।

'ডক্টরের গাড়ি...' ইশারায় দেখাল ক্যাসিডি, 'ওটাকেই ফিফি বলে ডাকেন উনি।'

'কারেক্ট!' বললেন দ্যুবোয়া। 'পরের প্রশ্নটা কী হবে, তাও আন্দাজ করতে পারি। মেয়েলি নাম রেখেছি কেন, এই তো?'

'ঠিকই ধরেছেন।' কলিন্স হাসল।

'কারণ আমার ফিফি হলো আদর্শ নারীর প্রতিচ্ছবি। অত্যন্ত পরিশ্রমী... বিশ্বস্ত... এবং রূপসী! কোনও কোনও সময়ে দেমাগীও বটে!'

'ব্যস, ব্যস, আমি কনভিন্সড!' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল কলিন্স। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

হেলিকপ্টারে আনা মালপত্র সিট্রোঁর ছাতের র‍্যাকে তুলে ফেলা হলো। সামনে, দ্যুবোয়ার পাশে বসল ক্যাসিডি, পিছনের সিটে কলিন্স। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালেন ডক্টর, কাঁকরে ভরা ভূমির উপর দিয়ে ফিফিকে ফিরতি পথে ছোটালেন। গ্লেসিয়ারের ডানদিকে অতিকায় পাখির মত ডানা মেলে থাকা পর্বতশ্রেণীর গোড়া লক্ষ্য করে এগোচ্ছেন। গাড়িটা দূরে সরে যেতেই টেকঅফ করল হেলিকপ্টার, উচ্চতা বাড়িয়ে রিজ টপকাল, হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

'আমাদের সাবগ্লেশ্যাল অবজারভেটরির ব্যাপারে কী শুনেছেন আপনি, মসিয়ো কলিন্স?' মাথা না ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন ড. দ্যুবোয়া।

'প্লিজ, আমাকে জেফ বলে ডাকুন,' বলল কলিন্স, তারপর জবাব দিল প্রশ্নের। 'খুব বেশি কিছু না। তবে শুনেছি, নরওয়ের স্ভারটিসেন গ্লেসিয়ারের মতই সেটআপ আপনাদের।'

'ঠিক বলেছ।' সিটের উপর একটু ঘুরল ক্যাসিডি। 'গভারটিসেন ল্যাব হলো বরফের সাতশো ফুট গভীরে, আর আমাদেরটা প্রায় আটশো। তবে দু'জায়গাতেই একই ধরনের কাজ চলছে। গ্লেশ্যাল ওঅটরকে টারবাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হচ্ছে।'

'পানির প্রবাহ টারবাইন পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে কীভাবে?' জানতে চাইল কলিন্স।

'গ্লেসিয়ারের তলায় অনেকগুলো টানেল খুঁড়েছে ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের অবজারভেটরিও অমন একটা টানেলের মধ্যে বসানো হয়েছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, আমরা শুধু ওদের সাহায্য নিয়ে নিজস্ব গবেষণা চালাচ্ছি।'

পাইনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সিত্রোঁ। ট্র্যাকটা অত্যন্ত সরু, মাটিও এবড়ো-থেবড়ো। ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি, বিচ্ছিরি শব্দে প্রতিবাদ করছে ইঞ্জিন—পুরনো, লক্কর-ঝক্কড় গাড়ির উপযোগী নয় মোটেই রাস্তাটা।

'ফিফি মনে হয় রেগে যাচ্ছে,' টিটকিরির সুরে বলল ক্যাসিডি। 'বয়স হয়েছে তো, বুড়ো হাড়ে এমন ঝাঁকুনি সহ্য হচ্ছে না।'

'ওকে তুমি চেনো না,' কথাগুলো গায়ে না মেখে বললেন দ্যুবোয়া। 'শরীর বুড়ো হতে পারে, কিন্তু মনটা ওর চিরতরুণ।'

কথায় না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। কলিন্স উঁচু গলায় হেসে উঠল।

মিনিটদশেক এগোনোর পর গাড়ি থামালেন দ্যুবোয়া। বললেন, 'এখানেই নামতে হবে। ফিফি আর সামনে যাবে না।'

নেমে পড়ল যাত্রীরা। সামনে একটা ভাঙাচোরা কাঠের সেতু দেখতে পেল কলিন্স, নীচে গভীর পাহাড়ি ফাটল। সিত্রোঁর ওজন সইতে পারবে না ওই সেতু। সঙ্গীদেরকে একটা করে শোল্ডার

হারনেস দিলেন দ্যুঁবোয়া, নিজেও নিলেন একটা। সাপ্লাইয়ের কার্টনগুলো হারনেসে বেঁধে পিঠে ঝোলাতে হবে।

'কুলিগিরি করাচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না,' বলল ক্যাসিডি। 'আসলে... এখানে জিনিসপত্রের বড্ড অভাব কি না! তোমার সঙ্গে নতুন সাপ্লাই আনার সুযোগটা তাই হাতছাড়া করতে পারিনি।'

'কুলিগিরিতে আমার কোনও আপত্তি নেই,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল কলিন্স, 'যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাই আর কী!'

'পাচ্ছ তো! চমৎকার একটা ফিচার লেখার জন্য সমস্ত মালমশলা!'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ।'

'চলুন, এগোনো যাক।' বললেন ড. দ্যুঁবোয়া।

সেতু পেরিয়ে পাইনের বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল তিনজনে। সমতল পেরিয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই, এরপর ঢালু পথ—উপর দিকে উঠে গেছে। পিচ্ছিল, নুড়িপাথরে ভরা, বিপজ্জনক। ফাটলও দেখা গেল বেশ কিছু, বরফে ভরে আছে। লাফ দিয়ে পেরুতে হলো ওগুলো।

হাঁপাতে শুরু করল কলিন্স, কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয় ও। ওর গায়ের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে হারনেসে বাঁধা জিনিসপত্রের ওজন। বিশ মিনিট পর একটা পাহাড়ি শেলফে পৌঁছে যখন থামল দলটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেছে। আশপাশটা দেখে নিল চকিতে। লেকের সারফেস থেকে প্রায় দুইশ' ফুট উপরে উঠে এসেছে ওরা। গ্লেসিয়ারটা পাহাড়ি ঢালের আড়ালে পড়ে গেছে, তবে ওটার শীতল পরশ অনুভব করা যাচ্ছে এখান থেকেও। মনে হলো যেন রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলে রেখেছে কেউ।

'ওয়েলকাম টু আইস প্যালেস!' সহাস্যে বলল ক্যাসিডি। এক

৩।ন দাঁড়িয়ে শেলফের প্রান্তে পাহাড়ি প্রাচীরের গোড়াটা দেখাল। গোলাকার একটা ওপেনিং রয়েছে ওখানে।

'ওটা?' ভুরু কোঁচকাল কলিন্স। 'দেখে তো ড্রেনেজ পাইপের মত লাগছে।'

'এসো, ভাল করে দেখো,' আহ্বান জানাল ক্যাসিডি।

দুই বিজ্ঞানীর পিছু নিয়ে ওপেনিং দিয়ে ভিতরে ঢুকল কলিন্স। ছোট একটা প্যাসেজ ওটা, উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। ওটা ধরে একশ' ফুট এগুতেই বিশাল একটা টানেলে পৌঁছে গেল। ভিতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে, অদ্ভুত আভা ছড়াচ্ছে মেটামরফিক পাথরের কমলা-রঙা দেয়াল, তার উপর কালো পেইন্ট দিয়ে ডোরা কাটা ডিজাইন রয়েছে।

'ওরে বাবা!' সবিস্ময়ে বলে উঠল কলিন্স। 'এখানে তো রীতিমত একটা ট্রাক ঢোকানো যাবে!'

'ট্রাক কেন, ডাবল-ডেকার বাসও ঢুকবে,' গর্বের সুরে বলল ক্যাসিডি। 'টানেলের ডায়ামিটার ত্রিশ ফুট।'

'হুম,' মাথা দোলাল কলিন্স। 'খালি ফিফিই ঢুকতে পারছে না। ওকে আনা গেলে আমাদেরকে আর মালপত্র বইতে হতো না। ঢাল দিয়ে যদি একটা রাস্তা করা যেত...'

'ফিফিকে ঢোকানো যায় তো!' বলল ক্যাসিডি। 'পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশে আরেকটা ওপেনিং আছে, ওখান দিয়ে অনায়াসে আনা যায়।'

'তা হলে আমরা খামোকা হেঁটে মরছি কেন?'

'দ্যুবোয়ার ধারণা, টানেলের ভিতরে ড্রাইভ করলে ফিফির ক্ষতি হবে।'

'ও বড্ড নাজুক,' কৈফিয়তের সুরে বললেন দ্যুবোয়া। তারপর টানেলের দেয়ালে ফিট করা একটা লকার খুলে রাবার বুট আর মাইনিং হেলমেট বের করলেন সবার জন্য।

গ্লা আর হেলমেট পরে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। কদাচিৎ একটা-দুটো বালব জ্বলতে দেখা যায়, নইলে সামনে নিকষ আঁধার, হেলমেটের হেডল্যাম্পের আলোয় সে-আঁধার মোটেও কাটে না।

'আলো নেই কেন এখানে? অন্ধকারে আমরা আবার পথ ভুল করব না তো?' শঙ্কা প্রকাশ করল কলিন্স।

'ভয়ের কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল ক্যাসিডি। 'টানেলের অলিগলি আমাদের মুখস্থ।'

'তারপরও... আলো থাকা উচিত ছিল।'

'টানেল খোঁড়ার সময় ইঞ্জিনিয়াররা প্রচুর বালব লাগিয়েছিল, এখন ফিউজ হয়ে গেছে। সময় আর লোকের অভাবে ওগুলো রিপ্লেস করা যাচ্ছে না।'

'অ।' মাথা ঝাঁকাল কলিন্স। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আচ্ছা স্টিভ, গ্লেসিয়োলজিতে তুমি আগ্রহী হয়ে উঠলে কীভাবে?'

'কেন, সাবজেক্টটা অদ্ভুত?' হাসল ক্যাসিডি।

'না, না, তা হবে কেন...'

'বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু তা-ই ভাবে। লক্ষ-কোটি বছরের পুরনো বরফের চাঁই নিয়ে গবেষণা করি আমরা। এর গুরুত্বই বা কী, এতে রোমাঞ্চ-আনন্দই বা কোথায়? রাইট?'

'কে বলেছে রোমাঞ্চ নেই?' বলে উঠলেন দ্যুবোয়া। 'বরফ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক এস্কিমো মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গিয়েছিল আমার। সে-নিয়ে যা ঘটেছে, লিখতে বসলে গোটা একটা মহাকাব্য হয়ে যাবে!'

ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গি শুনে হাসি চাপতে পারল না কলিন্স।

'স্পোকেন লাইক আ ট্রু গ্লেসিয়োলজিস্ট,' বলল ক্যাসিডি। 'আসল কথা হলো, আমরা প্রকৃতিপ্রেমী। বেশিরভাগ মানুষ বন-বনানী ভালবাসে, আমরা ভালবাসি বরফ। ওটাও তো

প্রকৃতিরই অংশ, তাই না? জীবনে প্রথম আইসফিল্ড দেখি আমি বারো বছর বয়সে, শুভ্র এই জগতের প্রেমে পড়ে যাই তখুনি। গ্লেসিয়োলজিকে নেশা আর পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি সে-কারণেই।'

'গ্লেসিয়োলজিস্টদের কাজ কিন্তু মোটেই সহজ নয়,' বললেন ড. দ্যুঁবোয়া। 'বরফের তলায় কেঁচোর মত বাস করতে হয় আমাদেরকে। দিনের পর দিন কেটে যায়, সূর্যের দেখা পাই না। আমাকে দেখুন, সাব-যিরো টেম্পারেচার আর হানড্রেড পারসেণ্ট হিউমিডিটি কী দশা করেছে শরীরের! লম্বা-চওড়া, হ্যাণ্ডসাম মানুষ ছিলাম আমি এককালে। এখন হয়ে গেছি বেঁটেভূত!'

'আপনি আবার হ্যাণ্ডসাম ছিলেন কবে?' ঠাট্টা করল ক্যাসিডি। 'সারাজীবন তো আপনাকে এই চেহারাতেই দেখছি।'

'হাহ্, যৌবনে তো দেখোনি আমাকে। মেয়েরা পাগল হয়ে যেত।'

'তারমানে সত্যিই পাগল ছিল ওরা।'

'কী বললে?' চটে উঠলেন দ্যুঁবোয়া।

তাড়াতাড়ি নাক গলাল কলিন্স। 'বাদ দিন স্টিভের কথা। আপনাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে বলুন। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই শুনলাম, তা হলে গবেষণা করছেন কী নিয়ে?'

'গ্লেসিয়ারের মুভমেণ্ট এবং তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিন বছরের একটা স্টাডি কণ্ডাক্ট করছি আমরা। নীরস সাবজেক্ট, তবে আশা করছি আপনার আর্টিকেলে ব্যাপারটা এক্সাইটিং করে ফুটিয়ে তুলবেন।'

'ওটা কঠিন নয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সারা দুনিয়ায় মাতামাতি হচ্ছে, গ্লেসিয়োলজির ব্যাপারে তাই অনেকেই ইদানীং আগ্রহী হয়ে উঠেছে।'

'না হয়ে উপায় আছে? জলবায়ু আর গ্লেসিয়ার ওতপ্রোতভাবে

সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর টেম্পারেচার বেড়ে গেলে গ্লেসিয়ার আর পোলার আইসক্যাপ গলতে শুরু করবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে, প্রত্যেকটি মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো তলিয়ে যাবে পানির নীচে।'

'ভয়াবহ একটা ঘটনা হবে ওটা,' স্বীকার করল কলিন্স।

'এই তো এসে গেছি,' বলে উঠল ক্যাসিডি। 'মাই ডিয়ার কলিন্স, *ক্লাব ডরমেয়ার*-এ স্বাগতম!'

ট্রেইলার হোম আকৃতির চারটা বিল্ডিং দেখতে পেল কলিন্স—টানেলের পাশে বিশাল এক খোঁড়ল বানিয়ে তার ভিতর স্থাপন করা হয়েছে ওগুলো। প্রথম বিল্ডিংটার দরজা খুলে ধরল ক্যাসিডি।

'এখানেই থাকি আমরা,' বলল সে। 'চারটে বেডরুম আছে, আটজন রিসার্চার থাকতে পারে। আর আছে কিচেন, বাথরুম এবং লিভিং রুম। আধুনিক আরাম-আয়েশের মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে... টেলিভিশন ছাড়া।'

'এ-মুহূর্তে কতজন আছে এখানে?' বিল্ডিঙে ঢুকে জানতে চাইল কলিন্স।

'তিনজন। ড. দ্যুবোয়া, আমি, আর আমার এক রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট। বাকিরা ছুটি কাটাতে গেছে।' শোল্ডার হারনেস খুলতে শুরু করল ক্যাসিডি। 'মালপত্র এখানেই নামিয়ে রাখো, তারপর তোমাকে ল্যাব দেখাতে নিয়ে যাবো।'

'কোথায় ওটা?'

'এখান থেকে আধঘণ্টার পথ। টানেল ধরে নীচে যেতে হবে। ওখানেই আমাদের অবজারভেটরি, রিসার্চ টানেল আর ল্যাব রুম। ফোন কানেকশন আছে ওখানে। দাঁড়াও, আমার সহকারীকে জানিয়ে দিই আমাদের আসার খবর।'

কাঁধ থেকে মালপত্র নামিয়ে ওয়াল-ফোনের রিসিভার কানে

ঠেকাল ক্যাসিডি। ডায়াল করে কথা বলতে শুরু করল। হঠাৎ ওর মুখের ভাব বদলে গেল।

'কী বললে?' অবিশ্বাস ফুটল ক্যাসিডির কণ্ঠে। 'আবার বলো!' চুপ করে কথাগুলো শুনল। 'ঠিক আছে, আমরা এখুনি আসছি।'

'কী হয়েছে, প্রফেসর?' ক্যাসিডি রিসিভারটা নামাতেই জিজ্ঞেস করলেন দ্যুবোয়া। 'কোনও সমস্যা?'

'অবিশ্বাস্য... অসম্ভব!!' বিড়বিড় করল ক্যাসিডি, ফরাসি বিজ্ঞানীর কথা যেন কানেই যায়নি।

'স্টিভ!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল কলিন্স। 'কী হয়েছে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল ক্যাসিডি। যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না, এমন সুরে বলল, 'আমার অ্যাসিসটেন্ট বলছে, ও একটা লাশ খুঁজে পেয়েছে... বরফে জমাট বাঁধা অবস্থায়!'

পাঁচ

ডরমেয়ার লেকের দুইশ' ফুট গভীরে, চরম শীতল পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি সাবমারসিবল। পরিবেশটা বিরূপ, কিন্তু ওটার গোলক-আকৃতির স্বচ্ছ অ্যাক্রিলিক ককপিটে বসে থাকা দুই নরনারীকে দেখে মনে হতে পারে, প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছে ওরা। যুবকটি সুদর্শন, সুঠামদেহী। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো

আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে মানুষটা, অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হলে, কিংবা কোথাও মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনও অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সঙ্গে সেটা ঠেকাবার জন্য ছুটে যেতে হয় ওকে। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে ওর। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান, জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশেষ স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র। শত্রুতাবশত কোন দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, নুমার এমন যে-কোনও শুভ ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আপত্তি নেই রানার; তা ছাড়া নুমার সঙ্গে রয়েছে ওর আত্মার সম্পর্ক। সে-কারণেই এবার ফ্রেঞ্চ আল্পসে এসেছে ও, লেক ডরমেয়ারের চরম শীতল পানিতে নতুন প্রযুক্তির একটি সাবমারসিবলের টেস্ট-ট্রায়ালে সাহায্য করতে। প্রযুক্তিটা আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের এক গুণী বিজ্ঞানী; নুমা থেকে কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে সাবমারসিবল তৈরির জন্য, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অনুরোধে। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছেন নুমার ডিরেক্টর, সেই সঙ্গে সাবমারসিবলের টেস্ট-ট্রায়ালের জন্য রানাকেও চেয়ে নিয়েছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন, নতুন সাবমারসিবল-টেকনোলজির ব্যাপারে বিভিন্ন মহল উৎসাহী হয়ে উঠবে। টেস্ট-ট্রায়ালের সঙ্গে যদি রানা জড়িত থাকে, তা হলে প্রযুক্তি-চুরির ভয় থাকে না।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকবার সাবমারসিবলের ব্লু-প্রিন্ট চুরির চেষ্টা চালিয়েছে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা, রানার কারণে সফল হতে পারেনি। তবে কঠিন সময়টা পেরিয়ে গেছে, নির্মাণশেষে জলযানটা নিয়ে আসা হয়েছে ডরমেয়ার লেকে, পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখার জন্য। আর্কিয়োলজিকাল একটা প্রজেক্টের জন্য নুমার জাহাজ *স্টারফিশ* এমনিতেই আসছিল আল্পসের এই হ্রদে, ওটায় তুলে দেয়া হয়েছে সাবমারসিবলটা। গত কয়েকদিন বেশ কয়েকবার ওটা নিয়ে পানিতে নেমেছে রানা, কোনও সমস্যা হয়নি। তাই আজ একজন সঙ্গী নিয়েছে।

মাসুদ রানা বিখ্যাত মানুষ, তাই বলে সাবমারসিবলের মহিলা যাত্রীটিকে হেলাফেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই। ফরাসি নাগরিক, পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ, নাম লুনা পারসেল। ফ্রান্সের বিখ্যাত সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। অত্যন্ত মেধাবী, নুমার ডরমেয়ার প্রজেক্টের মূল উদ্যোক্তা সে-ই। মেধার পাশাপাশি ওর রূপেরও কমতি নেই। ফর্সা-মসৃণ ত্বক, নিখুঁত মুখাবয়ব, ঢেউখেলানো গাঢ় বাদামি চুল আর অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব যে-কোনও সুপারমডেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বয়সও বেশি নয়, ত্রিশ ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি। এরই মধ্যে জাহাজের সবার মন জয় করে নিয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে রানার সঙ্গেও—যেন কত যুগের পরিচয়! মেয়েটিকে দেখলেই লুভার মিউজিয়ামের একটা পেইন্টিঙের কথা মনে পড়ে যায় রানার। কয়েক শ' বছর আগেকার একটা পোর্ট্রেট, তাতে অপরূপা এক তরুণীর ছবি এঁকেছেন শিল্পী অত্যন্ত দক্ষ হাতে। তুলির আঁচড়ে মেয়েটির দৃষ্টিতে বাসা বাঁধা দুষ্টুমি, নিষ্কলুষতা, আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লুনার মাঝে কেন যেন ছবির ওই তরুণীর চিহ্ন দেখতে পায় রানা।

‘পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও, মানসচোখে লুভারের পেইন্টিংটা ভাসছে।

একটু অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল লুনা। গ্লেশ্যাল জিয়োলজি নিয়ে কথা বলছিল দুজনে, এর মাঝে পুনর্জন্ম এল কোত্থেকে!

‘কী জানি, কখনও ভেবে দেখিনি,’ কাঁধ ঝাঁকাল ও। ‘হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?’

‘এমনিতেই। কোনও কারণ নেই,’ হাসল রানা। ‘তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?’

‘কীসের অসুবিধে?’

‘না... মানে, প্রথমবার সাবমারসিবলে চড়লে শারীরিক অসুবিধে হয় অনেকের। মাথা ঘোরে, দম আটকে আসে...’

‘ওসবের দিকে নজর দেবার সময় কই!’ উচ্ছ্বসিত গলায় বলল লুনা। ‘আমার তো এক্সাইটমেন্টই কাটছে না। ওফ্, আনবিলিভেবল! কখনও ভাবতে পারিনি, স্বচ্ছ একটা বুদবুদে চড়ে পানির তলায় ঘুরে বেড়াব।’

‘হুঁ, স্বীকার করছি, মিউজিয়ামের পুরনো বর্ম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার চেয়ে এটা অনেক বেশি এক্সাইটিং।’

‘মিউজিয়ামে আজকাল আমি খুব কম সময় কাটাই, রানা,’ লুনা বলল। ‘নিজস্ব রিসার্চ ওঅর্কের ফাণ্ড জোগাড়ের জন্য আমাকে কর্পোরেট জব করতে হয়।’

রানার কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। ‘তুমি হলে প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশেষজ্ঞ। কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা তোমাকে চাইবে কেন?’

‘খুব সহজ—ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার জন্য। বুঝিয়েই বলি। ব্যবসার জগৎ অত্যন্ত কঠিন, টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, সেই সঙ্গে জানতে হয়

প্রতিযোগীদের দমিয়ে রাখার নিয়ম।'

'নিয়মটা তুমি শেখাও?'

'না, আমি শুধু ওদের চিন্তাভাবনার পরিধি বাড়িয়ে দিই। লেকচার দিই, সিমিউলেশনের আয়োজন করি—পুরনো আমলের বিভিন্ন যুদ্ধের সিনারিয়ো রিক্রিয়েট করে তাতে ওদেরকে দুই পক্ষের দায়িত্ব নিতে দিই। এক ধরনের ওঅর গেম বলতে পারো। ক্লায়েন্টরা খুব এনজয় করে খেলাটা। মাথাও খোলে ওদের। প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্য নিত্যনুতন কৌশল আবিষ্কার করতে হয় কিনা!'

'শুনে তো খুব মজার মনে হচ্ছে।'

'আসলেই তাই। এতে আমিও লাভবান হচ্ছি। দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পাততে হচ্ছে না, নিজের টাকায় আর্কিয়োলজিকাল এক্সপিডিশন আয়োজন করতে পারছি।'

'কী খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি? প্রাচীন আমলের ট্রেড রুট?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'বিশাল একটা আবিষ্কার হবে, যদি প্রমাণ করতে পারি—এদিককার স্থলপথ ধরে এককালে বাণিজ্যিক মালামাল আনানেয়া করা হতো। পথটা *অ্যাম্বার রুট* নামে পরিচিত। আল্পসের ভিতরকার গিরিপথ আর উপত্যকার মাঝ দিয়ে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওখান থেকে ফিনিশিয়ান আর মিনোয়ান জাহাজে করে সব মাল নেয়া হতো ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে। আমার ধারণা, দুদিকেই চলত বাণিজ্য।'

'তোমার এই থিয়োরিটিক্যাল ট্রেড রুট তো অত্যন্ত জটিল।'

'এমনটা ভাবছ কেন?'

'বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে। স্থলপথে জিনিসপত্র নেয়ায় ঝক্কি অনেক।'

'তা তো বটেই। রুটটা গেছে সেল্ট আর ইট্রোস্ক্যান এলাকার মাঝ দিয়ে। বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ওদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে

চুক্তি করতে হয়েছিল। এর অর্থ বুঝতে পারছ? আধুনিক ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন আর নাফটা-র বহু আগেই এ-মহাদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওটাই আসলে প্রমাণ করতে চাই আমি।'

'প্রাচীন গ্লোবালাইজেশন? উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা লক্ষ্য—বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার শুভকামনা রইল।'

'শুভকামনার চেয়েও অনেক বেশি করছ। আসলে... নুমার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এতদূর এগোনো সম্ভব হতো না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার বাবার বিশেষ বন্ধু, তাই বলে গোটা একটা জাহাজ পাঠিয়ে দেবেন আমার এক্সপিডিশনের জন্য, এটা ভাবতে পারিনি।'

'অ্যাডমিরাল আসলে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করছেন। তোমার এক্সপিডিশনে সাহায্য হচ্ছে, আবার আমরা ইনল্যাণ্ড ওঅটরে আমাদের জাহাজ আর এই সাবমারসিবলের পারফর্মেন্স পরীক্ষা করে দেখতে পারছি।'

'তারপরও... ইটস্ সো নাইস অভ হিম।' সাবমারসিবলের স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে বাইরে তাকাল লুনা। 'পরিবেশটা খুবই রোমান্টিক। শ্যাম্পেন থাকলে সোনায় সোহাগা হতো।'

'শ্যাম্পেন নেই, আপাতত স্যাণ্ডউইচ আর পানি দিয়ে কাজ চালাও।' সিটের পাশ থেকে একটা কুলার তুলল রানা। 'এটা আমাদের লাঞ্চ।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।' কুলার থেকে স্যাণ্ডউইচ আর পানির বোতল বের করল লুনা। নিজে নিল, রানাকেও দিল।

সাবমারসিবলকে থামিয়ে ফেলল রানা। লেকের একটা চার্ট মেলে ধরল কোলের উপর, স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে জরিপ করল ওটা।

'আমরা এখানে,' দেখাল রানা, আঙুল ঠেকাল আঁকাবাঁকা

একটা রেখার উপরে। 'ন্যাচারাল এই শেলফটার পাশে। তীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে এটা। কয়েক হাজার বছর আগে শেলফটা হয়তো পানির উপরে ছিল।'

'আমার থিয়োরি তা-ই বলে,' লুনা বলল। 'অ্যাম্বার রুটের একটা অংশ ডরমেয়ার লেকের পাশ ঘেঁষে গেছে। ওটা ডুবে যাবার পর হয়তো সওদাগররা বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছিল। এখানে সে-সময়কার নিদর্শন পাওয়া যাবার কথা।'

'ঠিক কী ধরনের নিদর্শন আশা করছ?'

'দেখলে বুঝতে পারব।'

'আমাকে বোঝানো যায় না?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

হেসে ফেলল লুনা। 'অবশ্যই! শোনো, পুরনো আমলের ক্যারাভানগুলোকে নিশ্চয়ই বিশ্রাম এবং রিসাপ্লাইয়ের জন্য মাঝে মাঝে থামতে হতো। ডরমেয়ার লেকের পাড় সে-ধরনের রেস্টিং প্লেস হিসেবে আদর্শ। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে ট্রেড রুটের স্টপেজে যে-ধরনের সেটেলমেন্ট থাকে, তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব আমরা।'

'চলো তা হলে। দেখি তোমার ধারণা কতখানি সত্যি।'

ঝটপট লাঞ্চ শেষ করল দুজনে। তারপর সাবমারসিবলের কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ব্যাটারি-চালিত ইলেকট্রিক মোটর গুঞ্জন করে উঠল, চালু হলো গোলকের তলায় লাগানো টুইন ল্যাটারাল থ্রাস্টার। এগিয়ে চলল সাবমারসিবল।

আদর করে নাম রাখা হয়েছে সাবমারসিবলের—*জলপরী*। পনেরো ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া; দুজন যাত্রী বহন করতে পারে, পানির পনেরো হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত নামতে পারে অনায়াসে। বারো নটিক্যাল মাইল রেঞ্জ ওটার, সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় আড়াই নট। অন্যান্য সাবমারসিবলের তুলনায় এটার নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ। গাড়ি চালানোর মত করেই চালানো যায়

জলপরীকে, দ্রুত বাঁক নেয়া যায়, ব্রেক কষার ভঙ্গিতে থামিয়েও ফেলা যায়। এমন চমৎকার ম্যানুভারিবিলিটি আর কোনও জলযানে দেখা যাবে না।

নেভিগেশনের জন্য অ্যাকুস্টিক ডপলার ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করল রানা, জলপরীকে ডুবন্ত শেলফের উপর নিয়ে গেল। শেলফটা ঢালু, ধীরে ধীরে নেমে গেছে নীচে। বেসিক সার্চ প্যাটার্ন অনুসরণ করল রানা—কাল্পনিক একটা গ্রিড এঁকে ওটার রেখার উপর আগুপিছু করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে সাবমারসিবলের বাইরে লাগানো চারটে শক্তিশালী হ্যালোজেন ল্যাম্প, শেলফের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে উঠেছে তাতে।

ঘণ্টাদুই ঘোরাফেরার পর আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠল লুনা। ততক্ষণে একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে রানা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর কাঁধ খামচে ধরল লুনা, অন্যহাতটা প্রসারিত করে রেখেছে সামনে।

'ওই যে!'

জলপরীর স্পিড কমাল রানা, তাকাল সামনে। হ্যালোজেন ল্যাম্পের সীমানার ওপারে আবছা একটা আকৃতি ফুটে উঠেছে। সাবমারসিবলের নাক ঘুরিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল ও। আলো পড়তেই বোঝা গেল জিনিসটা। বিশাল এক পাথর—বারো ফুট লম্বা, চওড়ায় অর্ধেক। তবে কিনারায় বাটালির আঘাতের চিহ্ন বলছে, ওটা প্রাকৃতিক নয়; মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে।

আরও পাথর দেখা গেল আশপাশে—কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কিছু খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু পড়ে আছে এলোমেলোভাবে, কিছু আবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে আর্চওয়ের আকারে।

'মনে হচ্ছে পথ ভুল করে স্টোনহেঞ্জে চলে এসেছি,' ঠাট্টা করল রানা।

'বলেছে তোমাকে!' ওর কাঁধে চিমটি কাটল লুনা। 'ওগুলো মেমোরিয়াল মনুমেন্ট। আর্চওয়েগুলো হচ্ছে সমাধিতে ঢোকার প্রবেশপথ।'

থ্রাস্টারের পাওয়ার বাড়াল রানা। ত্রিশ ফুটের ব্যবধানে দাঁড়ানো ছ'টা আর্চওয়ে পেরিয়ে এল। এরপর উঁচু হতে শুরু করল জমি, দেখা পাওয়া গেল একটা সংকীর্ণ ডুবো-উপত্যকার। দু'পাশের পাহাড়ি ঢাল কেটে সমান করে ফেলা হয়েছে, পাহাড় ওখানে প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। উপত্যকার শেষপ্রান্তে একটা খাড়া দেয়াল দেখা গেল। মাঝে একটা আয়তাকার ওপেনিং আছে—একটা দরজা। দরজার উপরে আছে একটা পাথুরে ছাউনি। ছাউনির উপরে আছে একটা তেকোণা ফুটো।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল লুনা। 'এ তো দেখছি একটা *থোলোস!'*

'কী?' রানা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'গণসমাধি, রানা। একসঙ্গে অনেককে কবর দেয়া হয়েছে ভিতরে। মাইসেনিতে দেখেছি আমি এমন আরেকটা গণসমাধি। *দ্য ট্রেজারি অভ অ্যাট্রিওস* নাম ওটার।'

'মাইসেনি!' রানা অবাক হলো। 'সে তো গ্রিসে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওই সমাধির ডিজাইন গ্রিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। খ্রিস্টজন্মের আড়াই হাজার বছর আগে ক্রিট দ্বীপ আর ঈজিয়ানের লোকেরা এভাবে মৃতদের একসঙ্গে কবর দিত।' জ্বলজ্বলে চোখে রানার দিকে তাকাল লুনা। 'এর অর্থ বুঝতে পারছ, রানা? প্রাচীন আমলে ঈজিয়ান আর ইয়োরোপের মধ্যকার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, এটা প্রমাণ করে দিতে পারব আমরা। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন সম্ভাবনার কথা।'

'ইন্টারেস্টিং!' সঙ্গিনীর উচ্ছ্বাস দেখে মন্তব্য করল রানা।

'ইশ্‌শ্‌,' তৃষিত নয়নে সমাধির দিকে তাকাল লুনা, 'ভিতরটা

দেখার জন্য আমি একটা চোখ হারাতেও রাজি।'

'অত বড় মূল্য দিতে হবে না,' হাসল রানা। 'ডুবো-সমাধি পরিদর্শন করাবার জন্য আমি সাধারণত একটা ডিনার-ডেট দাবি করি।'

'কী বলছ!' অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকাল লুনা। 'তুমি আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন নয়? এণ্ট্রান্সটা যথেষ্ট চওড়া। জলপরীও পানির তলায় জাদু দেখাতে পারে। একটু সাবধানে যেতে হবে আর কী!'

'যা খুশি করো, ভিতরে চলো এখুনি। *দিপেশ তোয়া! ভিত্... ভিত্!!'* মাতৃভাষায় তাড়া লাগাল লুনা।

হেসে ফেলল রানা। জয়স্টিক নেড়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়াল জলপরীকে। হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলোয় সমাধির প্রবেশপথ আলোকিত হয়ে উঠল। ওখানে নাক ঢোকাতে যাবে জলপরী, এমন সময় খড় খড় করে উঠল সাবমারসিবলের রেডিও রিসিভার।

'রানা, দিস ইজ উলফ। কাম ইন, প্লিজ।'

কণ্ঠটা ক্রিস্টোফার উলফের—নুমার জাহাজ স্টারফিশের ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোন তুলে নিল রানা। 'রানা স্পিকিং। হাউ ডু ইউ রিড মি?'

'একটু দুর্বল, তবে শুনতে পারছি,' বললেন উলফ। 'মিস পারসেলকে বলো, মসিয়ো অঁরি কথা বলতে চান ওঁর সঙ্গে।'

ফরাসি সরকারকে সৌজন্য দেখিয়ে একজন অবজারভার নিয়েছে নুমা, ফ্রাঁসোয়া অঁরি, তার কথাই বলছেন ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোনটা লুনার হাতে তুলে দিল রানা। শুরু হলো উত্তপ্ত বাদানুবাদ। গোঁয়ারের মত কিছুক্ষণ লড়াই করল লুনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকাল রানার দিকে।

'সরি রানা, আমাদেরকে উপরে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন? এখনও যথেষ্ট অক্সিজেন আর পাওয়ার আছে জলপরীতে।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। সরকারের এক বড়কর্তার কাছ থেকে মেসেজ পেয়েছে অঁরি, আমাকে এখুনি একটা আর্টিফ্যাক্ট আইডেণ্টিফাই করার জন্য যেতে বলা হয়েছে।'

'শুনে তো ইমার্জেন্সি বলে মনে হচ্ছে না। থেকে যেতে পারো না?'

'পারলে কি আর ফিরতে বলছি তোমাকে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুনা। 'সমস্যা হলো, এখানে এক্সপিডিশন চালাবার জন্য সরকারি অনুমতি নিতে হয়েছে আমাকে। ওদের কথা না শুনলে অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। আই অ্যাম সরি।'

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না। কয়েক হাজার বছর ধরে এখানে পড়ে আছে সমাধিটা। আমি পাহারায় থাকছি—কোথাও পালিয়ে যাবে না। দু'চারদিন পরে ঢুকলে কোনও অসুবিধে নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। চেহারা বিমর্ষ। শেষবারের মত রহস্যময় প্রবেশপথটার দিকে তাকাল রানা, তারপর জলপরীর নাক ঘুরিয়ে নিল, বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে, ভার্টিক্যাল থ্রাস্টার ব্যবহার করে উঠতে শুরু করল উপর দিকে।

সারফেসে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। পুরো দেহ ভেসে উঠতেই স্পিডবোটের মত জলপরীকে ছোটাল রানা, স্টারফিশের পাশে ভেড়াল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

কেইবল বেঁধে সাবমারসিবলকে জাহাজে তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্রু-রা, ল্যাডার বেয়ে আপার ডেকে উঠে এল রানা-লুনা। সিঁড়ির পাশেই অপেক্ষা করছিল ফ্রাঁসোয়া অঁরি, লুনার চেহারা দেখে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটায় আমি

অত্যন্ত দুঃখিত, মাদমোয়াজেল পারসেল। কিন্তু সরকার থেকে জোরালো নির্দেশ পেয়েছি, আমার কিছু করার ছিল না।'

'ইট'স ওকে, মসিয়ো অঁরি,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লুনা। 'কী করতে হবে, তা-ই বলুন।'

হ্রদের কিনারের পাহাড়সারি দেখাল অঁরি। 'ওরা আপনাকে ওখানে যেতে বলেছে।'

'গ্লেসিয়ারটাতে?' ভ্রূকুটি করল লুনা। 'আপনি শিয়োর?'

মাথা ঝাঁকাল অঁরি। 'আমিও অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু ওখানেই যেতে হবে আপনাকে। বরফের মধ্যে কী যেন পাওয়া গেছে, আমি এর বেশি কিছু জানি না। বোট অপেক্ষা করছে, আপনি এখুনি রওনা হয়ে যান।'

হতাশ ভঙ্গিতে রানার দিকে ফিরল লুনা। মুখ খুলবার চেষ্টা করতেই বাধা পেল। রানা বলল, 'নিশ্চিন্তে চলে যাও। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি ওই সমাধিতে যাচ্ছি না। এখানেই অপেক্ষা করব।'

'*মার্সি*, রানা,' রানাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল লুনা। ফিসফিসাল, 'লেফট্ ব্যাঙ্কে একটা ভাল রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে নিতে পারো আমাকে।'

রানার দৃষ্টিতে শূন্যতা ফুটল, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

হেসে উঠল লুনা। 'ডিনারের কথা ভুলে গেছ নাকি? নিমন্ত্রণটা আমি গ্রহণ করছি!'

'সমাধি পরিদর্শনের পর!' রানাও হাসল।

একটা পাওয়ার-বোট অপেক্ষা করছে শিপের অন্যপাশে, ল্যাডার বেয়ে ওটায় নেমে পড়ল লুনা। আউটবোর্ড মোটর গর্জে উঠল, যাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল তীরের উদ্দেশে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। লুনাকে ভাল লেগে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ চলে যাওয়ায় কেমন যেন নিঃসঙ্গতা অনুভব করছে। অনুভব

জাগছে কৌতূহলও—কী এমন আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে গ্লেসিয়ারে, যার কারণে এত উত্তেজনা দেখা দিয়েছে? আনমনে মাথা নাড়ল। হাতে আপাতত কাজ নেই, লুনার সঙ্গে গেলে মন্দ হতো না। ওর সঙ্গ পাওয়া যেত, কৌতূহলটাও মিটত।

রানার জানা নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও টের পাবে, লুনা পারসেলের সঙ্গী না হয়ে ভালই করেছে।

ছয়

হ্রদের তীরে লুনাকে অভ্যর্থনা জানালেন ড. দ্যুঁবোয়া। গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ফিরে আসতে হয়েছে বলে মেয়েটার মেজাজ খারাপ, কিন্তু স্বভাবজাত ভঙ্গিতে ভদ্রলোক ওর মুড ভাল করে দিলেন। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, ফিফির সিটে বসে খিলখিল করে হাসছে লুনা।

আইসফিল্ডের একটা পাশ লক্ষ্য করে ছুটছে সিত্রোঁ। ব্যাপারটা খেয়াল করে লুনা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা গ্লেসিয়ারে যাচ্ছি না?'

'গ্লেসিয়ারেই, তবে উপরে না, ওটার পেটের ভিতর,' বললেন দ্যুঁবোয়া। 'ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের আটশো ফুট গভীরে আমাদের অবজারভেটরি, ওখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'অবজারভেটরি! কীসের?'

'ওখান থেকে আইস-মুভমেণ্ট পর্যবেক্ষণ করছে আমাদের টিম। তিন বছরের প্রজেক্ট।'

'জানতাম না তো! খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, আরেকটু খুলে বলবেন?'

নিজেদের প্রজেক্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন দ্যুবোয়া। শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে গেল লুনা, মনের মধ্যে যা বিরক্তি ছিল, সব মিলিয়ে গেল।

'লেকে আপনারা কী করছেন?' অবজারভেটরির কথা শেষ করে জানতে চাইলেন দ্যুবোয়া। 'অবজারভেটরি থেকে বেরিয়ে একদিন দেখি, আপনারা হাজির। কেউ বলেনি আমাদেরকে আপনাদের আসার কথা।'

'আমি পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির সহায়তা নিয়ে একটা এক্সপিডিশন করছি। ডরমেয়ার লেকের তলায় প্রাচীন অ্যাম্বার রুটের ট্রেডিং পোস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা।'

'তা হলে আপনার প্রজেক্টও তো কম ইন্টারেস্টিং নয়! কিছু পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আর সে-কারণেই সাইটে দ্রুত ফিরে যাওয়া দরকার আমার। দয়া করে বলবেন, কী কারণে আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে?'

'বরফের ভিতর আমরা একটা লাশ পেয়েছি।'

'লাশ?' লুনা ভুরু কোঁচকাল।

মাথা ঝাঁকালেন দ্যুবোয়া। 'আমাদের ধারণা, লাশটা একজন পুরুষের।'

'*আইসম্যান*-এর মত?'

এই আল্পস পর্বতমালাতেই কয়েক বছর আগে জমাট বাঁধা অবস্থায় নিয়োলিথিক যুগের এক শিকারীর দেহ পাওয়া গিয়েছিল। স্পেসিমেন-টাকে *আইসম্যান* বলে ডাকা হয়।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন দ্যুবোয়া। 'না। আমাদের

ধারণা, এই বেচারা আরও সাম্প্রতিক সময়কার। শুরুতে মনে হয়েছিল, ক্লাইম্বার। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে বরফের ফাটলে পড়ে গেছে। কিন্তু পরে ধারণাটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি।'

'কেন?'

'ওটা আপনাকে নিজ চোখে দেখতে হবে।'

বিরক্তি ফুটল লুনার মুখে। 'দয়া করে হেঁয়ালি করবেন না, ডক্টর। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র আর বর্মের উপর বিশেষজ্ঞ আমি, লাশের উপর নই। কেন আমাকে এর মাঝখানে ডেকে এনেছেন?'

'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। জায়গামত পৌঁছুনোর আগে মসিয়ো লেগ্রাঁ কিছু বলতে মানা করেছেন।'

লুনার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'লেগ্রাঁ? অগাস্টিন লেগ্রাঁ? স্টেট আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের লেগ্রাঁ?'

'এক ও অদ্বিতীয়। আবিষ্কারটার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই উনি হাজির হয়েছেন এখানে সরকার থেকে ওঁকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করবার জন্য। আপনি চেনেন ভদ্রলোককে?'

'জী, চিনি। খুব ভাল করেই চিনি।' বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে সিটে হেলান দিয়ে বসল লুনা। মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে অগাস্টিন লেগ্রাঁর কথা শুনলে খিঁচড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

সরবোনে অ্যানথ্রোপলজির শিক্ষক ছিল লেগ্রাঁ, তখন থেকে তাকে চেনে লুনা। অত্যন্ত নিচু-মনের সুযোগসন্ধানী মানুষ নারীলোভী... চোখে-মুখে লালসা। শিক্ষকতার চেয়ে রাজনীতি নিয়েই বেশি আগ্রহ ছিল তার। ওপরঅলাদেরকে খুশি করে এখন সর্বোচ্চ প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা—স্টেট আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের একটা বড়-সড় পদ বাগিয়ে নিয়েছে। অপব্যবহার করে চলেছে ক্ষমতার। লুনার উপর তার নজর রয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

দিনগুলো থেকে, সুবিধে করতে পারেনি। এখন নতুন কৌশল খাটাচ্ছে। ওর বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট আটকে দিয়েছে সে, আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়েছে—ওর সঙ্গে বিছানায় গেলে সবগুলোর অনুমতি আদায় করে দেবে। জবাবে কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে বলেছে লুনা—বরং বুনো একটা পশুর সঙ্গে শোবে ও, লেগ্রাঁর সঙ্গে নয়। সেই থেকে দু'জনের মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। ডরমেয়ার লেকের প্রজেক্টটাও আটকে যাচ্ছিল প্রায়; অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, লেগ্রাঁকে ডিঙিয়ে অনুমতি নিয়েছে লুনা।

ভাঙা সেতুর কাছে গাড়ি পার্ক করলেন দ্যুবোয়া। লুনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন টানেল এণ্ট্রান্সের সামনে। ভিতরে ঢুকে রাবার বুট আর মাইনিং হেলমেট বিতরণ করলেন। এণ্ট্রান্সে লাগানো ফোনের রিসিভার তুললেন ফরাসি বিজ্ঞানী, সঙ্গীদের জানিয়ে দিলেন ওদের পৌঁছুনোর খবর। একটু পর হাঁটতে শুরু করল দুজনে। ভেজা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পায়ের আওয়াজ।

'মনে হচ্ছে যেন ভেজা বুট পরে হাঁটছি,' বলল লুনা।

'সাইকোলজিকাল এফেক্ট—প্রথম প্রথম এমন হয়,' হাসলেন দ্যুবোয়া। 'পা কিন্তু খটখটে শুকনো আপনার। কয়েকদিন এখানে কাটালে দেখবেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে চারপাশে তাকাচ্ছে লুনা। পাহাড় আর বরফের ভিতর দিয়ে এমন টানেল তৈরি করা যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। দ্যুবোয়াকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকল, বিজ্ঞানীও খুশিমনে ওর কৌতূহল নিবৃত্ত করে চললেন।

কিছুদূর যেতেই একটা টানেলের দেয়ালে একটা ভারী ইস্পাতের দরজা দেখতে পেল লুনা। জানতে চাইল, 'দরজাটা কীসের?'

'আরেকটা টানেলে যাওয়া যায় ওখান দিয়ে। ওখানে একটা

হাইড্রলিক সিস্টেম আছে। বছরের শুরুতে পানির প্রবাহ দুর্বল থাকে, তখন ওই সিস্টেমের সাহায্যে পাম্প করে বাড়তি পানি ঢোকানো হয় টানেলে। এখন অবশ্য পানির প্রবাহ অনেক শক্তিশালী, তাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে দরজা। ওটা খুললে এই টানেল তলিয়ে যাবে।'

'এখান দিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্টে যাওয়া যায়?'

'সব টানেলই পাওয়ার প্ল্যান্টে গেছে, কিন্তু পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে পারবেন শুধু শুকনোগুলো দিয়ে। বাকিগুলো ব্যবহার হয় পানির প্রবাহের জন্য। গ্লেসিয়ারের তলা দিয়ে নদী গেছে, এই মৌসুমে স্রোত খুব জোরালো থাকে। আমরা সাধারণত এই সময়টাতে অবজারভেটরি বন্ধ রাখি, ঝুঁকি এড়াবার জন্য। কিন্তু এ-বছর বিভিন্ন ঝামেলায় ডাটা কালেকশনে বিঘ্ন ঘটেছে। তাই নির্ধারিত শিডিউলের বাইরেও আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।'

'এখানে বাতাস আসে কীভাবে?'

'ল্যাব পেরিয়ে যদি এক কিলোমিটার এগোন, তা হলে বড় একটা ওপেনিং পাবেন—গ্লেসিয়ারের অন্যপ্রান্তে। মাইন এণ্ট্রান্সের মত ব্যবহার করা হয় ওটা—মালামাল আনা হয়, বের করা হয়; বাতাসও আসে ওখান দিয়ে।'

ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল লুনা। 'আপনাদের প্রশংসা না করে পারছি না। এমন পরিবেশে কোনও ধরনের কাজই সহজ নয়।'

হাসলেন দ্যুবোয়া। 'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। জঘন্য পরিবেশ! মাঝে মাঝে যখন বাইরে বেরুই, তখন আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। ভিতরে যখন থাকি, তখন আমরা বেশিরভাগ সময় ল্যাবেই কাটাই। ওখানে কম্পিউটার আছে, সেডিমেণ্ট-ফিল্টারিঙের জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্প আছে, এমনকী ওয়াক-ইন ফ্রিজারও আছে। না গলিয়েই আইস-স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা যায়। দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটি আমরা, বাকি সময়

ঘুমিয়ে কাটাই। বোরিং জীবন, নিঃসন্দেহে, তবে সময় ঠিকই পেরিয়ে যায়।'

আরও কিছুক্ষণ এগোনোর পর ল্যাবের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। লিভিং কোয়ার্টারের মত ল্যাবের ট্রেইলারগুলোও টানেলের গা কেটে বসানো হয়েছে। ওরা কাছে যেতেই প্রথম ট্রেইলারের দরজা খুলে গেল, একজন লম্বা, শুকনো মানুষ বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। অগাস্টিন লেগ্রাঁকে চিনতে পেরে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল লুনার। তে-কোনা মুখ, ছুঁচালো নাক, চওড়া কপাল লোকটার। মাথার চুল পাতলা, লাল-রঙা। চেহারাতেই ফুটে রয়েছে এক ধরনের শয়তানি।

এগিয়ে এসে হাত মেলাল লেগ্রাঁ। 'সুপ্রভাত, মাই ডিয়ার লুনা। কষ্ট করে এই অন্ধকার, ভেজা গুহায় এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, প্রফেসর,' নীরস গলায় বলল লুনা। 'দেখতে পাচ্ছি, পরিবেশটা আপনার আবাস হিসেবে খুবই মানানসই।'

ক্ষণিকের জন্য মেঘ জমল লেগ্রাঁর চেহারায়, খোঁচাটা বুঝতে পেরেছে। পোকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে, এমন অন্ধকার-আর্দ্র জায়গায় শুধু পোকামাকড়ই বাস করে। এক মুহূর্তের জন্য থমকাল সে, তারপর হাসল। লুনাকে আপাদমস্তক দেখল, যেন ভারী কাপড় ভেদ করে ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। বলল, 'তুমি পাশে থাকলে সব পরিবেশই সমান।'

চরম বিতৃষ্ণা ফুটল লুনার চেহারায়। 'ফষ্টিনষ্টি বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসুন। কেন আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?'

'নিশ্চয়ই!' বলল লেগ্রাঁ। 'এসো দেখাচ্ছি।'

হাত ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সরে গেল লুনা। ড. দ্যুবোয়ার কনুইয়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'পথ দেখান।'

ফরাসি বিজ্ঞানী বিস্মিত হয়ে ওদের বাকযুদ্ধ দেখছিলেন, লুনা তার কাছে আশ্রয় নিতেই হেসে ফেললেন। বললেন, 'চলুন, প্রফেসর লেগ্রাঁ। আমরা পেছনে আছি।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লেগ্রাঁ, তারপর হাঁটতে শুরু করল। দ্যুবোয়ার সঙ্গে তার পিছু নিল লুনা। কিছুদূর যেতেই একটা কাঠের সিঁড়ি দেখা গেল। ওটা ধরে বারো ফুট উচ্চতায় নতুন একটা টানেলে ঢুকল ওরা। এটার আকার ছোট, ডায়ামিটার মাত্র দশ ফুট। প্রবেশমুখ থেকে বিশ কদম সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে টানেলটা। ডানদিকের শাখায় ঢুকল ওরা। মেঝেতে একটা নালা রয়েছে এখানে, পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। দেয়াল কেটে বসানো হয়েছে একটা চারফুট ব্যাসের রাবার হোস।

'ওঅটর জেট,' লুনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বললেন দ্যুবোয়া। 'ড্রেনেজের পানি সংগ্রহ করি আমরা, গরম করি, তারপর ওটাই আবার স্প্রে করে বরফ গলাই।'

'কেন?' জানতে চাইল লুনা।

'গবেষণার জন্য ছোট ছোট টানেল তৈরি করে গ্লেসিয়ারের বিভিন্ন অংশে যেতে হয় আমাদেরকে। কাটার চেয়ে বরফ গলানো সহজ। তবে খুব সতর্ক থাকতে হয়, এখানে বরফ খুবই দ্রুত জমাট বাঁধে কিনা! সারাক্ষণ ওঅটর জেট চালু রাখতে হয়; নইলে টানেল বন্ধ হয়ে যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের কবর হয়ে যেতে পারে।'

'বলেন কী!'

'আই অ্যাম সিরিয়াস। দৈনিক দু'তিন ফুট পর্যন্ত বরফ জমে এখানে।'

'মাই গড!'

একটা বরফ ঢালের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেল টানেল। সিঁড়ি লাগানো আছে, ওটা বেয়ে ছোট একটা গুহায় উঠে এল ওরা।

জায়গাটা বেশ ছোট, ঠেলাঠেলি করে দশ-বারোজনের বেশি আঁটবে না ওতে। দেয়াল আর ছাতে নীলচে বরফ, আর আছে নানা রকম ময়লা—গ্লেসিয়ারের মুভমেন্টের কারণে বাইরে থেকে এসে জমা হয়েছে।

'গ্লেসিয়ারের একেবারে তলা এটা,' বললেন দ্যুঁবোয়া। 'মাথার ওপর আটশো ফুট পর্যন্ত বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। আইস-ফ্লো'র সবচেয়ে নোংরা জায়গা। তবে ড্রিল করলে পরিষ্কার বরফ পাওয়া যায়।'

'হুম!' মাথা দোলাল লুনা।

ইতস্তত করলেন দ্যুঁবোয়া। 'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল, আমাকে এখন যেতে হবে। ল্যাবে জরুরি কাজ আছে।'

'নিশ্চয়ই। প্লিজ, যান।'

হাত মিলিয়ে চলে গেলেন বিজ্ঞানী। লুনার দৃষ্টি আটকে গেল গুহার প্রান্তদেশের দেয়ালে। রেইনকোট-পরা একজন মানুষ ওখানে হোসের সাহায্যে গরম পানি দিয়ে বরফ গলাচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে আরও দুজন। বাষ্পে ভরে আছে গুহার অভ্যন্তর, শ্বাস নেয়া কষ্টকর। অতিথি দেখতে পেয়ে হোস বন্ধ করল লোকটা, এগিয়ে এল স্বাগত জানাতে।

'আমাদের ছোট্ট অবজারভেটরিতে স্বাগতম, মাদমোয়াজেল পারসেল!' হাসিমুখে বলল সে। 'আশা করি পথে কষ্ট হয়নি? আমি প্রফেসর স্টিভেন ক্যাসিডি, ড. দ্যুঁবোয়ার কলিগ।' দুই সঙ্গীকেও পরিচয় করিয়ে দিল। 'এ হলো জিমি হ্যানসন, আমার রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, আর... মি. জেফ কলিন্স, *আউটসাইড* ম্যাগাজিনের জার্নালিস্ট, আমাদের প্রজেক্টের উপর ফিচার তৈরি করছেন।'

একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করল লুনা। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল লেগ্রাঁ। ওখানে বরফের

ভিতর একটি মনুষ্য-আকৃতি আটকে আছে। কুশল-বিনিময় শেষ হতেই বলল, 'এদিকে এসো, লুনা। দেখো।'

এগিয়ে গেল লুনা। গাঢ় আকৃতিটার কিনারে আঙুল বোলাল। 'মনে হচ্ছে অনেকদিন আগেই জমে বরফ হয়ে গেছে লাশটা,' মন্তব্য করল ও।

'হ্যাঁ, আমার পরিচিত একটা মেয়ের মত,' বাঁকা সুরে বলল লেগ্রাঁ।

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল লুনা, মুখে কিছু বলল না।

'গুহাটা বড় করতে গিয়ে লাশটা খুঁজে পেয়েছি আমরা,' হ্যানসন বলল।

ভাল করে লাশটা দেখল লুনা। একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বরফের অবিশ্বাস্য চাপে, যেন একটা পোকাকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতেই ক্যাসিডি বলল, 'মানুষ বলে যে বোঝা যাচ্ছে, তা-ই ঢের। গ্লেসিয়ারের তলায় লাখ লাখ টনের প্রেশার কাজ করে। লাশটা দলামোচা পাকিয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।'

মাথা ঘোরাল লুনা। 'কিন্তু এটা এত গভীরে এল কী করে?'

'শুরুতে নিশ্চয়ই গ্লেসিয়ারের উপরেই পড়ে ছিল,' ক্যাসিডি ব্যাখ্যা করল, 'কালের প্রবাহে নেমে এসেছে নীচে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রতিদিনই গ্লেসিয়ারের তলার বরফ ক্ষয় হতে থাকে, আর উপরে জমতে থাকে তুষারের পরত। উপর থেকে একেকটা স্তর নামতে থাকে নীচে।'

'এরকম একটা স্তরের আটশো ফুট নামতে কত সময় লাগে বলে আপনার ধারণা?'

'এই ধরুন, কমবেশি একশো বছর।'

'আর যদি লোকটা কোনও ফাটলের ভিতর পড়ে মারা যায়? তা হলে তো আরও দ্রুত নেমে আসবে নীচে, তাই না?'

'সেটাই' ভেবেছিলাম আমরা প্রথমে। ওকে দুর্ভাগা এক ক্লাইম্বার ভেবেছিলাম। কিন্তু লাশটা ভাল করে দেখতেই ভুল ভেঙে গেল।'

'কী দেখেছেন?'

'নিজেই দেখুন, ওর পোশাক-আশাক মোটেই পর্বতারোহীর মত নয়।'

বরফের গায়ে প্রায় মুখ লাগিয়ে ফেলল লুনা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লাশটাকে। গাঢ় রঙের চামড়ার পোশাক ঢেকে রেখেছে দেহটাকে, পায়ে আছে বুট, মাথার টুপিটাও চামড়ার। জ্যাকেটের পশমি লাইনিং বেরিয়ে আছে এখানে-ওখানে, কোমরে ঝুলছে একটা হোলস্টার, তাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে। মুখের দিকে তাকাল লুনা, চেহারার খুঁটিনাটি বোঝার উপায় নেই, কিন্তু রোদে পোড়া ত্বকের রঙটা বোঝা যায় পরিষ্কার। চোখদুটো ঢেকে রেখেছে একজোড়া গগলস্। ঠিকই বলেছে ক্যাসিডি, পর্বতারোহী ছিল না মানুষটা।

'অবিশ্বাস্য!' রুদ্ধশ্বাসে বলল লুনা। তারপর সোজা হয়ে লেগ্রাঁর দিকে ফিরল। 'অদ্ভুত একটা আবিষ্কার, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার এখানে কী ভূমিকা, জানতে পারি?'

মুচকি হেসে দেয়ালের পাশে রাখা একটা প্লাস্টিক কন্টেইনারের দিকে এগিয়ে গেল লেগ্রাঁ, ভিতর থেকে বের করে আনল একটা স্টিলের হেলমেট। বলল, 'লাশের মাথার কাছে এটা পাওয়া গেছে।'

কৌতূহলের সঙ্গে শিরোস্ত্রাণটা হাতে নিল লুনা, ওটার গায়ের খোদাইগুলো স্টাডি করল। ভাইজর-টা অদ্ভুত, ঠিক যেন একটা মানুষের চেহারা। উপর দিকটা নকশা-কাটা, নানা রকম ফুল আর লতাপাতা পেঁচিয়ে ধরেছে পরস্পরকে, আর আছে একটা তিন-মাথা ঈগল, ওটাকে ঘিরে রেখেছে পৌরাণিক কয়েকটা

দানব। চিৎকার করার ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে পাখিটা, ধারালো থাবায় আঁকড়ে ধরে রেখেছে বর্শা আর তীরের একটা গোছা।

'প্রথমে হেলমেটটা পাই আমরা,' বলল হ্যানসন। 'তখুনি পাম্প বন্ধ করে দিয়েছিলাম, নইলে লাশটার ক্ষতি হতো।'

'ভাল করেছেন,' লেগ্রাঁ বলল। 'কোনও ধরনের কন্টামিনেশন হয়নি তাতে।'

শিরোস্ত্রাণের ডানপাশে একটা ফুটো লক্ষ করল লুনা, আঙুল বোলাল ওটার উপরে। 'মনে হচ্ছে বুলেটের আঘাত,' বলল ও।

'বুলেট?' ভুরু কোঁচকাল লেগ্রাঁ। 'বল্লম, বা বর্শা নয় কেন?'

'ওসবের আঘাত অন্যরকম হয়,' ব্যাখ্যা করল লুনা। 'ফুটোটা বড্ড পরিষ্কার, হাই-পাওয়ার অ্যামিউনিশন ছাড়া এমন ফুটো হওয়া সম্ভব নয়। জিনিসটা কত শক্ত, সেটা লক্ষ করেছেন? বরফের লাখ লাখ টন প্রেশারেও একটুও বাঁকা হয়নি। এ-জিনিস তীর-ধনুক, বা বর্শার আঘাতে ফুটো হবার কথা নয়। ভাল কথা, আপনারা কোনও ফরেনসিক এক্সপার্ট ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, ডেকেছি,' বলল লেগ্রাঁ। 'আগামীকাল পৌঁছুবে। না পৌঁছুলেও কিছু যায় আসে না। এটা যে একটা মানুষের লাশ, সেটা কনফার্ম করতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নেই। কাজের কথায় এসো। হেলমেটটা সম্পর্কে আর কী বলতে পারো তুমি?'

'দ্বিধার মধ্যে আছি,' স্বীকার করল লুনা। 'আকৃতিটা পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু নকশাগুলো আগে কোথাও দেখিনি। নির্মাতার কোনও চিহ্ন আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। পেলে আমার ডেটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আসলে... মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না ব্যাপারটার। লাশের পোশাক-আশাক বিংশ শতকের, ইউনিফর্ম আর গগলস্ বলছে—লোকটা এভিয়েটর। তা হলে ওর কাছে প্রাচীন হেলমেট এল কোত্থেকে?'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল লেগ্রাঁ। 'ধ্যাত্! ভেবেছিলাম

তুমি আরও বেশি কিছু বলতে পারবে।' হেলমেটটা ফিরিয়ে নিয়ে কণ্টেইনারে ঢুকিয়ে ফেলল সে। পাশ থেকে একটা ইস্পাতের স্ট্রংবক্স তুলে ধরল।

'কী ওটা?' জানতে চাইল লুনা।

'লাশের পাশে পাওয়া গেছে,' লেগ্রাঁ বলল। 'তালা দেয়া, কিন্তু আশা করছি এটা খুললে লোকটার পরিচয় জানা যাবে। জবাব মিলবে আমাদের সমস্ত প্রশ্নেরও। তার আগে...' ক্যাসিডির দিকে ফিরল সে, 'আমি চাই আপনারা বরফ গলাতে থাকুন। লাশ আইডেণ্টিফাই করবার মত আরও নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। 'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে।'

'আমার তো আর কোনও কাজ আছে বলে মনে হচ্ছে না,' লুনা বলল। 'শিপে ফিরে যেতে পারি?'

'নো, মাই ডিয়ার,' কুটিল স্বরে বলল লেগ্রাঁ, 'আর কোনও আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে না, তা কে বলতে পারে? যতক্ষণ না শিয়োর হচ্ছি, ততক্ষণ তুমি এখানেই থাকছ।'

'আমি কোনও জামাকাপড় আনিনি!' প্রতিবাদ করল লুনা।

'প্রয়োজনে আনিয়ে নেয়া হবে। যাও এখন। জার্নি করে এসেছ, বিশ্রাম নাও।' ক্যাসিডির দিকে ফিরল লেগ্রাঁ। 'কাজ চালিয়ে যান।'

দুপুর পর্যন্ত বরফ গলাল বিজ্ঞানীরা, তবে লাশের আশপাশে নতুন কোনও জিনিস খুঁজে পেল না। শেষে খাওয়াদাওয়ার জন্য বিরতি নেয়া হলো। লাঞ্চ সেরে, আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সবাই আবার ফিরে এল গুহায়। অবজারভেটরির লোকজন খেটে মরলেও অগাস্টিন লেগ্রাঁ ওদের মোটেই সাহায্য করল না, বরং ল্যাবে চলে গেল। লুনার আর বিশ্রাম নেয়া হলো না, ল্যাবে কিংবা লিভিং কোয়ার্টারে ফিরলে শয়তানটা চড়াও হয় কি না, এই ভয়ে

বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই রইল ও। সাহায্য করল গরম পানির হোস অপারেট করতে।

দ্বিতীয় দফা কাজ শুরু করবার একটু পরেই শোনা গেল মানুষের কণ্ঠ। কলকাকলি করতে করতে কয়েক মুহূর্ত পরই তিনজন মানুষ নিয়ে গুহায় উদয় হলো লেগ্রাঁ। ওদের সবার হাতেই নোটবুক, ক্যামেরা কিংবা ক্যামকর্ডার দেখা যাচ্ছে। তালি বাজিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লেগ্রাঁ।

'কাজ থামান আপনারা,' বলল সে। 'মেহমান এসেছে।'

ঠেলাঠেলি করে দুজন নবাগত চলে গেল দেয়ালের সামনে, লাশের ছবি তুলতে শুরু করল। তৃতীয়জনকে ব্যাপারটায় খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না, দেয়ালের দিকে এগোল ঠিকই, কিন্তু দায়সারা ভঙ্গিতে। চোখের সামনে ক্যামেরাও তুলল খুব হেলাফেলায়।

মেহমানদের পরিচয় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লুনার, আস্তিন টেনে লেগ্রাঁকে একপাশে নিয়ে এল ও। বলল, 'কী হচ্ছে এসব? এই রিপোর্টাররা এখানে কী করছে?'

'আমিই আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওদেরকে,' গর্বের সুরে বলল লেগ্রাঁ। 'এই বিশাল আবিষ্কারের কথা প্রচার করবার জন্য ওদের আনা হয়েছে এখানে।'

'কী যে আবিষ্কার করেছেন, সেটাই তো জানেন না আপনি! সাইটটা এখুনি কন্টামিনেট না করলে কি চলছিল না?'

'দেখো, মাতবরি ফলানোর জন্য আনিনি তোমাকে। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে যেয়ো না।' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত দিয়ে লুনাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল লেগ্রাঁ। এগিয়ে গেল সাংবাদিকদের দিকে। 'জেন্টলমেন! সমাধি থেকে বের হবার পর আমি এই মমির বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব।'

'হা যিশু!' বিড় বিড় করল কলিন্স। 'মমি! সমাধি!! লোকটা

তো এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কার করে বসেছে!'

প্রথম দুই সাংবাদিক ঝটপট ছবি তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। কিন্তু তৃতীয়জন তখুনি বেরুল না। ভীষণ লম্বা সে, অন্তত সাড়ে ছ'ফুট। শরীরটাও দশাসই। মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। গলায় ক্যামেরা, আর কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলছে, তারপরও তাকে দেখে ঠিক সাংবাদিক মনে হয় না। একদৃষ্টে জমাট বাঁধা লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদেরকে অনুসরণ করল।

লুনা তখন ক্যাসিডির সঙ্গে কথা বলছে।

'কন্টামিনেশনের কথা বলছিলেন,' ক্যাসিডি বলল। 'সত্যিই কি সম্ভাবনা আছে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল লুনা। 'আর্কিয়োলজিকাল সাইট মানেই নাজুক জায়গা। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়

'হুম! গুহাটা খুব শীঘ্রি আবার বরফে ভরে যাবে। তাতে হয়তো রক্ষা পাবে এই আবিষ্কার।'

'ভাল। চলুন দেখি, গর্দভটা কী ঘটাচ্ছে।'

সিঁড়ি ধরে মেইন টানেলে ফিরে এল ওরা। লেগ্রাঁ আর সাংবাদিকদেরকে ল্যাবের সামনে খোলা জায়গায় পাওয়া গেল। লাশের কাছাকাছি পাওয়া নিদর্শনদুটো সঙ্গে নিয়ে এসেছে লেগ্রাঁ. প্রথমে স্ট্রংবক্সটা উঁচু করে দেখাচ্ছে সবাইকে, হেলমেট-সহ প্লাস্টিক কন্টেইনারটা পড়ে আছে পায়ের কাছে।

'কী আছে ওর ভিতরে?' জানতে চাইল এক সাংবাদিক।

'এখনও জানি না আমরা,' লেগ্রাঁ বলল। 'নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খুলতে হবে এটা, নইলে ভিতরের জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আশা করছি তখন আপনাদের কৌতূহল মেটাতে পারব।

আপাতত ছবি তুলে নিয়ে যান।'

পোজ দিয়ে দাঁড়াল সে, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে রেখেছে। অন্যরা ছবি তুলতে শুরু করল, কিন্তু বিশালদেহী ক্যামেরা তুলল না। সঙ্গীদেরকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোল সে, কে কী ভাবল, তার পরোয়া করছে না। একেবারে লেগ্রাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলল, 'বাক্সটা আমাকে দাও!'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল লেগ্রাঁ, পরক্ষণেই ভাবল, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে লোকটা। হাসিমুখে বাক্সটা জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে। বলল, 'জীবন থাকতে দেব না।'

'তা-ই?' হিংস্র একটা হাসি ফুটল বিশালদেহীর ঠোঁটে। পরমুহূর্তে জ্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে আনল একটা পিস্তল, বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল লেগ্রাঁর মুঠির উপরে।

আর্তনাদ করে উঠল লেগ্রাঁ। আঙুল থেঁতলে গেছে তার, বাক্স ছেড়ে দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বসে পড়ল মেঝেতে। শান্ত ভঙ্গিতে স্ট্রংবক্সটা তুলে নিল বিশালদেহী, উল্টো ঘুরে পিস্তল তাক করল অন্যদের দিকে, ইশারায় সরে যেতে বলছে।

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে পিছাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল দুই সাংবাদিক। বিজ্ঞানীরা হতভম্ব, কলিন্স আর লুনাও ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে। কারও দিকে আর তাকাল না বিশালদেহী, গটমট করে হেঁটে চলে গেল।

কয়েক মিনিট কারও মুখে কথা ফুটল না। তারপরই চেঁচিয়ে উঠল লেগ্রাঁ, 'থামাও ওকে!'

'টেলিফোন! টেলিফোন করুন!' বলে উঠল এক সাংবাদিক।

ল্যাবে ছুটে গেলেন দ্যুবোয়া, ফিরে এলেন একটু পরেই। মুখ কালো করে বললেন, 'ডেড! নিশ্চয়ই ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে! লিভিং কোয়ার্টারেও কেউ নেই। আমাদেরকে এণ্ট্রান্সে

গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে।'

লেগ্রাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ক্যাসিডি আর হ্যানসন। ল্যাব থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এল লুনা, ভাঙা আঙুলের উপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। সাংবাদিকরা ততক্ষণে রহস্যময় লোকটার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। জানা গেল, দুজনের কেউই তাকে চেনে না। এয়ারপোর্টেই দেখেছে প্রথমবার। কাগজপত্র ঠিক ছিল, ওদের সঙ্গে একই ফ্লোটপ্লেনে চড়ে এসেছে, পথে কোনও কথা বলেনি। লেকের পাড় থেকে ড. দ্যুঁবোয়া নিয়ে এসেছেন ওদেরকে।

টানেল এণ্ট্রান্সের দিকে রওনা হবার প্রস্তাব দিল ক্যাসিডি। লুনা আর ড. দ্যুঁবোয়া রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু রিপোর্টাররা যেতে চাইল না, ওরা এখানেই থাকবে। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, অস্ত্রধারী লোকটা টানেলের কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। হ্যানসনকেও থাকতে বলল ক্যাসিডি, লেগ্রাঁর শুশ্রূষার জন্য। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এরপর ওরা তিনজন রওনা হলো।

কয়েক মিনিট নীরবে এগোল ওরা, কেউ কোনও কথা বলছে না। পরিবেশটা ভৌতিক, তিনটে হেডল্যাম্পের আলো বুদবুদের মত ঘিরে রেখেছে ওদেরকে, তার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি বিশালদেহী লোকটা ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে! তার পায়ের আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে থাকল ওরা, নিঃশব্দে হাঁটল, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। টানেলের দেয়াল আর ছাত চুইয়ে পড়তে থাকা পানির টুপটাপ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হলো না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তিনজনে। সামনে কোথাও থেকে একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এসেছে। পরমুহূর্তে শকওয়েভের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মেঝে। তাল হারিয়ে ভেজা টানেলে ধুপধাপ করে পড়ে গেল ওরা। কম্পন থেমে গেলে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে

দাঁড়াল, সবার শরীর ভিজে গেছে ততক্ষণে।

'ক্রাইস্ট!' শঙ্কিত গলায় বললেন দ্যুঁবোয়া। 'কী ছিল ওটা?'

'চলুন এগিয়ে দেখি,' প্রস্তাব দিল ক্যাসিডি।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে সে, এমন সময় চাবুকের মত সপাং করে উঠল লুনার কণ্ঠ। 'দাঁড়ান!'

থেমে গেল ক্যাসিডি। 'কেন, কী হয়েছে?'

মেঝের দিকে আঙুল তাক করে রেখেছে লুনা। 'দেখুন!'

ক্যাসিডি মাথা নামাতেই বহমান স্রোতধারার বুকে হেডল্যাম্পের আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল।

'পানি!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

এবার ভেসে এল গুরুগম্ভীর জলপ্রপাতের আওয়াজ। টানেল ধরে ছুটে আসছে পানির উদ্দাম ঢেউ। চোখের পলকে গোড়ালির উপরে পৌঁছে গেল জলধারা। বাড়ছে দ্রুত।

'দৌড়ান!' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল দ্যুঁবোয়ার গলা দিয়ে।

উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল তিনজনে।

সাত

বিনকিউলার দিয়ে হ্রদের তীরে লুনাকে পৌঁছুতে দেখল রানা। একটু পর সিট্রোঁয় চড়ে গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল মেয়েটা। রেলিঙে হেলান দিয়ে এবার ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের দিকে

তাকাল ও। দু'পাশে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, মাঝে বরফের বিস্তার... সবমিলিয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য। শুভ্র পটভূমিতে সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু কোনও তাপ ছড়াতে পারছে না। গোটা এলাকায় হিমেল পরশ ছড়িয়ে চলেছে বরফের পিণ্ডটা।

লুনার থিয়োরি নিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। প্রাচীন ক্যারাভানগুলো যদি সত্যিই অ্যাম্বার রুটে চলাচল করত, তা হলে তাদেরকে নিঃসন্দেহে ডরমেয়ার লেকের পাশ ঘেঁষে যেতে হতো। নিজেকে সেই আমলের সওদাগরের জায়গায় ভাবল রানা, প্রকৃতির এই বিস্ময়—বিশাল বরফখণ্ড দেখে না জানি কেমন লাগত ওদের! নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের ক্ষমতার মহিমা ভেবে আপ্লুত হতো ওরা, একে পুজো করত। পানির তলার সমাধিটার কথা মনে পড়ল, এমন একটা জায়গায় ওটা তৈরি করার পিছনে নিশ্চয়ই গ্লেসিয়ারটার প্রতি অনুরাগের ভূমিকা ছিল। লুনার মত রানাও সমাধির ভিতরটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ইচ্ছে হলো এখুনি চলে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটা খুব রেগে যাবে, কষ্টও পাবে নিশ্চয়ই। আর যা-ই করুক, লুনার মনে কষ্ট দিতে চায় না ও।

উপলব্ধিটা আসতেই হাসি পেল রানার। কে এই লুনা পারসেল? কেন ওকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? কম মেয়ে তো আসেনি ওর জীবনে, বুকে ঝড়ও তুলেছে অনেকে। শেষ পর্যন্ত কারও সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা হয়নি ওর। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। সোহানা, মিত্রা সেন, ব্যারনেস লিনা অটারম্যান, রাফেলা বার্ড... কেউ কারও চেয়ে কম ছিল না; তবুও পিছিয়ে যেতে হয়েছে ওকে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু রেবেকা সাউল। কিন্তু রেবেকার পরিণতিই রানাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও মেয়েকে নিজের সঙ্গে জড়াবার ঝুঁকি নেয়া চলে না ওর। তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে। সেই থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে রানা। এখনও ঘনিষ্ঠ

হয় ও অনেকের, পেশার খাতিরে, মনের টানে... তবে সেসব সম্পর্কের স্থায়িত্ব নেই। মেয়েরাও বোঝে, ওকে কখনও বাঁধনে আটকানো যাবে না, একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওরাও সরে যায় নীরবে। এই লুনাও যাবে। অল্প কয়েকটা দিনের জন্য দু'জনের সম্পর্ক, সেটাকে গাঢ় করে লাভ নেই।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যতই যুক্তি দেখাক, কিছুতেই লুনাকে ছাড়া সমাধিতে যেতে পারবে না ও, মনের সায় পাবে না। তাই কী আর করা, সময় কাটাবার জন্য জলপরীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবকিছু চেক করে রাখছে, লুনা ফিরলেই যেন সময় নষ্ট না করে ডাইভ দিতে পারে।

ব্যাটারি চেক করল, নতুন এয়ার ট্যাঙ্ক বসাল, প্রতিটা যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কেটে গেল অনেকটা সময়। শেষে যখন স্টারফিশের ডেকে ফিরে এল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

আশি ফুট দীর্ঘ *স্টারফিশ* নুমার সবচেয়ে ছোট রিসার্চ ভেসেলগুলোর একটা। নোনা, বা মিঠা... দু'ধরনের পানিতেই স্বচ্ছন্দে অপারেট করা যায় জাহাজটাকে। নিউ ইংল্যাণ্ড উপকূলের বিপজ্জনক পানিতে যে-সব জাহাজ চলাচল করে, তারই মডিফায়েড ভার্শান বলা চলে স্টারফিশকে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দ্রুতগামী; শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনের কল্যাণে ঘণ্টায় বিশ নট গতিতে ছুটতে পারে। অন্য কোনও জাহাজ হলে আঁকাবাঁকা নদীপথ পেরিয়ে লেক ডরমেয়ারে পৌঁছুতেই পারত না।

গ্যালিতে গিয়ে হালকা লাঞ্চ করল রানা, তারপর এক মগ কফি নিয়ে ঢুকল জাহাজের রিমোট-সেন্সিং ল্যাবে। নামেই ল্যাব, দেখতে অবজারভেশন পোস্টের মত। ছোট্ট একটা কেবিনের

মধ্যে অনেকগুলো কম্পিউটার মনিটর গায়ে গায়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মুখোমুখি রয়েছে একটা চেয়ার। তবে এই অনাকর্ষণীয় কামরাটাই ডরমেয়ার লেকের তলায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সফিসটিকেটেড সেন্সরের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র।

চেয়ার টেনে বসল রানা, কফিতে আয়েশ করে চুমুক দিল, তারপর চোখ বোলাল সাইড-স্ক্যান সোনার ডিসপ্লে-র রিপোর্টে। সাবমারসিবল নিয়ে লেকের পুরো তলদেশ সার্ভে করা সম্ভব নয়, তাই নানা রকম আণ্ডারওঅটর সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে হ্রদের তীরসংলগ্ন পানিতে—লুনার থিয়োরির সেই অ্যাম্বার রুটের চিহ্ন খুঁজে পাবার জন্য। বিশাল একটা এলাকা স্ক্যান করছে সেন্সরগুলো, সময় লাগছে প্রচুর। রোজ একগাদা স্ক্যান-রিপোর্ট জমে, সময় নিয়ে সেগুলো স্টাডি করতে হয় ওকে। একঘেয়ে কাজ। ডরমেয়ার লেকের তলদেশ একেবারেই সাদামাঠা, কোনও বৈচিত্র্য নেই। কফি শেষ হতেই ঘুম ঘুম ভাব ভর করল রানার চোখে।

হঠাৎ পিঠ খাড়া হয়ে গেল ওর। একটা বৈসাদৃশ্য দেখতে পেয়েছে রিপোর্টে। দ্রুত কয়েকটা বাটন টিপল কি-বোর্ডের; নির্দিষ্ট কো-অর্ডিনেটে তাক করল সেন্সর। স্ক্রিনে একটা অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে, মাউস নেড়ে জুম করল ইমেজটা। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

একটা বিমান ফুটে উঠেছে স্ক্রিনে, ককপিটটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। বাটন চেপে একটা প্রিণ্টআউট বের করল রানা, আলোয় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। অনেক পুরনো ডিজাইনের বিমান, বিধ্বস্ত। একটা ডানা নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, ক্যাপ্টেনকে ছবিটা দেখাবে। আর তখুনি দরজা খুলে হুড়মুড় করে ল্যাবে ঢুকল ফরাসি অবজারভার ফ্রাঁসোয়া অঁরি। সচরাচর একটা হাসি ফুটে থাকে তার মুখে, এখন সেটা অদৃশ্য। চেহারা

কালো হয়ে আছে, যেন কোনও দুর্যোগ ঘটেছে।

'মসিয়ো রানা, প্লিজ, এখুনি ব্রিজে আসুন।'

'কী হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'মাদমোয়াজেল পারসেল... উনি...'

'কী হয়েছে লুনার?'

ফরাসি ভাষায় হড়বড় করে অঁরি যা বলল, তার অর্ধেকও বুঝতে পারল না রানা। সময় নষ্ট করল না ও, লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ব্রিজের দিকে। এক লাফে পেরুতে শুরু করল ল্যাডারের দু'তিনটে করে ধাপ।

পাইলটহাউসে পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার উলফকে, রেডিও-মাইক্রোফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। মাঝারি গড়নের মানুষ, কানাডায় জন্ম, মা ফরাসি ইমিগ্র্যান্ট। দক্ষ নাবিক, সেইসঙ্গে ফ্রেঞ্চ তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা, তাই এই এক্সপিডিশনের দায়িত্ব পেয়েছেন। রানাকে পাইলটহাউসে ঢুকতে দেখে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'দুঃসংবাদ, মি. রানা।'

'কী হয়েছে লুনার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাওয়ার প্ল্যান্টের সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও বলল, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'গ্লেসিয়ারের তলায় পানির প্রবাহ আনার জন্য টানেল নেটওয়ার্ক আছে... আর আছে একটা অবজারভেটরি—একদল বিজ্ঞানী ওখানে আইস-মুভমেণ্ট নিয়ে গবেষণা করছেন। ওখানেই গিয়েছিলেন মিস পারসেল। সুপারভাইজর বলছে, আচমকা গোটা টানেল নেটওয়ার্ক পানিতে তলিয়ে গেছে।'

'অবজারভেটরির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে ওরা?'

'না, টেলিফোন লাইন কাজ করছে না।'

'তারমানে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না, অবজারভেটরির লোকজন মারা গেছে কি না। রাইট?'

'হ্যাঁ।'

আশার আলো দেখতে পেল রানা, কয়েক মুহূর্ত নিল ইতিকর্তব্য ঠিক করার জন্য। যখন মুখ খুলল, তখন আশ্চর্য এক পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মধ্যে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে দৃঢ়প্রত্যয়।

'ক্যাপ্টেন,' বলল রানা, 'প্ল্যান্ট সুপারভাইজরকে বলুন, ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছি আমি। টানেল সিস্টেমের ডিটেইলড্ প্ল্যান যেন বের করে রাখে। একটা বোট নামাতে বলুন পানিতে, আমাকে তীরে নিয়ে যাবে।' এটুকু বলে থামল ও। হঠাৎ উপলব্ধি করেছে, শিপের ক্যাপ্টেনের উপর এভাবে হুকুমজারি করা শোভন নয়। লজ্জিত সুরে বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে অর্ডার দিতে চাইছি না। জাহাজটা আপনার। আমি স্রেফ অনুরোধ করছি।'

'অনুরোধ কেন, অর্ডারই করুন!' বললেন উলফ। 'এ-ধরনের সিচুয়েশনে কী করতে হবে, তার কিছুই জানি না আমি। আপনি নিশ্চিন্তে হুকুম দিতে থাকুন।'

'থ্যাঙ্কস্, ক্যাপ্টেন,' হাসল রানা। 'না, আপাতত আর কিছুর দরকার নেই।'

চেঁচিয়ে বোট নামাতে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর রেডিওতে যোগাযোগ করলেন প্ল্যান্ট সুপারভাইজরের সঙ্গে। কথা বলতে শুরু করলেন। পাইলট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা, পকেট থেকে বের করল সেলফোন। উদ্ধার-অভিযানে নামতে হবে ওকে, সেটা একা করতে পারবে না। যোগ্য একজন সহকারী দরকার... আর তেমন মানুষ একজনই আছে।

ববি মুরল্যাণ্ড—নুমায় ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ইতিপূর্বে

এ ধরনের বহু পরিস্থিতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছে ওরা দুজনে। রানা জানে, ইমার্জেন্সি কিংবা রেসকিউ অপারেশনের ক্ষেত্রে ববি মুরল্যাণ্ডের সমকক্ষ আর কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওকে হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। এ-মুহূর্তে প্যারিসে আছে মুরল্যাণ্ড, ফরাসি মেরিন রিসার্চ এজেন্সি *ইফ্রেমার*-এর একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসেছে। খুব দ্রুত এখানে চলে আসতে পারবে ও।

মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে ডায়াল করল রানা, জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে।

'হ্যাল্লো, রানা! কী খবর?'

'তোমার প্যারিস ট্রিপের ইতি ঘটাতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, ববি। এখুনি তোমাকে ডরমেয়ার লেকে আসতে হবে।'

'হায়, হায়! এ কী দুঃসংবাদ শোনাচ্ছ! সুন্দরী এক ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। দুজনে প্যারিস-ভ্রমণ করেছি। তারপর এসেছি চামোয়াঁ মাউন্টেইনস্‌ে ওর প্রাইভেট রিসোর্টে। কতকিছু প্ল্যান করে রেখেছি, আর তুমি কিনা...'

'চামোয়াঁ মাউন্টেইনস্‌?' খুশি হলো রানা, ওটা মাত্র বিশ মাইল দূরে। 'গুড, খুব কাছেই আছ দেখছি! যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো।'

'আরে... হয়েছে কী, সেটা তো বলবে!'

'তোমার আগ্রহ জাগাবার মত ব্যাপার। ওই ডিপ্লোম্যাটের কথা ভুলে যাও, এখানে আরেক সুন্দরী আটকা পড়েছে বরফে, তাকে উদ্ধার করতে হবে।' ঠাট্টা থামিয়ে এবার সিরিয়াস হলো রানা। 'ববি, তাড়াতাড়ি এসো। আই নিড ইউ।'

এবার ববিও বুঝতে পারল তাড়াটা। 'ঠিক আছে, দোস্ত। ধরে নাও, রওনা হয়ে গেছি আমি।'

লাইন কেটে দিয়ে শুভ্র গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা,

ওটাই ওর শত্রু। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে আছে, মাপা দৃষ্টিতে বিচার করছে প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য, ঠিক করছে যুদ্ধকৌশল। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা সম্ভব কি না, সেটা নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে শুধু লুনার মিষ্টি হাসির কথা। ওই হাসি আবার দেখতে হবে ওকে।

আট

পাওয়ার প্ল্যাণ্ট থেকে একটা মিনিট্রাক পাঠানো হয়েছে। বোট থেকে নেমে ওটায় চড়ে বসল রানা। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্ল্যাণ্টের দিকে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার, কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ধূসর বিল্ডিংটার সামনে। মাঝারি গড়নের একজন মানুষ বেরিয়ে এল অভ্যর্থনা জানাতে। রানা ট্রাক থেকে নামতেই হাত মেলাল।

'ওয়েলকাম, মসিয়ো রানা। আমি ডমেনেক থিয়োখি—প্ল্যাণ্ট সুপারভাইজর। খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। আমাকে জানানো হয়েছে, আপনি একজন রেসকিউ স্পেশালিস্ট।'

'নাইস টু মিট ইউ, মসিয়ো থিয়োখি,' দায়সারা ভঙ্গিতে পাল্টা করমর্দন করল রানা। 'দুঃখিত, কুশল বিনিময়ের সময় নেই, পরিস্থিতি খুলে বলুন আমাকে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। ভেতরে আসুন, ড্রয়িং দেখিয়ে সব বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।'

'এই আপনাদের পাওয়ার-প্ল্যাণ্ট?' হাঁটতে হাঁটতে একটু

বিস্ময়ের সুরে বলল রানা। বিল্ডিংটার আকার আরও বড় হবে বলে আশা করেছিল।

'বাইরেটা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না,' থিয়োখি বলল, 'এটা স্রেফ একটা পোর্টাল বিল্ডিং—অফিস স্পেস আর লিভিং কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করি আমরা। মূল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্বতের ভিতরে।'

বিল্ডিঙে ঢুকল দু'জনে। চওড়া একটা করিডোর পেরুল, তারপর আরেকটা দরজা খুলল সুপারভাইজর। ওপাশে দেখা গেল বিশাল এক গুহা, চমৎকারভাবে আলোকিত।

'এই গুহা প্রাকৃতিক,' হাঁটতে হাঁটতে বলল থিয়োখি, 'টানেল নেটওয়ার্ক তৈরির সময় আমরা যদ্দূর পেরেছি, প্রাকৃতিক গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। তারপরও পাহাড় আর গ্লেসিয়ারের তলায় প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার টানেল খুঁড়তে হয়েছে আমাদের।'

'বলেন কী! সে তো চাট্টিখানি কথা নয়।' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট নিঃসন্দেহে,' হাসল থিয়োখি। 'তবে কাজটা যতটা জটিল ভাবছেন, ততটা ছিল না। ইঞ্জিনিয়াররা বিশাল একটা টানেল-বোরিং মেশিন নিয়ে এসেছিল, ত্রিশ ফুট ডায়ামিটারের। ওটা দিয়ে সহজেই মাটি-পাথর খোঁড়া গেছে, বরফ তো আরও সোজা।'

গুহা পেরিয়ে একটা টানেল এণ্ট্রান্সের কাছে রানাকে নিয়ে গেল সে। জায়গাটা মৌমাছির মত গুঞ্জনে ভরে আছে।

'জেনারেটরের আওয়াজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' থিয়োখি মাথা ঝাঁকাল। 'আপাতত একটা টারবাইন অপারেট করছি আমরা। আরেকটা বসানোর পরিকল্পনা চলছে।' টানেলের ভিতরে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'এই-ই আমাদের কণ্ট্রোল রুম। ভেতরে আসুন।'

কামরাটা বর্গাকার, একেকটা দেয়াল পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ। তিনটে পাশ ভরে আছে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর প্যানেলে—সবখানে লাল-নীল-সবুজ বাতি জ্বলছে, পরিমাপ দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ডায়ালে। ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে একটা ঘোড়ার নাল আকৃতির কনসোল। চেয়ার টেনে ওটার পিছনে বসল থিয়োখি, আরেকটা চেয়ার ঠেলে দিল রানাকে বসার জন্য।

'প্ল্যাণ্টে কী করি আমরা, তা জানেন?' জিজ্ঞেস করল সুপারভাইজর।

'কিছুটা,' বসতে বসতে বলল রানা। 'বরফগলা পানির স্রোত ব্যবহার করে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরি করেন। তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল থিয়োখি। 'হ্যাঁ। প্রসেসটা জটিল কিছু নয়। প্রতি বছর তুষারপাত হয় এ-অঞ্চলে, গ্লেসিয়ারের উপরে জমে সেই তুষার। উষ্ণ ঋতুতে সেই বরফ গলে গিয়ে তৈরি হয় নানা রকম আইস-পকেট আর বরফ-নদী। টানেল সিস্টেমের মাধ্যমে ওই পানি আমরা টারবাইন পর্যন্ত আনি। পানির স্রোত টারবাইন ঘোরায়, তৈরি হয় জলবিদ্যুৎ।'

'প্রজেক্টটা তো বেশ বড় বলে মনে হলো,' রানা বলল। 'কতজন স্টাফ আছে আপনাদের?'

'মাত্র তিনজন,' উত্তর দিল থিয়োখি। 'তিন শিফটে ডিউটি করি আমরা। আসলে... পুরো প্রজেক্টই অটোমেটেড, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু। আমরা থাকি স্রেফ মনিটরিঙের জন্য।'

'সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা দেখাতে পারেন আমাকে?'

'নিশ্চয়ই!' কি-বোর্ডের উপর নেচে বেড়াল থিয়োখির আঙুল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই নানা রঙের আঁকাবাঁকা রেখায় ভরা একটা ডায়াগ্রাম ভেসে উঠল সামনের স্ক্রিনে। দেখতে অনেকটা মেট্রোপলিটান ট্রাফিক কণ্ট্রোলের ম্যাপের মত।

'নীল রঙের লাইনগুলো হচ্ছে পানিভর্তি টানেল,' বুঝিয়ে

দিল থিয়োখি। 'লাল রঙেরগুলো ড্রাই কনড্যুইট। টারবাইনটা... এখানে।' আঙুল তুলে দেখাল সে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডায়াগ্রামটা দেখল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'দুর্ঘটনা ঘটেছে কোন্ টানেলে?'

স্ক্রিনের একটা নীল রেখায় আঙুল ঠেকাল থিয়োখি। 'এটায়। অবজারভেটরির মেইন অ্যাকসেস টানেল।'

'পানির প্রবাহ বন্ধ করবার কোনও উপায় আছে?'

'সে-চেষ্টা আমরা করেছি, মসিয়ো রানা। আসলে.., ওঅটর টানেল আর রিসার্চ টানেলের মাঝখানের দেয়ালে ব্রিচ দেখা দিয়েছে, পানি ঢুকেছে ওখান দিয়েই। পানির প্রবাহ অন্যান্য টানেলে ডাইভার্ট করে দিয়ে আমরা নতুন পানি ঢোকা বন্ধ করেছি, কিন্তু তার আগেই রিসার্চ টানেল তলিয়ে গেছে।'

'দেয়ালে ব্রিচ দেখা দিল কীভাবে, ধারণা করতে পারেন?'

'ওটাই রহস্য, মসিয়ো। দেয়ালটাতে একটা দরজা আছে দুই টানেলের সংযোগ ঘটানোর জন্য, কিন্তু বছরের এই সময়ে ওটা আমরা বন্ধ করে রাখি। পানির কয়েক টন প্রেশারেও ওটা ভাঙার কথা নয়।'

'হুম। রিসার্চ টানেল থেকে পানিটা বের করার উপায় কী?'

'আশপাশের কয়েকটা টানেল বন্ধ করে পাম্পের সাহায্যে পানি সেঁচা যায়। কিন্তু তাতে প্রচুর সময় লাগবে।' হতাশা ফুটল থিয়োখির কণ্ঠে।

'কী বলছেন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'এতবড় নেটওঅর্ক আপনাদের, পানিটাকে অন্য কোনও টানেলে নিয়ে যেতে পারবেন না?'

'আসুন, দেখাচ্ছি আমাদের সমস্যাটা কোথায়।' কণ্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল থিয়োখি। পাশের একটা টানেল ধরে রানাকে নিয়ে চলল সে। জেনারেটরের গুঞ্জন ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ

কানে বাজল ওদের—যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে গাছগাছালির মধ্য দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে জোরালো হচ্ছে শব্দটা।

লোহার একটা মই বেয়ে মাঝারি এক অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে উঠে এল দুজনে। জায়গাটা ওঅটরটাইট প্লাস্টিক আর মেটাল ফ্রেমে ঘেরা। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। দেয়ালে লাগানো একটা সুইচ টিপল থিয়োখি, বড় বড় ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল প্ল্যাটফর্মের বাইরের দিকটা। বড় একটা টানেল দেখতে পেল রানা, ওখান দিয়ে প্রবল বেগে বইছে ফেনায়িত পানি—ফুঁসছে, গজরাচ্ছে, ছুঁতে চাইছে নিরাপদ উচ্চতায় বসানো প্ল্যাটফর্মটাকে। প্রকৃতির ভয়াবহ আক্রোশের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

'বছরের এই সময়ে বড় বড় আইস পকেট গলে বেরিয়ে আসে পানি,' গলা চড়িয়ে বলল থিয়োখি। 'স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে মিলে গিয়ে পাহাড়ি ঢলে পরিণত হয়। সমতল এলাকায় এই বাড়তি পানিই বন্যা ঘটায়। নিজের চোখেই দেখুন পরিস্থিতি। পানির এই বিশাল প্রবাহই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। রিসার্চ টানেলের পানি ড্রেইন করতে গেলে আবার নতুন করে পানি ঢুকে পড়বে ওখানে। আমি দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই, যথেষ্ট করেছেন আপনি ইতিমধ্যে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'চলুন এখন, আমাকে রিসার্চ টানেলের ডিটেইলড্ ডায়াগ্রাম দেখান।'

'নিশ্চয়ই, আসুন।' ফিরতি পথে পা বাড়াল থিয়োখি। বাঙালি যুবকটিকে তার পছন্দ হয়েছে খুব। বিপদের মুহূর্তে শান্ত আর অবিচল থাকার অদ্ভুত একটা গুণ আছে মানুষটার মধ্যে, যা সচরাচর দেখা যায় না।

কন্ট্রোল রুমে ফিরে এল দুজনে। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। খুব দ্রুত একটা

প্ল্যান খাড়া করতে হবে ওকে, নইলে লুনার কোনও আশা নেই। থিয়োখি তার কেবিনেট থেকে বেশ কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট বের করে বিছিয়ে ফেলেছে কনসোলের উপর, সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

'এটা টানেলের মেইন এন্ট্রান্স,' নকশার উপর আঙুল বোলাল থিয়োখি। 'চারকোনা এই বক্সগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানীদের লিভিং কোয়ার্টার। লিভিং এরিয়া থেকে এক মাইল দূরে ওদের ল্যাব।' আরেকটা নকশা দেখাল সে। 'সাইড ভিউতে দেখুন, ল্যাবের ছাত পর্যন্ত একটা সিঁড়ি আছে, ওটা দিয়ে আরেকটা লেভেলে যাওয়া যায়। ওই লেভেল থেকে সাব-গ্লেশ্যাল অবজারভেটরিতে যাবার জন্য আলাদা প্যাসেজ আছে।'

নকশাগুলো মগজের ভিতর গেঁথে নিচ্ছে রানা। জানতে চাইল, 'কতজন আটকা পড়েছে ওখানে, বলতে পারেন?'

'বিজ্ঞানীরা আছেন তিনজন, মাত্র তিনদিন আগে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, বেড়াতে এসেছিলেন। আপনাদের শিপ থেকে আসা ওই ভদ্রমহিলা আছেন, ফরাসি সরকারের একজন প্রতিনিধি আছেন। দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে একটা ফ্লোটপ্লেনে চড়ে কয়েকজন অতিথি এসেছিল বলে শুনেছি, তবে কতজন... তা বলতে পারব না। ফ্লোটপ্লেনটা একটু আগে টেকঅফ করে চলে গেছে, হতে পারে অতিথিরা সবাই ফিরে গেছে তাতে।'

ভাল করে ব্লু-প্রিন্ট দেখল রানা, তারপর মন্তব্য করল, 'অবজারভেটরিটার লোকেশন রিসার্চ টানেলের উপরে।'

'হ্যাঁ,' থিয়োখি মাথা ঝাঁকাল।

'তা হলে,' বলল রানা, 'টানেলের লোকজন যদি ওখানে পৌঁছুতে পারে, নিরাপদ আশ্রয় পাবে। রাইট? রিসার্চ টানেলে পানি ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা, কাজেই অবজারভেটরিটা শুকনো থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।'

'গুড অবজার্ভেশন,' থিয়োখি বলল। 'কিন্তু আপনার মনে

রাখতে হবে, ওখানে অক্সিজেনের পরিমাণ সীমিত, তাজা বাতাস ঢুকছে না। চার-পাঁচজন মানুষ খুব বেশি সময় টিকতে পারবে না ওখানে। এতক্ষণে মরেই গেছে কি না কে জানে!'

আশঙ্কাটা রানার মাথাতেও উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু ও-নিয়ে ভাবতে চাইছে না। এখুনি নেতিবাচক চিন্তাকে ঠাঁই দিতে চায় না। নকশার দিকে মনোযোগ দিল ও। লক্ষ করল, মেইন টানেলটা অবজারভেটরি পেরিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়েছে।

'কোথায় গেছে এটা?' রেখাটার উপর আঙুল রেখে জানতে চাইল রানা।

'দেড় কিলোমিটার দূরে, অন্যপাশের পাহাড় পর্যন্ত,' বলল থিয়োখি। 'উঁচু হয়ে বেরিয়ে এসেছে ওপাশের ঢালে।'

'মুখটা কত বড়?'

'মাইন এণ্ট্রান্সের মত। ওখান দিয়ে ভিতরে মালামাল নেয়া হয়।'

'ওটা দেখতে চাই আমি,' বলল রানা। মাথার ভিতর একটা প্ল্যান উঁকি দিতে শুরু করেছে ওর। ভাগ্যের সহায়তা প্রয়োজন হবে, তবে একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে না কাজটা।

'সব টানেল পানিতে ভরে আছে, ওখানে যাওয়া যাবে না। তবে আপনি চাইলে এপাশ থেকে দেখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'চলুন।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টের পোর্টাল বিল্ডিঙের ছাদে বেরিয়ে এল ওরা। গ্লেসিয়ারের ওপাশে একটা গিরিখাদ দেখাল থিয়োখি। 'মুখটা ওই ছোট্ট উপত্যকার পাশে।'

রানা সেদিকে তাকাতেই কানে ভেসে এল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। একটু পর একটা হেলিকপ্টার উদয় হলো আকাশে, পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে এগিয়ে আসছে।

'থ্যাঙ্ক গড!' বলে উঠল থিয়োখি। 'সাহায্যের আবেদন

জানিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায়, মনে হচ্ছে তার জবাব দিতে আসছে কেউ।'

তাড়াহুড়ো করে নীচতলায় নেমে এল দুজনে, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। কয়েক মিনিট পরেই প্ল্যান্টের সামনের ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। তিনজন মানুষ বেরুল সেটা থেকে। রানার মুখ দিয়ে একটা হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ বেরুল। রেসকিউ পার্টি নয়, সুট-বুট পরা লোক, কর্পোরেট ব্যবসায়ীর চেহারা।

'আরে, এ দেখছি মসিয়ো ডুরান্ট!' নবাগতদের নেতাকে চিনতে পেরে বিস্মিত কণ্ঠে বলল থিয়োখি।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ইমিডিয়েট বস,' থিয়োখি বলল। 'উনি তো কখনোই আসেন না এখানে!'

'আসার মত কারণ ঘটেছে আজ,' শান্তগলায় বলল রানা।

ডুরান্টের চেহারা-সুরত ঠিক আগাথা ক্রিস্টির বিখ্যাত চরিত্র এরকুল পোয়ারোর মত। বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক... নাকের নীচে পাকানো গোঁফটাও ঝুলছে। ওদের সামনে এসে থামল সে। সৌজন্য প্রকাশের ধার ধারল না, কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে হচ্ছেটা কী, থিয়োখি?'

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সুপারভাইজর, রানা তাকাল কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে। কাঁটাগুলো যেন দামাল ছেলের মত ঘুরছে, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত।

'হুম,' থিয়োখির কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল ডুরান্ট। 'এই ঘটনায় প্রোডাকশনের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে?'

'এক্সকিউজ মি,' নাক গলাল রানা। 'প্রোডাকশনের চেয়ে মানুষের উপর প্রভাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কি? ভিতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছে।'

চেহারায় চরম বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল ডুরাণ্ট। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আবার কে?'

'ইনি মসিয়ো মাসুদ রানা,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল থিয়োখি। 'নুমা-র সঙ্গে আছেন। রেসকিউ স্পেশালিস্ট।'

'নুমা?' বিদ্রূপের সুরে বলল ডুরাণ্ট। 'এখানে আপনাদের কোনও কাজ নেই, রেসকিউ স্পেশালিস্টেরও অভাব নেই আমাদের। যান, নিজের চরকায় তেল দিন।'

'আপাতত এটাই আমার চরকা, মি. ডুরাণ্ট,' কোনোমতে রাগ দমিয়ে বলল রানা। 'ওই টানেলে আমার বান্ধবী আছে!'

'সমবেদনা রইল,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ডুরাণ্ট। 'কিন্তু উপরমহলের নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না। ওঁদের অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হবে, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'তাতে অনেক সময় লেগে যাবে,' বলল রানা। 'আমাদের এখুনি কিছু করা দরকার!'

'আমি নিরুপায়। দুঃখিত। থিয়োখি, চলো।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকে গেল ডুরাণ্ট। সঙ্গীরা অনুসরণ করল তাকে। রানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল থিয়োখি, তারপর সে-ও পিছু নিল বসের।

রাগে শরীর কাঁপছে রানার, ইচ্ছে করছে কলার ধরে বের করে আনে বজ্জাত ফরাসিটাকে, মনের সাধ মিটিয়ে উত্তম-মধ্যম দেয়। হয়তো তা-ই করত, বাধা পেল নতুন করে রোটরের আওয়াজ শুনে। আরেকটা হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে আকাশে, প্রথমটার চেয়ে ছোট। পাওয়ার প্ল্যাণ্টের কাছে এসে থামল ওটা, ল্যাণ্ড করল ডুরাণ্টের কপ্টার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। পাইলট ছাড়া আর কোনও আরোহী নেই ওতে। ইঞ্জিন চালু রেখেই ওটা থেকে লাফিয়ে নামল মানুষটা।

ববি মুরল্যাণ্ড।

ছোটখাট মানুষ সে, বেঁটেই বলা চলে, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পুরো করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে রানা তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আর বন্ধুর জন্য পারে না, এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই। ছোট ছোট কদমে ছুটে এল মুরল্যাণ্ড, বরাবরের মত জাপটে ধরল রানাকে।

'হাই, দোস্ত!'

হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি মুরল্যাণ্ডের, লম্বা ও চওড়ায় ছোটখাট একটা ভল্লুকের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে তার। এত জোরে রানাকে চাপ দিচ্ছে যে মনে হলো, হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে যাবে এখুনি।

'আরে... ছাড়ো, ছাড়ো! মেরেই ফেলবে নাকি!'

'কীসের ছাড়াছাড়ি?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আদর করছি ভাবছ নাকি? এটা তোমার শাস্তি... অপরূপা এক মেয়ের বাহুডোর থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছ বলে।'

'কেন?' কোনোমতে বলল রানা। 'তোমার বান্ধবী খুব খেপেছে?'

বন্ধুকে ছেড়ে দিল মুরল্যাণ্ড। 'মোটেই না। সোফি নিজেও একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। কাজেই যখন বললাম, দায়িত্বের ডাক পেয়েছি, ও খুব সহজভাবে নিল। সত্যি বলতে কী, কপ্টারও ও-ই ম্যানেজ করে দিয়েছে।'

'তা হলে আমি শাস্তি পেলাম কোন্ দোষে?' গা ডলছে রানা।

'শাস্তি কোথায়? এ তো স্রেফ নমুনা। এখানে যদি সোফির চেয়ে উত্তেজক অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান না পাই, তখন বুঝবে শাস্তি কাকে বলে। অবশ্য তোমার সঙ্গে জুটলে কখনোই হতাশ হতে হয় না, সেটাই সান্ত্বনা।'

হেসে ফেলল রানা। 'এসেছ বলে ধন্যবাদ, ববি।'

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, তুমি ডাকলে আমি না এসে পারি? কী ঘটেছে এখানে?'

হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে রানা। বলল, 'এসো, যেতে যেতে বলছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করল মুরল্যাণ্ডের হেলিকপ্টার। বন্ধুকে সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল রানা। কথা শেষ হলে মুরল্যাণ্ড জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

'বিশ্রী ব্যাপার,' বলল সে। 'তোমার বান্ধবীর জন্য দুঃখিত, রানা। লুনা পারসেল... নামের মধ্যেই একটা সৌন্দর্য আছে। দেখা হলে মন্দ হতো না।'

'আশা করি সে-সৌভাগ্য তোমার হবে,' বলল রানা। কিন্তু জানে, প্রতি মুহূর্তে কমছে লুনাকে জীবিত উদ্ধার করার সম্ভাবনা।

গ্লেসিয়ার পেরিয়ে এল ওরা, থিয়োখির দেখিয়ে দেয়া উপত্যকাটায় মুরল্যাণ্ডকে ল্যাণ্ড করতে বলল রানা। সমতল একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে কপ্টার নামাল মুরল্যাণ্ড। ইমার্জেন্সি কিট থেকে একটা টর্চলাইট নিয়ে একটু পরেই মাটিতে পা রাখল দু'বন্ধু। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল টানেল এন্ট্রান্সের দিকে। এখানে শীতের প্রকোপ বেশি। ভারী কাপড় ভেদ করে

ঘাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে ঠাণ্ডা বাতাস। ঠকঠক করে কাঁপছে ওরা, শীতে... এবং উত্তেজনায়।

এণ্ট্রান্স খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। বিশাল বড় এক গহ্বর হাঁ করে আছে পর্বতের গায়ে, বাইরের অংশটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। প্রবেশমুখে পৌঁছে টর্চ জ্বালল রানা, আলো ফেলল ভিতরে। টানেলটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচে, পর্বতের গভীরে। খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, কারণ প্রবেশমুখে বিশ গজ পর থেকেই দেখা যাচ্ছে পানি। গোটা টানেল পানিতে ভরে আছে।

শিস দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'অন্ধকূপ বোধহয় একেই বলে,' বলল সে। রানার দিকে তাকাল। 'তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কোনও আইডিয়া গজাচ্ছে?'

'অনেক আগেই গজিয়েছে,' বলল রানা। 'ওটা কাজে লাগানো যাবে কি না, সেটা দেখার জন্য এখানে এসেছি।'

'কী বুঝলে?'

'সম্ভব, তবে সাহায্য লাগবে। পাওয়ার প্ল্যাণ্টে চলো। ওদের হেলিকপ্টারটা দরকার। দেখি, কথা বলে রাজি করানো যায় কি না।'

'যদি বলো তো হাইজ্যাক করে আনতে পারি।'

ডুরাণ্টের রুক্ষ চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখে। 'হয়তো তা-ই করতে হবে,' বলল ও।

পাওয়ার প্ল্যাণ্টের সামনে রানা আর মুরল্যাণ্ড ল্যাণ্ড করতেই শশব্যস্ত ভঙ্গিতে ছুটে এল ডুরাণ্ট। তার হাবভাবে আমূল পরিবর্তন এসেছে। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'মাফ করবেন, মসিয়ো রানা, আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে... পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, তা জানা ছিল না আমার...'

'এখন মনে হচ্ছে জানেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ইয়ে... হ্যাঁ। আমার ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে। অ্যামেরিকান এম্বাসি থেকে অনুরোধ পেয়েছেন তিনি, তাই নুমা-কে সবরকম সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে।'

'শুনে খুশি হলাম,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল রানা। মনে মনে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে। স্টারফিশ থেকে রওনা হবার আগেই নুমা চিফকে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে এসেছিল ও। তিনি সেই খবর শুনে কলকাঠি নেড়েছেন, ফ্রান্সের মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন পাওয়ার প্ল্যান্টের ডিরেক্টরের সঙ্গে। নইলে এই ত্যাঁদোড় লোকটা সিধে হতো না।

'একটা সুসংবাদও আছে, মসিয়ো,' রানাকে খুশি করতে চাইছে ডুরান্ট। 'ফুল-স্কেল রেসকিউ-র জন্য একটা টিম আসছে প্যারিস থেকে।'

'কতক্ষণ লাগবে ওদের পৌঁছুতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই ধরুন... তিন-চার ঘণ্টা।'

'ততক্ষণে টানেলের ওরা মারা যাবে, মি. ডুরান্ট।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডুরান্ট। 'অন্তত লাশগুলো উদ্ধার করতে পারব আমরা। দুঃখিত, এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই আমাদের।'

'আছে। আমরা ওদেরকে জীবিত বের করে আনব। কিন্তু সেজন্য আপনার সাহায্য দরকার।'

'কী বলছেন এসব!' অবাক হলো ডুরান্ট। 'ওরা বরফের আটশো ফুট গভীরে আটকা পড়ে আছে...' বলতে বলতে থেমে গেল সে। রানার মুখে দৃঢ়সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে, সেটা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। হার মানার ভঙ্গিতে সে বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক। বলুন কী চাই আপনার?'

'আপনার হেলিকপ্টার আর পাইলটকে ধার নিতে চাই

আমি।'

'শিয়োর! কিন্তু আপনাদের তো কপ্টার আছেই।'

'বড় হেলিকপ্টার দরকার আমার।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। মানুষগুলো বরফে আটকা পড়েছে, আকাশে নয়।'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই, হেলিকপ্টারটা দেবেন কি না বলুন!'

শ্রাগ করল ডুরাণ্ট। 'ঠিক আছে, আমি পাইলটকে বলে দিচ্ছি।' কপ্টারের দিকে চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে রেডিও-তে স্টারফিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মুরল্যাণ্ড। পাওয়ার প্ল্যাণ্টে ফেরার পথে ওকে প্ল্যানটা খুলে বলেছে রানা, সেই মোতাবেক ক্যাপ্টেনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে ও। কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল। জানাল, 'স্টারফিশ স্ট্যাণ্ডবাই আছে, রানা।'

'গুড,' বলে গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। মস্ত এক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, অথচ জানে না, যার জন্য এতকিছু, সে আদৌ বেঁচে আছে কি না।

নয়

বেঁচে আছে লুনা পারসেল। শুধু তা-ই নয়, এই মুহূর্তে ও রাগে ফুঁসছে। এই রাগ অগাস্টিন লেগ্রাঁর উপর। জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটার দ্বারপ্রান্ত থেকে ওকে ফিরে আসতে হয়েছে এই

লোকটার জন্য। সঙ্গীদের মরণও ডেকে এনেছে সে উচ্চাভিলাষী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

'গর্দভ কোথাকার!' শেষ পর্যন্ত লেগ্রাঁকে গাল দিয়ে বসল লুনা।

পিট পিট করে ওর দিকে তাকাল লেগ্রাঁ। 'কী বললে?'

'বলছি যে, তুমি একটা গর্দভ, অগাস্টিন!' রাগের চোটে সম্বোধন *তুমি*-তে নামিয়ে এনেছে লুনা। 'কষে তোমার দু'গালে দুটো চড় বসাতে পারলে মনে শান্তি পেতাম।'

ওর জ্বলজ্বলে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল লেগ্রাঁ। বুঝতে পারছে, মেয়েটা সত্যি সত্যি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মান-ইজ্জত আর অবশিষ্ট থাকবে না তাতে। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা তুলল। বলল, 'প্লিজ, লুনা, আমি আহত!'

'নিজের দোষে!' যোগ করল লুনা। 'ছাগল কোথাকার, পিস্তলঅলা ওই বদমাশটাকে তো তুমিই টানেলে ঢুকতে দিয়েছ।'

'আমি তো ভেবেছি ও রিপোর্টার।'

'রিপোর্টারই বা তোমাকে আনতে বলেছিল কে?' চেঁচিয়ে উঠল লুনা।

'আ... আমি আসলে...' তোতলাচ্ছে লেগ্রাঁ।

'তুমি আসলে হাভাতে কুকুর। সাংবাদিক ডেকে হিরো সাজতে গিয়েছিলে, না? খ্যাতির নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিলে, মাথা কাজ করছিল না। করবে কী করে, মাথাভর্তি গোবর ছাড়া আর কী আছে তোমার? একটা টিকটিকির মাথাতেও তোমার চাইতে বেশি মগজ থাকে।'

'মাদমোয়াজেল, প্লিজ!' নাক গলালেন ড. দ্যুবোয়া। 'শান্ত থাকুন। যত চেঁচাবেন, তত দ্রুত অক্সিজেন খরচ হবে। নষ্ট করার মত বাতাস নেই এখানে।'

'অক্সিজেন বাঁচিয়ে লাভ কী, ডক্টর?' সরোষে বলল লুনা। 'বরফের আটশো ফুট গভীরে আটকা পড়েছি আমরা। কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাদের।'

হাতজোড় করার ভঙ্গি করলেন দ্যুবোয়া। 'তাও... প্লিজ, বাকিদের কথা ভাবুন।'

সঙ্গীদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকাই রাগ পানি হয়ে গেল লুনার। বুঝতে পারছে, হৈচৈ করে খামোকাই পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলছে ও। বিব্রত হলো, বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

কলিন্সের দিকে এগিয়ে গেল লুনা, প্লাস্টিকের একটা তারপুলিন বিছিয়ে মেঝের উপর বসে আছে রিপোর্টার, নোটবুক খুলে কী যেন লিখছে। তার গা ঘেঁষে বসল ও, বলল, 'অযাচিত ঘনিষ্ঠতায় বিরক্ত হবেন না, আমি আসলে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

হেসে ফেলল কলিন্স, নোটবুক সরিয়ে রেখে লুনাকে জড়িয়ে ধরল এক হাতে, দেহের উত্তাপ ভাগাভাগি করতে দিল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'এতক্ষণ যা গরম দেখালেন, ভাবিনি ঠাণ্ডা আপনাকে কাবু করতে পারে।'

লুনা লজ্জা পেল। 'সরি, খুব বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি, না?'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল কলিন্স। লেগ্রাঁকে দেখাল ইশারায়। 'লোকটার এই ব্যবহার প্রাপ্য ছিল।'

'আরও খারাপ কিছু হওয়া দরকার ওর,' লুনা বলল। 'আমার কত বড় ক্ষতি করেছে, জানেন?'

'কী করেছে?'

'লাইফটাইম ডিসকভারি করতে যাচ্ছিলাম, সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছে আমাকে। কেন? বরফের তলায় মরার জন্য!'

চারপাশে নজর বোলাল কলিন্স। ভুল বলেনি লুনা, সত্যিই মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। রিসার্চ টানেল পানিতে ভরে যাবার আগেই অবজারভেটরিতে উঠে আসতে পেরেছে ওরা, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। টেলিফোন কাজ করছে না, সারফেসের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। পাওয়ার সাপ্লাইও কাজ করছে না ঠিকমত। হিটিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেছে, নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে বাতি, বায়ু-চলাচল নেই। ঠাণ্ডা এবং প্রায়ান্ধকার পরিবেশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে আটজন মানুষ। এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

মৃত্যুচিন্তা থেকে মনকে দূরে রাখতে চাইল কলিন্স। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য লুনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের ডিসকভারির কথা বলছেন?'

'প্রাচীন একটা সমাধি খুঁজে পেয়েছি আমি ডরমেয়ার লেকের তলায়। আমার ধারণা, ওটার সঙ্গে প্রাচীন অ্যাম্বার রুটের সম্পর্ক আছে...' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে নিজের স্বপ্নের প্রজেক্টের কথা বলতে শুরু করল লুনা।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল কলিন্স।

'কোনও সমস্যা হচ্ছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল লুনা।

মলিন একটা হাসি ফুটল কলিন্সের ঠোঁটে। বলল, 'সমস্যার তো অন্ত নেই, মিস পারসেল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কী, জানেন? ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং স্টোরির সন্ধান পেয়েছি—সাবগ্লেশ্যাল অবজারভেটরি, বরফে জমে থাকা মমি, লেকের তলায় প্রাচীন সমাধি... কী নেই এতে! অথচ এই কাহিনি আমাকে কবরে নিয়ে যেতে হচ্ছে!'

ওদের কথা শুনছিল পাশে বসা দুই সাংবাদিক। একজন বলে উঠল, 'আরে মসিয়ো, এই দুঃখ কি কেবল আপনার?

আমরাও তো একই পথের পথিক।'

'ইশ্‌শ্‌, একটা ওঅটর জেট থাকলে আমরা টানেল খুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারতাম!' আফসোস করল কলিন্স।

'তাতে সময় লাগত তিন মাস!' ফোড়ন কাটল ক্যাসিডি। 'হিসেবটা আমি অনেকক্ষণ আগেই করে রেখেছি।'

'হিসেবটা কি উইকএণ্ড-সহ, নাকি উইকএণ্ড-ছাড়া?' রসিকতা করল কলিন্স।

দুঃসহ এই পরিস্থিতিতেও হেসে উঠল সবাই। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল বিপদের কথা। হাসল না কেবল লেগ্রাঁ, হাতের ব্যথায় জান বেরিয়ে যাচ্ছে তার, হাসাহাসিতে যোগ দেবার অবস্থায় নেই।

চকিতের জন্য রানার কথা মনে পড়ে গেল লুনার। কী করছে মানুষটা? দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর? রানা কি অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে মেনে নিয়েছে? নাকি ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে? ওকে যতটুকু চিনেছে লুনা, তাতে পরেরটা হবারই সম্ভাবনা বেশি। যদিও তাতে লাভ নেই, এই আঁধার পাতালেই লুনার শেষ শয্যা হতে যাচ্ছে। খারাপ লাগছে খুব, কখন যেন দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, কোমল-কঠোরে মেশানো হৃদয়টা নিষ্ঠুর সুন্দর! আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যেতে হয়—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও কারও ঠকতে হবে না। আবার ভয়ও লাগে, কেমন জানি একটা বেপরোয়া ভাব আছে চেহারায়, যেন চাইলেই ভয়ানক নির্মম হয়ে উঠতে পারবে। প্রিয় সেই মুখটি আর কখনও দেখতে পাবে না ভাবলেই বুক ফেটে যাচ্ছে।

বিষমাখা দৃষ্টিতে লেগ্রাঁর দিকে তাকাল লুনা। এই লোকটাই

সমস্ত নষ্টের গোড়া। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, নরকের এই কীটটার সঙ্গেই মরতে হচ্ছে ওকে। বাঁচার কোনও উপায় নেই। মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে আবার। মনোযোগ ফেরানোর জন্য তাকাল প্রাচীন শিরোস্ত্রাণের কণ্টেইনারটার দিকে। অবজারভেটরিতে ওঠার সময় ওটা নিয়ে আসা হয়েছে। হাতের নাগালে পড়ে আছে কণ্টেইনার, কাছে টেনে নিল লুনা, ভিতর থেকে বের করে আনল শিরোস্ত্রাণটা। আবছা আলোয় নেড়ে-চেড়ে দেখল।

চমৎকার জিনিস, দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া। নকশাগুলো স্রেফ কারুকাজ বলে মনে হলো না, তাতে ছন্দ আছে, যেন কোনও গূঢ় বক্তব্য লুকিয়ে আছে ওতে। সময় পেলে অর্থ বের করতে পারত ও, কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। মাথা দপদপ করছে অক্সিজেন-স্বল্পতার কারণে। বিড়বিড় করে লেগ্রাঁকে অভিশাপ দিল লুনা। তারপর চেতনা হারাল।

জলপরীর রিয়ার ডেকে অনেকগুলো ওঅটরপ্রুফ ব্যাগ বেঁধেছে রানা, কাজ শেষ করে পিছিয়ে এল, তাকিয়ে দেখল অবস্থা। হাইটেক সাবমারসিবল বলে আর মনে হচ্ছে না ওটাকে, দেখাচ্ছে মালবাহী পশুর মত। করার কিছু নেই, বরফের তলায় ঠিক কতজন আটকে আছে, তা জানা নেই ওর, কাজেই হাতের কাছে যত স্কুবা ইকুইপমেণ্ট পেয়েছে, সব নিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট সাবমারসিবলে এসব যন্ত্রপাতি নেবার জায়গা নেই, বাইরে বেঁধে নিতে হয়েছে। বাড়তি ওজনে জলপরীর ম্যানুভার বাধাগ্রস্ত হয় কি না, সেটা পানিতে না নামলে বোঝা যাবে না।

ফ্রাঁসোয়া অঁরির দিকে ফিরে ইশারা দিল রানা, সব ঠিক আছে। একটা হ্যাণ্ডহেল্ড রেডিও নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অঁরি, শিপ আর হেলিকপ্টারের মাঝে লিয়াজোঁ এবং দোভাষী হিসেবে কাজ

করছে। রানার ইশারা পেয়ে রেডিওতে মেসেজ দিল সে, একটু পরেই পাওয়ার প্ল্যান্টের সামনে থেকে টেকঅফ করল বড় কপ্টারটা, উড়ে এল স্টারফিশের দিকে।

জাহাজের উপরে এসে থামল কপ্টার, হোভার করতে করতে কেইবল নামিয়ে দিল। ঘূর্ণায়মান রোটরের কারণে উদ্দাম বাতাস বইছে ডেকের উপর, মাথা নিচু করে এগোল রানা, কেইবলের প্রান্তে লাগানো হুক আঁকড়ে ধরে টানতে শুরু করল। নিরাপদ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য একটা ট্রেইলারের মধ্যে ওঠানো হয়েছে জলপরীকে, ওটাতে লাগানো হয়েছে ফোর পয়েন্ট হারনেস সিস্টেম, হারনেসের লুপে কেইবলের হুক আটকে দিল ও।

সঙ্কেত পেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল কপ্টার, টানটান হয়ে গেল কেইবল। রোটরের কান-ফাটানো আওয়াজে মগজ পানি হয়ে যাবার জোগাড়। সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে খাটছে ইঞ্জিন, কিন্তু ডেক থেকে কয়েক ইঞ্চির বেশি উঠল না ট্রেইলার। লিফটিং ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি ওজন ওটার।

'পাইলটকে থামতে বলুন,' অঁরির কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল রানা। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

জাহাজের স্ট্রাকচারের ভিতরে চলে এল ও। রেডিওতে যোগাযোগ করল মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে—অন্য কপ্টারটা নিয়ে সে নিরাপদ দূরত্বে হোভার করছে।

'সমস্যা দেখা দিয়েছে, ববি।'

'দেখেছি। আমাদের আসলে একটা স্কাই-ক্রেইন দরকার,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' রানা বলল। তারপর ব্যাখ্যা করল ওর পরিকল্পনা।

হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ায় তোমার তুলনা নেই, দোস্ত।'

'কী মনে হয়, পারবে?'

'কঠিন, খুবই বিপজ্জনক... তবে ওসব না থাকলে জীবন পানসে হয়ে যেত। পারব, রানা।'

'ভালমত ভেবে দেখো...'

'আরে, তুমি আবার দ্বিধা জাগাতে চাইছ নাকি? বললাম তো পারব।'

মুরল্যাণ্ডের ফ্লাইং স্কিল নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে—হেলিকপ্টার, জেটপ্লেন আর টার্বোপ্রপ এয়ারক্র্যাফটে কয়েক হাজার ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে তার। কিন্তু অযাচিত বিপদ কোন্‌দিক থেকে আসবে, সেটা কেউ বলতে পারে না। বাতাসের সামান্য ধাক্কা, কিংবা ইকুইপমেণ্ট ফেইলিওরে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বন্ধুকে এমন বিপদের মুখে ঠেলতে ইচ্ছে করছে না, পারলে নিজেই যেত। কিন্তু জানা কথা, মুরল্যাণ্ড কিছুতেই জায়গা অদলবদলে রাজি হবে না।

'আমি রেডি আছি, রানা,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়ো।' বন্ধুর মনের কথা পড়তে পারছে সে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর অঁরিকে ডেকে বুঝিয়ে দিল ওর পরিকল্পনা। ফরাসি পাইলটের জন্য সেটা অনুবাদ করে শোনাল অঁরি। একটু পরেই সরতে শুরু করল বড় হেলিকপ্টার, হারনেসে বাঁধা কেইবলটা কোনাকুনি হয়ে গেল। জায়গা পেয়ে এগিয়ে এল মুরল্যাণ্ড, আরেকটা কেইবল নামাল ওর কপ্টার থেকে। সেটার হুকও ট্রেইলারের হারনেসে আটকে দিল রানা।

দুটো কেইবলের সাহায্যে এখন তোলা হবে লোড। ওজনের খানিকটা অংশ ভাগ করে নেবে মুরল্যাণ্ডের কপ্টার। শেষবারের মত দুই আকাশযানের পজিশন দেখে নিল রানা, তারপর রেডিওতে নির্দেশ দিল মুভ করবার জন্য।

সিনেমার স্লো-মোশনের মত ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়াল দুই

কপ্টার, একটু যুঝল ট্রেইলারের ওজন সামলাতে, তবে কোনও বিপদ ঘটল না। ধীরে ধীরে লেকের সারফেস থেকে কয়েকশো ফুট উপরে উঠে গেল ট্রেইলার, ওটাকে গ্লেসিয়ারের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল মুরল্যাণ্ড আর ফরাসি পাইলট। শ্বাসরুদ্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। একটু পরেই পাহাড়ি ঢালের আড়ালে চলে গেল ওরা।

ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছে মুরল্যাণ্ড। মাঝে মাঝে বিরতি নিচ্ছে কোর্স কারেকশনের জন্য। পনেরো মিনিট পর স্বভাবজাত ভঙ্গিতে রিপোর্ট করল, 'পাখি নীড়ে পৌঁছেছে। দমটা এবার ছাড়তে পারো, রানা।'

হাততালি দিয়ে উঠল স্টারফিশের ডেকে জড়ো হওয়া ক্রু-রা। রানার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে। অঁরির সঙ্গে হাত মেলাল ও, তারপর কয়েকজন ক্রু নিয়ে নেমে পড়ল অপেক্ষমাণ বোটে, রওনা হলো তীরের উদ্দেশে।

হ্রদের পাড় থেকে ওদেরকে হেলিকপ্টারে তুলে নিল মুরল্যাণ্ড আর ফরাসি পাইলট, নিয়ে গেল উপত্যকায়। ট্রেইলারটা দেখতে পেল রানা, একেবারে টানেল এণ্ট্রান্সের মুখে ওটাকে নামাতে পেরেছে দুই বৈমানিক।

হেলিকপ্টার থেকে নেমেই ক্রু-দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। ট্রেইলারটা নিয়ে যাওয়া হলো টানেলের ভিতর, একেবারে পানির কিনারায়। চাকার পিছনে গোঁজ আটকানো হলো, ট্রেইলার যেন গড়িয়ে পানিতে পড়ে না যায়। ওদেরকে নামিয়ে দিয়েই প্ল্যান্ট সুপারভাইজার থিয়োখিকে নিয়ে এসেছে মুরল্যাণ্ড। অভিযান শুরু করার আগে তার সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনায় বসল রানা।

নতুন কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে এসেছে থিয়োখি। চ্যাপ্টা

একটা পাথরের উপর বিছিয়ে রাখল ওগুলো। বলল, 'লুক অ্যাট দিজ, মসিয়ে। রানা। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, টানেলের এ-প্রান্তের কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। কেভ-ইন ঠেকানোর জন্য অ্যালুমিনিয়ামের সাপোর্ট কলাম বসানো হয়েছে ভিতরে। সাবমারসিবল নিয়ে ঢুকতে হলে ওগুলো কেটে ঢুকতে হবে আপনাকে।'

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কতগুলো কলাম? কোথায়?'

'টানেল এণ্ট্রান্স থেকে আড়াইশো গজ দূরে। পাশাপাশি তিনটে করে মোট বারোটা সারি।'

'কলামগুলোর মধ্যে ফাঁক কতটুকু?'

'সিমেট্রিক্যালভাবে বসানো হয়েছে কলামগুলো, প্রতিটার সঙ্গে প্রতিটার দূরত্ব দশ ফুট।'

'আমাদের সাবমারসিবল মাত্র আটফুট চওড়া। কলামগুলোর মাঝ দিয়ে চলে যেতে পারব।'

'তা হলে মাত্র দু'ফুট সিকিউরিটি মার্জিন থাকছে আপনাদের। একটু এদিক-সেদিক হলেই কলামের সঙ্গে বাড়ি খাবেন।'

মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কী মনে হয় তোমার?'

'ওভাবে যাওয়া রিস্কি,' স্বীকার করল মুরল্যাণ্ড। 'কলাম কেটে এগোতে পারি না? আমাদের সঙ্গে আণ্ডারওঅটর কাটিং টর্চ আছে, প্রতি সারিতে একটা কলাম কাটলেই ডাবল জায়গা পাবো প্যাসেজের জন্য।'

থিয়োখির দিকে ফিরল আবার রানা। 'সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকাল প্ল্যান্ট সুপারভাইজর। 'হ্যাঁ, তবে এক লাইনে সবগুলো কলাম কাটতে পারবেন না। তা হলে ছাতের স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। আঁকাবাঁকা রেখায় কাটতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে এগোতেও হবে আঁকাবাঁকা পথে,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'মনে হচ্ছে সাবমারসিবল নিয়ে খেলা দেখাতে হবে, দোস্ত।'

'কে দেখাবে?' ভুরু নাচাল রানা। 'তুমি, না আমি?'

'ট্রান্সপোর্টেশনের দায়িত্বটা এতক্ষণ আমিই সামলেছি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এবারও নাহয় সামলাই। জলকেলিতে তুমিই যাও।'

'কিন্তু জলপরীকে চালানোর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা শুধু আমার আছে।'

'আর আমার আছে ওটাকে বানানোর অভিজ্ঞতা। ওটার প্রতিটা নাটবল্টু চেনা আছে আমার। কাজেই আমার কাছে তুমি নস্যি।'

কথাটা সত্যি। জলপরীকে তৈরির প্রজেক্টে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল মুরল্যাণ্ড। তাই আর আপত্তি করল না রানা। বলল, 'বেশ, তা হলে কলাম কাটার দায়িত্ব আমার কাঁধে থাকছে। চলো কাজে নেমে পড়ি।'

সাবমারসিবলের কেবিনেট থেকে একটা ইনসুলেটেড ওয়ান-পিস ড্রাই সুট বের করে আনল মুরল্যাণ্ড, জিনিসটা চরম শীতল পানির ডুবুরিদের জন্য উপযোগী। রানাকে ওটা পরতে সাহায্য করল সে।

পাশে দাঁড়িয়ে থিয়োখি ইতস্তত করে বলল, 'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনারা। টানেলটা এমনিতেই স্টেবল নয়, তার ওপর এখন পানিতে ভরে আছে। ফ্লাডিঙের ফলে কাঠামোর কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা বোঝার উপায় নেই।'

'রিল্যাক্স, মসিয়ো,' বলল রানা। 'আমরা খুব সাবধানে এগোব।'

'যাদের জন্য এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন, তারা হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে।'

'আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল থিয়োখি। তারপর বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওই ভদ্রমহিলাকে খুব ভালবাসেন। নইলে এমন ঝুঁকি...'

'সব মানুষকেই আমি ভালবাসি, মসিয়ো থিয়োখি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ভিতরে আমার বান্ধবী না থাকলেও আমাকে এখানেই পেতেন।'

ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো প্ল্যান্ট সুপারভাইজর। আর কিছু না বলে এক পা পিছিয়ে গেল সে।

ড্রাই-সুট পরা শেষ হয়েছে রানার। এবার মাথায় পরল একটা হেলমেট, ওটার ভিতরে আণ্ডারওঅটর অ্যাকুস্টিক ট্রানসিভার বসানো আছে। ওকে এয়ার-ট্যাঙ্ক আর ওয়েট-বেল্ট পরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, তারপর সাহায্য করল জলপরীর পিঠে চড়ে বসতে। এরপর সাবমারসিবলের স্বচ্ছ ককপিটে ঢুকে পড়ল সে।

'রেডিও চেক।' হেলমেটের ট্রানসিভারে মুরল্যাণ্ডের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'হাউ ডু ইউ রিড মি?'

'লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে আমার পাশেই বসে আছ তুমি।'

'শুনে খুশি হলাম। ঠাণ্ডা পানিতে নাকানি-চোবানি খাবার সময় নিজেকে আর নিঃসঙ্গ মনে হবে না তোমার।'

'ফাজলামি রেখে এগোতে শুরু করো, ববি,' সিরিয়াস হলো রানা। 'হাতে সময় নেই।'

'আই, আই, ক্যাপ্টেন!' নাবিকদের সুরে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড, তারপর আঙুল তুলে সঙ্কেত দিল ক্রু-দেরকে।

সমস্ত বাঁধন খুলে দেয়া হলো, পিছলে ট্রেইলার থেকে বেরিয়ে এল জলপরী, ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে। সেফটি লাইন দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে রানা, নইলে ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যেত সাবমারসিবলের পিঠ থেকে।

'তুমি ঠিক আছ, রানা?' রেডিওতে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ। এগোও।'

থ্রাস্টার চালু করল মুরল্যাণ্ড, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল জলপরী। ব্যালাস্ট অপারেট করে একই সঙ্গে ওটাকে পানির নীচে নিয়ে যাচ্ছে সে। ড্রাই সুট পরে থাকার পরও সারা শরীর কেঁপে উঠল রানার, পানি অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডা। পোশাকের ইনসুলেটেড প্রলেপ ভেদ করে হামলা চালাচ্ছে গায়ের চামড়ায়।

কিছুদূর যেতেই নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। জলপরীর সামনে লাগানো হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বালল মুরল্যাণ্ড। আলোকিত হয়ে উঠল সামনেটা, তবে খুব বেশি নয়। আলোর স্পর্শ পেয়ে পানির রঙ যেন বদলে গেল। পরিবেশটা অদ্ভুত।

'মনে হচ্ছে যেন বালতি-ভর্তি চকলেট সিরাপে ডাইভ দিচ্ছি,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'আমি আরেকটু কাব্যিক ঢঙে চিন্তা করছি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'নরক অভিমুখে যাত্রা... শুনতে কেমন লাগছে?'

'বেমানান। নরক তো আগুন আর তাপে ভরা। এখানে ঠিক উল্টো পরিবেশ বিরাজ করছে। যাক গে, চোখ-কান খোলা রাখো। কলামগুলো দেখতে পেলে জানিয়ো।'

একটু উঁচু হয়ে ককপিটের উপর দিয়ে উঁকি দিল রানা। প্রায়ান্ধকার টানেলে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। আবছায়া পরিবেশটা চোখে সয়ে আসতেই দূরে ধাতব কাঠামো ভেসে উঠল।

ককপিটের গায়ে টোকা দিল রানা। 'স্লো ডাউন, ববি। প্রথম সারিটা দেখতে পাচ্ছি।'

গতি কমাল মুরল্যাণ্ড। ধীরে ধীরে কলামের সারির কয়েক গজ দূরে পৌঁছে থামিয়ে ফেলল জলপরীকে। কাটিং টর্চ আর এয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেল রানা। কাটতে শুরু করল

মাঝখানের কলাম। বেশি সময় লাগল না, কাটিং টর্চের প্রচণ্ড উত্তাপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ধাতব দণ্ডটা। উল্টো ঘুরে মুরল্যাণ্ডকে এগোতে ইশারা করল রানা। এয়ারপোর্ট ওয়ার্কার যেভাবে বিমানকে গাইড করে, ঠিক সেভাবে জলপরীকে গাইড করল ও। পার করে নিয়ে এল প্রথম সারিটা। এরপর দ্বিতীয় সারির ডানের কলাম কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করে চলল ওরা, কোনও বিপত্তি ঘটল না। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কলামের বারোটা সারি পেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো জলপরী। সাবমারসিবলের পিঠে আবার উঠে পড়ল রানা, টানেলের গভীরে কোর্স সেট করল মুরল্যাণ্ড। থ্রাস্টার গর্জে উঠল, ছুটে চলল সাবমারসিবল।

খুব শীঘ্রি লুনার দেখা পাবে, ভাবল রানা। কিন্তু ওকে জীবিত পাবে, না মৃত?

দশ

স্বপ্ন দেখছে লুনা—রানার সঙ্গে প্যারিসের এক নামকরা রেস্টুরেন্টে ডিনার করছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আইফেল টাওয়ার। তার পিছনে মস্ত থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ ভেসে আছে আকাশে। চমৎকার পরিবেশ, কিন্তু হঠাৎ বেরসিকের মত রানা বলে উঠল, 'জেগে ওঠো, লুনা!'

'জেগে ওঠো মানে? আমি কি ঘুমাচ্ছি নাকি?' বলতে চাইল

লুনা, কিন্তু পারল না।

'জাগো, লুনা!' আবার বলল রানা।

পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? এভাবে বিরক্ত করছে কেন ওকে?

হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল রানা, হাত বাড়িয়ে চাপড় দিতে শুরু করল ওর গালে। 'লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠো বলছি!'

'থামো!' রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠল লুনা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঘুমটা।

'দ্যাটস্ বেটার।' কানের কাছে শোনা গেল রানার কণ্ঠ। স্বপ্নে নয়, বাস্তবে।

চোখ খুলল লুনা, দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল টর্চের আলোয়। সেটা সয়ে আসতেই রানার ভেজা মুখ দেখতে পেল সামনে, ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে। দু'চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। দৃষ্টিবিভ্রম? প্লাস্টিকের একটা স্কুবা রেগুলেটর গুঁজে দিল রানা ওর মুখে। পরমুহূর্তে ফুসফুসে তাজা বাতাসের স্পর্শ পেল লুনা। কেটে যেতে শুরু করল ঘোর ঘোর ভাবটা। এতক্ষণে বুঝতে পারল, চোখের ভুল নয়, সত্যিই রানা হাঁটু গেড়ে বসে আছে ওর পাশে। গায়ে একটা কমলা রঙের ডুবুরির পোশাক, মাথা থেকে হেলমেট খুলে নামিয়ে রেখেছে মেঝেতে।

'একটু জেগে থাকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বিস্ময়ে বাকশক্তি হারিয়েছে লুনা, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, মাথা ঝাঁকাল শুধু।

'ঘুমিয়ে পোড়ো না,' বলল রানা। 'আমি এখুনি আসছি।'

ওকে ফ্ল্যাশলাইট হাতে একটা গর্তে নেমে যেতে দেখল লুনা, কানে ভেসে এল পানির ছলাৎছল। গর্তের বাইরে একটা আণ্ডারওঅটর কাটিং টর্চ আর এয়ারট্যাঙ্ক দেখল ও, রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অবজারভেটরির মেঝে ফুটো

করে রিসার্চ টানেল থেকে উঠে এসেছে রানা। কিন্তু রিসার্চ টানেল পর্যন্তই বা পৌঁছুল কী করে?

চারপাশে নজর বোলাল লুনা। ওর সঙ্গীসাথীরাও রানাকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মেঝের গর্তের দিকে।

একটু পরেই আবার উঠে এল রানা। হাতে একটা দড়ি ধরে রেখেছে। গর্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে টানতে শুরু করল ওটা। দড়িতে বাঁধা প্লাস্টিক ব্যাগগুলো উঠে আসছে একে একে। সবগুলো তোলা হলে ভিতর থেকে স্কুবা গিয়ার বের করে নিল ও। অবজারভেটরির সবার মধ্যে এয়ার ট্যাঙ্ক আর রেগুলেটর বিতরণ করল। একটু পরেই দেখা গেল, সুস্থ হয়ে উঠছে মানুষগুলো।

সংবিৎ ফিরে পেয়েছে লুনা। মুখ থেকে রেগুলেটর সরিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, 'রানা... তুমি এখানে? কীভাবে?'

ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। হাসিমুখে বলল, 'ভেবেছ, সামান্য পানি আমাদের ডিনার-ডেটের পথে বাধা হতে পারবে?'

'ধ্যাত্! হেঁয়ালি কোরো না তো!'

'গল্প করার সময় নেই,' বলল রানা। 'এয়ার ট্যাঙ্কে বাতাসের পরিমাণ সীমিত। এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো থেকে ড্রাইসুট আর হেলমেট বের করল দু'জনে, সবাইকে দিল এক সেট করে। ডাইভিং জানে ক্যাসিডি আর কলিন্স, ওদের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলো না, বরং বাকিদেরকে স্কুবা গিয়ারে সজ্জিত হতে সাহায্য করল।

দলটা রেডি হতেই ছোট্ট একটা ভাষণ দিল রানা, বুঝিয়ে দিল কী করতে চাইছে।

'নীচে একটা সাবমারসিবল আছে,' বলল ও। 'আপনারা

সবাই ওটার শরীর আঁকড়ে ঝুলে থাকবেন, আর কিছু না। সাবমারসিবল আপনাদেরকে টানেলের বাইরে নিয়ে যাবে। একটাই পরামর্শ আমার—ভয় পাবেন না, উত্তেজিত হবেন না। এয়ার-ট্যাঙ্ক থেকে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেবেন। কারও কোনও সমস্যা হলে আমাকে হাত তুলে সঙ্কেত দেবেন, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'গুড, তা হলে ফলো করুন আমাকে।'

রানার পিছু নিয়ে সবার আগে নামল লেগ্রাঁ। একটা হাত অকেজো তার। সাবমারসিবলের ককপিটে একটা সিট খালি আছে, ওখানে বসাতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। কিন্তু পানির নীচে হ্যাচ খোলা যাবে না, জলপরীকে ভাসিয়ে তোলার মত কোনও জায়গাও নেই। অগত্যা সাবমারসিবলের পিঠে তাকে সেফটি লাইন দিয়ে বেঁধে রাখল রানা। খালি হয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের ব্যাগগুলোয় যার যার দরকারি জিনিসপত্র... যেমন, ক্যামেরা, নোটবুক, ইত্যাদি নিয়ে বাকিরা নামতে শুরু করল এরপর। জলপরীর গায়ে একটা ফিশিং নেট আটকে নিয়েছে রানা, সেটা ধরে ঝুলে পড়ল ওরা।

লুনার পাশে গিয়ে পজিশন নিল রানা। শরীরে একটা ব্যাগ বেঁধে তাতে প্রাচীন শিরোস্ত্রাণটা নিয়েছে তরুণী আর্কিয়োলজিস্ট। ব্যাপারটা জানা নেই রানার, ব্যাগের বেঢপ আকৃতি দেখে ভুরু কোঁচকাল একটু। তারপর রেডিওতে মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'আমরা রেডি, ববি।'

মাথা ঘুরিয়ে যাত্রীদের অবস্থা দেখে নিল মুরল্যাণ্ড। বলল, 'জলপরীকে তো জল-গাধা বানিয়ে ফেলেছ, হে! পিঠভর্তি মাল!'

'ববি!' শাসন করার সুরে বলল রানা। 'মুভ!'

থ্রাস্টার গর্জন করে উঠল, ধীরে ধীরে ফিরতি পথে এগোতে শুরু করল সাবমারসিবল। বাড়তি ওজনের কারণে গতি কমে

গেছে, তবে দক্ষ হাতে কোর্স ধরে রাখল মুরল্যাণ্ড। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেল রানা, ওর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সবাই। নড়ছে না, ফিশিং নেট আঁকড়ে ধরে রেখেছে স্থির হাতে।

সময় যেন কাটছেই না। যেন যুগ-যুগান্ত পর মুরল্যাণ্ডের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'কলামগুলো দেখতে পাচ্ছি, দোস্ত!'

'থামো,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে গাইড করে নিয়ে যাবো।'

থ্রাস্টার বন্ধ করে দিল মুরল্যাণ্ড। সাঁতার কেটে জলপরীর সামনে চলে গেল রানা। ত্রিশ ফুট দূরে সাপোর্ট কলামের সারি দেখতে পাচ্ছে। প্রথম সারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাকে দেখাচ্ছে বিকট এক গহ্বরের মত। ওখান দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, তারপর উল্টো ঘুরে মুরল্যাণ্ডকে এগোবার সঙ্কেত দিল।

প্রথম সারিটা সহজেই পেরিয়ে এল জলপরী। দ্বিতীয় ফাঁকাটা বামে, ওদিকে ঘুরতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দিল। বাড়তি ওজনের কারণে নিয়ন্ত্রণ ঠিক রইল না মুরল্যাণ্ডের, একদিকে ভেসে যেতে শুরু করল সাবমারসিবল। ল্যাটারাল থ্রাস্টারের সাহায্যে স্লাইডিং থামাল সে। কিন্তু সামনে এগোতে গিয়ে ঘষা লাগিয়ে দিল একটা অক্ষত কলামের গায়ে। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ উঠল, আঁতকে উঠল রানা।

কপাল ভাল বলতে হবে, জলপরীকে ব্রেক কষার মত থামিয়ে ফেলা যায়। শব্দ শুনেই স্থির হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড, কলামটা ভেঙে পড়ার আগেই। সাঁতার কেটে সাবমারসিবলের পাশে চলে গেল রানা, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে আনল কলামের শরীর থেকে।

'তোমার ড্রাইভিং স্কিলের দেখি অনেক অবনতি হয়েছে,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'সরি, দোস্ত। বাড়তি ওজনের কারণে ট্রাকের মত আচরণ করছে জলপরী। নড়তে-চড়তে অনেক সময় নিচ্ছে।'

'ওকে রেসিং কার না ভাবলেই হয়!'

'শিক্ষা হয়ে গেছে। আর ভুল হবে না। তুমি দেখে নিয়ো।'

যাত্রীদের দিকে এগিয়ে গেল রানা, তাদেরকে ইশারায় শান্ত থাকতে বলল। তারপর চলে গেল সাবমারসিবলের সামনে। সঙ্কেত দিল মুরল্যাণ্ডের উদ্দেশে। এবার আর গোলমাল হলো না, জলপরীকে দ্বিতীয় সারি পার করে আনল মুরল্যাণ্ড, পর পর পেরিয়ে এল আরও সাতটা সারি।

স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করল রানা। আর মাত্র তিনটে সারি পেরুলেই মুক্তি। কিন্তু পরের কলামগুলোর দিকে তাকাতেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল ওর।

মাঝখানের কলামটা কেটে ওখান দিয়ে এসেছিল ওরা, এখন বাকি দুটো কলাম ধনুকের মত বেঁকে গেছে। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। সেদিকে মাথা ঘোরাতেই বুদবুদ দেখতে পেল—ছাতে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। ওখানে বুদবুদের সারি।

'ববি, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' কণ্ঠ যতটা পারে স্বাভাবিক রেখে বলল ও।

'দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কলামগুলো তো পোলিও রোগীর পা হয়ে গেছে, রানা! কীভাবে এই মৃত্যুফাঁদ এড়াব, বলতে পারো?'

'ঠিক যেভাবে দুই সজারু প্রেম করে—সাবধানে! আমাকে ফলো করো।'

সাঁতার কেটে সারিটা পেরিয়ে গেল রানা। উল্টো ঘুরে ইশারা দিতে শুরু করল। খুব ধীরগতিতে এগোল মুরল্যাণ্ড, ছাতের দুর্বল অংশটা পেরিয়ে এল হিসেবি ভঙ্গিতে। কিন্তু বিপদ দেখা

দিল অন্যদিক থেকে। ফিশনেটের একটা প্রান্ত জলপরীর পিছনে ঝুলছিল, হঠাৎ ওটা কাটা কলামের খুঁটির মত অংশে আটকে গেল, থামিয়ে দিল অগ্রযাত্রা। উত্তেজনা, কিংবা নার্ভাসনেস... যে কারণেই হোক, মুরল্যাণ্ড আগুপিছু ভাবল না। থ্রাস্টারের পাওয়ার বাড়িয়ে মুক্ত করে নিতে চাইল জলপরীকে। ফলাফল হলো ভয়াবহ।

টান খেয়ে নেটের সুতো ছিঁড়ে গেল আচমকা। আর ছাড়া পেয়েই জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে গেল সাবমারসিবল, মুরল্যাণ্ড কিছু করার আগেই সোজা গিয়ে আঘাত করল পরের সারির কলামে। রানা চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ ঘটে গেছে। বিশ্রী শব্দ তুলে কাত হয়ে পড়ে গেল কলামটা। হুড়মুড় করে ধসে পড়তে শুরু করল ছাত। রানার সামনেটা তুষারকণায় ঘোলা হয়ে গেল।

'শিট!' রেডিওতে গাল দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, সরে যাও! খেপা ষাঁড় হতে যাচ্ছি আমি।'

ও কী করতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। প্রতিবাদ করল না, জানে—এটাই একমাত্র উপায়। হাত-পা ছুঁড়ে একপাশে সরে গেল, রেডিওতে চেঁচাল, 'গো, ববি... গো!'

লিভার ঠেলে থ্রাস্টারে ফুল পাওয়ার দিল মুরল্যাণ্ড, এক্সপ্রেস ট্রেনের মত সামনে বাড়ল জলপরী। রানার মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল ধাতব দেহটা। নিখুঁত টাইমিঙে ফিশনেট আঁকড়ে ধরল ও, সিনেমার কাউবয় যেভাবে চলন্ত ঘোড়ায় চড়ে বসে, সেভাবে সাবমারসিবলের গায়ে সেঁটে গেল।

শেষ সারির কলামে তুমুল গতিতে আঘাত হানল জলপরী, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল খোলা পানিতে। পিছনে গগনবিদারী আওয়াজ তুলে ধসে পড়ল টানেলের ছাত। উপর দিকে তাকাতেই রানার বুক খামচে ধরল কী যেন। ওর বিস্ফারিত

চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য ফাটলের। পুরো টানেলই ধসে পড়তে যাচ্ছে এবার।

মুরল্যাণ্ড গতি কমাতে শুরু করেছিল, থেমে গেল রানার চিৎকারে।

'না, ববি, স্পিড কমিয়ো না! পুরো ছাতটাই ভেঙে পড়ছে!'

'ঠিক হ্যায়।' দাঁতে দাঁত পিষে থ্রাস্টার-লিভার ঠেলে ধরল মুরল্যাণ্ড। টানেল-ধসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল জলপরী। পিছনে ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে, সাবমারসিবলের উপর পড়তে শুরু করেছে বরফের ছোট ছোট খণ্ড। বড় চাঁই আছড়ে পড়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

হাল ছাড়ল না মুরল্যাণ্ড, লিভার চেপে এগিয়ে নিয়ে চলল জলযানটাকে। একশ' গজের মত যেতেই ছাতের ফাটলগুলোকে পেরিয়ে এল ওরা, বরফের ধসকে ফেলে দিল পিছনে। রুদ্ধশ্বাস আরও কয়েকটা মিনিট পেরুনোর পর কমে গেল বুক-কাঁপানো গর্জন। জলপরীর ইঞ্জিন ততক্ষণে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। থ্রাস্টার বন্ধ করে দিল মুরল্যাণ্ড, কিন্তু ওদের গতি রুদ্ধ হলো না। ধসের কারণে ছলকে উঠেছে পানি, ঠেলে নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

টানেলের মুখ দিয়ে কামানের গোলার মত ছিটকে বেরুল পানির ধারা, সেইসঙ্গে জলপরী। ফিশনেট থেকে হাত ছুটে গেল আরোহীদের, গাছপাকা ফলের মত ঝরে পড়ল সবাই... লেগ্রাঁ বাদে। পাহাড়ি ঢালে আছড়ে পড়ল জলপরী, ড্রপ খেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। ফাটল দেখা দিল ককপিটের অ্যাক্রিলিক আচ্ছাদনে, ডানপাশ থেঁতলে গেল। লেগ্রাঁর সৌভাগ্য, একটুর জন্য চ্যাপ্টা হয়ে যায়নি সে।

ঢাল বেয়ে পানির ধারা সরে যেতেই ছুটে এল স্টারফিশের ক্রু-রা। পানির আওয়াজ শুনেই টানেলের মুখ থেকে সরে

গিয়েছিল ওরা, কেউ আহত হয়নি। জলপরীর আরোহীদের সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে।

হ্যাচ খুলে মুরল্যাণ্ডও বেরিয়ে এসেছে। কপালের একটা পাশ কেটে রক্ত ঝরছে তার, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। চঞ্চল চোখে প্রিয় বন্ধুকে খুঁজে বের করল। রানা তখন একটা পাথরের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। হেলমেটটা খুলে পড়ে গেছে মাথা থেকে, কমলা রঙের ড্রাইসুট ছিঁড়ে গেছে এখানে-সেখানে।

ছুটে গিয়ে রানাকে চিৎ করল মুরল্যাণ্ড। চাপড় দিতে শুরু করল গালে। 'রানা! চোখ খোলো! রানা!!'

কয়েক মুহূর্ত সাড়া পাওয়া গেল না, তারপরই কেশে উঠল রানা। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল একরাশ পানি। ধীরে ধীরে চোখ খুলল ও। মলিন হাসি হেসে বলল, 'কী... বলেছিলাম না, তোমার ড্রাইভিঙের অনেক অবনতি ঘটেছে?'

একঘণ্টা পর ফ্রেঞ্চ রেসকিউ পার্টি পৌঁছুল অকুস্থলে, সঙ্গে মেডিক্যাল টিম। উদ্ধারকৃতদের নিয়ে যাওয়া হলো পাওয়ার প্ল্যান্টের পোর্টাল বিল্ডিঙে; শুকনো কাপড়, কম্বল আর প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সামান্য কেটে-ছড়ে যাওয়া, কিংবা হাত-পা মচকানো ছাড়া বড় ধরনের আঘাত পায়নি কেউ। সুস্থ আছে সবাই। ফলে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সামান্য বিশ্রামের পর উদ্ধারকৃতরা জমায়েত হতে পারল প্ল্যান্টের রিক্রিয়েশন রুমে—ঘটনার বিবরণ শোনানোর জন্য।

ব্র্যাণ্ডি পরিবেশন করা হলো সমাবেশের মধ্যে। উঠে দাঁড়িয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন ড. দ্যুবোয়া, প্রশংসা করলেন ওদের সাহসিকতার।

'দয়া করে থামুন, ডক্টর,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'এত প্রশংসা করবেন না, দেখবেন ভাসতে শুরু করেছি, মাটিতে আর পা

পড়ছে না।'

হেসে উঠল সবাই।

'এসব ফর্মালিটি বাদ দিন,' রানা সুর মেলাল। 'তার চেয়ে আপনাদের গল্প শোনান। কী ঘটেছিল, সেটা জানতে চাই আমরা।'

ভাগাভাগি করে উদ্ধারকৃতরা তাদের অভিজ্ঞতা শোনাল। সাংবাদিকরা তাদের অডিও আর ভিডিও টেপ প্লে করে দেখাল। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হলো না। অডিও টেপে শুধু কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, আলোকস্বল্পতার জন্য ভিডিওতে অচেনা দুষ্কৃতকারীর চেহারা পরিষ্কার ধরা পড়েনি। একটা ব্যাপারে খালি নিশ্চিত হওয়া গেল—দুর্ঘটনার জন্য বিশালদেহী লোকটিই দায়ী। স্ট্রংবক্স নিয়ে পালাবার সময় কেউ যেন তার পিছু নিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে টানেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে, রিসার্চ টানেল আর ওঅটর টানেলের মাঝখানের অ্যাকসেস ডোর ভেঙে দিয়েছে, ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে তার কৃতকর্মের সাক্ষীদেরকে। ইতিমধ্যে ফ্লোটপ্লেনের পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সে জানিয়েছে—পিস্তল দেখিয়ে ওকে টেকঅফ করতে বাধ্য করেছে বিশালদেহী লোকটা। প্যারিসের নিকটবর্তী একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে তাকে নামিয়ে দিয়েছে সে। তারপর লোকটা কোথায় গেছে, তা জানে না।

'কেসটা পুলিশের,' আলোচনা শেষে বলল ডুরাণ্ট। 'যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানাবার ব্যবস্থা করছি, ওরা অ্যাকশন নেবে। আশা করি খুব শীঘ্রি ধরা পড়বে লোকটা।'

কেন যেন রানার মনে হলো, পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় থাকাতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ণ ওর, চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়াই অনেক কিছু বুঝতে পারে। মন বলছে, এই রহস্যের জড় অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে। সহজে তার

সমাধান মিলবে না।

জটলা ভেঙে গেছে। ডুরান্ট এখুনি প্যারিসে ফিরে যাবে শুনে লেগ্রাঁ তার সঙ্গী হতে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন আঙুল ভাঙেনি, পুরো হাতটাই কাটা পড়েছে। হাসপাতালে না গেলে মারা যাবে। রিপোর্টাররাও চলে যেতে চাইছে। গরম খবর রয়েছে তাদের হাতে, যত দ্রুত পারে, নিজ নিজ পত্রিকায় গিয়ে ছাপতে চায় ডরমেয়ার লেকের রহস্যময় ঘটনাপ্রবাহ।

ডুরান্ট আর রেসকিউ টিমের দুই হেলিকপ্টারে ভাগাভাগি করে তুলে দেয়া হলো বিদায়ী মানুষগুলোকে। হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানাল বাকিরা।

'লেগ্রাঁর কাণ্ড দেখেছ?' হেলিকপ্টারদুটো দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে বলে উঠল লুনা। 'ভাঙা হাতের অজুহাত দিয়ে কী সুন্দর পালিয়ে গেল?'

'পালিয়েছে ভাবছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানে থাকলে আমি ওর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতাম।'

'তা হলে তো ভালই করেছে,' হাসল রানা। 'কেন, লোকটা তোমার হাত ফসকে গেল বলে দুঃখ হচ্ছে?'

'মাথা খারাপ! গেছে ভালই হয়েছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।'

লুনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে থিয়োখি। চেহারা দেখে মনে হলো, উত্তেজনাকর ঘটনার ইতি ঘটায় মনে বড্ডো কষ্ট পাচ্ছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ইয়ে... মসিয়ো রানা, আমাকে কাজে ফিরে যেতে হবে। আপনাদের ধন্যবাদ—এখানকার একঘেয়ে জীবনে কিছুটা সময়ের জন্য উত্তেজনা এনে দিয়েছেন বলে।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে তার সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'ধন্যবাদ তো আমি দেব। আপনার সাহায্য না পেলে উদ্ধার-অভিযানটা

কিছুতেই সফল হতো না।'

'কী যে বলেন...'

'আই মিন ইট! আর... আপনার একঘেয়েমি দূর হয়ে যাবে খুব শীঘ্রি। ঘটনাটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন, এখানে পুলিশ আর সাংবাদিকের মিছিল শুরু হয়ে যাবে।'

'তা হলে তো ভালই। ভাল থাকুন, মসিয়ো রানা। আশা করি আবার দেখা হবে। জাহাজে ফিরবেন তো এখন? আমি আপনাদেরকে লেকের পাড়ে পৌঁছুনোর জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হাত মিলিয়ে চলে গেল থিয়োখি, তার পিছু নিল লুনা। প্ল্যান্টের বিল্ডিঙে ওর ব্যাগ ফেলে এসেছে, সেটা আনতে যাচ্ছে। হাত মিলিয়ে, আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজ্ঞানীরাও বিদায় নিলেন রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে। অবজারভেটরি আর লিভিং কোয়ার্টার পানিতে তলিয়ে গেছে, আপাতত পাওয়ার প্ল্যান্টেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওঁদের।

'চমৎকার সময় কাটল, দোস্ত,' আড়মোড়া ভেঙে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আর কোনও কাজ আছে? নইলে আমি...'

'কেটে পড়তে চাইছ?' ভুরু নাচাল রানা। 'নিশ্চয়ই চামোয়াঁ মাউন্টেইনে তোমার ওই ফরাসি ফুলের কাছে ফিরে যাবে?'

লুনার দিকে চোখের ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'ফরাসি ফুল আমি একাই শুঁকছি না।'

'আমি অনেক পিছিয়ে আছি, বন্ধু,' বলল রানা। 'প্রথম ডেটিঙেই বেরুইনি এখনও আমরা।'

'তা হলে তো কাবাবের হাড্ডি হওয়া উচিত হবে না আমার। অনুমতি দাও, আমি আমার ফুলের কাছে ফিরে যাই; আর তুমি তোমার।'

হেসে ফেলল রানা। 'যাও, ভাগো!'

এগারো

কেইপ কড, ম্যাসাচুসেটস্‌, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ড. আসিফ রেজা ও তার স্ত্রী তানিয়া রেজাকে দেখে মোটেই বিজ্ঞানী বলে মনে হয় না। অবশ্য দুর্বল দেহ, গম্ভীর চেহারা, ভারিক্কি কথাবার্তা, গোমড়ামুখো এবং অত্যন্ত পুরু লেন্সের ভারি চশমা পরা হতেই হবে বিজ্ঞানীকে, অমন ধারণা অনেকদিন আগেই পাল্টে গেছে।

আসিফ ও তানিয়া দুজনেই সুদর্শন। বয়েস সবে তিরিশে পড়েছে। দুজনেরই মাথায় কালো চুলের গোছা। আসিফের লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। ওদিকে স্বামীর চেয়ে অনেক ছোট তানিয়ার চুল, পুরুষালি কায়দায় ছোট করে ছাঁটা। চুল ছোটই হোক কিংবা বড়, দেখে মনে হয় আঁচড়ানোর সময় করে উঠতে পারে না কেউই। লাইব্রেরিতে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার চাইতে বাইরে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কই বেশি পছন্দ ওদের।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেরিন সায়েন্সের সঙ্গে জড়িত—আসিফ একজন ডিপ-ওশন জিয়োলজিস্ট, তানিয়া পেশায় মেরিন বায়োলজিস্ট। বর্তমানে ওরা তিন বছরের চুক্তিতে ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, মানে নুমা-য় কাজ করছে। মস্ত সুযোগ, আর সেটার জন্য মাসুদ রানার কাছে কৃতজ্ঞ ওরা। রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আসিফ রেজা, নিজ নিজ ফিল্ডে

রেজা-দম্পতি কতটা দক্ষ, তা খুব ভাল করেই জানে সে। মেধার জোরেই আমেরিকায় স্কলারশিপ পেয়েছিল ওরা, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে বিখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ফিল্ড রিসার্চের জন্য ভাল প্রতিষ্ঠান খুঁজে বেড়াচ্ছিল দুজনে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলে নুমা-য় কাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে রানা।

এ-মুহূর্তে অবশ্য কাজ করছে না আসিফ-তানিয়া, ছুটি কাটাচ্ছে কেইপ কডের ছোট্ট গ্রাম *উডস্ হোল*-এ। সাগরতীরে চমৎকার এক জায়গা, তবে শুধু এ-কারণেই আসেনি, এসেছে মনের টানে। এই উডস্ হোলেই প্রথম পরিচয় হয় দুজনের, এখানেই পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল ওরা। বিখ্যাত এক ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট আছে গ্রামটাতে, আর আছে একটি মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরি। কাকতাল, কিংবা নিয়তি... যা-ই হোক না কেন, ছাত্রাবস্থায় ফিল্ড ট্যুরে দুজনে একই সময়ে উপস্থিত হয়েছিল এখানে, দেখা পেয়েছিল পরস্পরের। বাকিটা রূপকথার মত। সেই থেকে উডস্ হোল ওদের খুব পছন্দের এক জায়গা, ছুটিছাটায় প্রায়ই চলে আসে। গ্রামটা ছোট, অধিবাসীর সংখ্যা কম। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে আসিফ-তানিয়ার, স্থানীয় লোকজন ওদেরকে গ্রামেরই সদস্য বলে মনে করে।

সময়টা বিকেল। ওঅটর স্ট্রিট ধরে হাঁটছে স্বামী-স্ত্রী; একপাশে সমুদ্র, অন্যপাশে নোনা জল আটকে তৈরি হওয়া ছোট্ট এক পুকুর। কাছেই এলিজাবেথ আইল্যাণ্ড, সেদিক থেকে বইছে মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া সূর্যের কোমল আলোয় স্নান করছে প্রকৃতি। মোহনীয় পরিবেশ।

তানিয়ার কানে কানে দুষ্টু কিছু কথা শোনাচ্ছিল আসিফ, এমন সময় বেরসিকের মত বেজে উঠল মোবাইল ফোন। বিরক্ত

হয়ে সেটটা পকেট থেকে বের করল ও, ডিসপ্লে-র দিকে না তাকিয়েই *রিসিভ* বাটন চাপল, তারপর কানে ঠেকিয়ে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'হ্যালো?'

'আসিফ, মাই ডিয়ার! হ্যারি সলোমন বলছি!' ইয়ারপিসে যেন বিস্ফোরিত হলো কণ্ঠটা। 'পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তোমাদের আসার খবর শুনলাম। কেমন আছ?'

অ্যালগালজির রিটায়ার্ড প্রফেসর হ্যারি সলোমন—জলজ উদ্ভিদের উপর দুনিয়ার সেরা বিশেষজ্ঞদের একজন। এখন উডস্ হোলের মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরিতে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার ফলে গলার ভলিউম বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক ডেসিবেল উঁচুতে কথা বলেন।

'ভাল আছি, ড. সলোমন,' বলল আসিফ। 'ফোন করেছেন বলে ধন্যবাদ।'

'ইয়ে... আমি আসলে তোমাকে ফোন করিনি, করেছি তোমার বউকে। ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। আমার চেয়ে ওর চেহারা, আর কণ্ঠ... দুটোই ভাল। কথা বলতে চাইলে দোষ দিতে পারি না।'

স্বামীর বাহুতে চিমটি কাটল তানিয়া, তারপর ফোন নিয়ে ঠেকাল কানে। 'হ্যালো, ড. সলোমন! কেমন আছেন?'

ওপাশ থেকে হড়বড় করে কিছু বললেন সলোমন, মনোযোগ দিয়ে শুনল ও। বলল, 'ঠিক আছে, আমরা এখুনি আসছি।' লাইন কেটে দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। 'আমাদেরকে ওঁর অফিসে যেতে বলছেন সলোমন। ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি।'

'ড. সলোমনের কাছে সবকিছুই জরুরি বলে মনে হয়। তুমি রাজি হলে কেন? ছুটি কাটাতে এসেছি আমরা, কাজ করতে নয়।'

একটা ভুরু উঁচু করল তানিয়া। 'ঘটনা কী? ভদ্রলোক

তোমার বদলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন বলে হিংসে হচ্ছে নাকি?'

'হিংসা নামের অনুভূতিটাই নেই আমার মধ্যে,' আসিফ আহত গলায় বলল। 'তুমি সেটা জানো!'

'সেটার অভাব তো মনে হচ্ছে অভিমান দিয়ে পূরণ করছ,' হাসল তানিয়া। 'চলো, চলো, দেখেই আসি ব্যাপারটা কী।'

'বেশ, চলো।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে গেল স্বামী-স্ত্রী। লবিতেই ওদের অপেক্ষায় বসে আছেন ড. সলোমন। ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। শক্ত-সমর্থ শরীর। চামড়ায়ও বলিরেখা পড়েনি তেমন একটা। মাথার চুলে শুধু পাক ধরেছে। ভারী ফ্রেমের চশমার ওপাশে দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক।

অতিথিদের দেখে এগিয়ে এলেন সলোমন। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মিলিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্কস ফর কামিং। তোমাদের বিকেলটা আবার মাটি করে দিলাম না তো?'

'মোটেই না,' হাসিমুখে বলল তানিয়া। 'আপনার দেখা পাওয়া তো আনন্দের ব্যাপার।'

'তবে যে-কারণে ডেকেছি, তা শোনার পর হয়তো আর আনন্দ পাবে না,' হেঁয়ালির সুরে বললেন সলোমন।

'কী হয়েছে, ডক্টর?' জানতে চাইল আসিফ।

'আমার অফিসে চলো, সব খুলে বলছি।'

সলোমনকে অনুসরণ করল আসিফ-তানিয়া, করিডোর ধরে এগোল। জায়গাটা বিশেষত্বহীন—বিবর্ণ দেয়াল, পুরনো দরজার সারি, মাথার উপর দিয়ে গেছে নানা আকারের পাইপ আর তারের বাণ্ডিল। পুরনো আমলের বিল্ডিঙের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। প্রথম শ্রেণীর সামুদ্রিক গবেষণাগার বলে মোটেই মনে হয় না।

তবে ড. সলোমনের অফিসটা ব্যতিক্রম। শুচিবায়ু আছে তাঁর, এ-কারণে পুরো কামরা ঝকঝকে-তকতকে করে রেখেছেন। কোনও কিছুই এলোমেলো হয়ে পড়ে নেই, সব পরিপাটি। এমনকী তাঁর ডেস্কেও এক টুকরো কাগজ নেই। সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কম্পিউটারের মনিটর, কি-বোর্ড আর মাউস।

চেয়ার টেনে দম্পতিকে বসতে দিলেন তিনি। কফি-মেকার থেকে দু'মগ কফি এনে আপ্যায়ন করলেন, তারপর অবতারণা করলেন প্রসঙ্গের।

'সময় নষ্ট করতে চাই না,' বললেন তিনি। 'কাজের কথায় চলে আসি, কী বলো?'

'আমাদের কোনও আপত্তি নেই,' বলল আসিফ।

'গুড।' তানিয়ার দিকে তাকালেন সলোমন। 'তুমি তো মেরিন বায়োলজিস্ট। *কলারপা ট্যাক্সিফোলিয়া* সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো?'

মাথা ঝাঁকাল তানিয়া। 'হ্যাঁ। ট্রপিকাল পানির শৈবাল। শখের অ্যাকুরিয়ামেও রাখে লোকে।'

'কারেক্ট,' বললেন সলোমন। 'অ্যাকুরিয়ামে যে-প্রজাতিটা রাখা হয়, সেটাকে আমরা বলি কোল্ড ওঅটর স্ট্রেইন—মূল শৈবালের একটা মিউটেশন। সাজানোর বস্তু হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু বেশ কিছু উপকূলীয় এলাকায় ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করেছে ওটা... শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'হুঁ। কিলার সি-উইড বলা হচ্ছে ওটাকে। ভূমধ্যসাগরের একটা বড় অংশের সি-বেড নষ্ট করে দিয়েছে, ছড়িয়ে পড়ছে অন্যত্রও। এই শৈবাল সাধারণত ঠাণ্ডা পানিতে বাঁচতে পারে না, কিন্তু মিউটেটেড স্ট্রেইনটা ওই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। দুনিয়ার যে-কোনও সাগরেই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে ওটার।'

'মিউটেশনটা কি প্রাকৃতিক?' জানতে চাইল আসিফ।

'না, মনুষ্য-নির্মিত,' বলল তানিয়া। 'অ্যাকুরিয়ামের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।'

'তা হলে জিনিসটা সাগরে পৌঁছুল কীভাবে?'

'১৯৮৪ সালে মোনাকোর ওশনোগ্রাফিক মিউজিয়াম থেকে ভুল করে সাগরে ছেড়ে দেয়া হয় ওটা,' বললেন সলোমন। 'তখন অবশ্য *কলারপা*-র ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা জানা ছিল না কারও। সে যা-ই হোক, সেই থেকে ভূমধ্যসাগরের ছ'টা দেশের উপকূলে প্রায় ত্রিশ হাজার হেক্টর সি-বেড দখল করে নিয়েছে এই শৈবাল, অস্ট্রেলিয়া আর স্যান ডিয়েগো উপকূলেও দেখা পাওয়া গেছে ওর। খুব দ্রুত ছড়ায় জিনিসটা, ঘন-বুনোটের কার্পেটের মত ছেয়ে ফেলে সাগরের তলা, ফলে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণী বঞ্চিত হয় সূর্যের আলো আর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থেকে। সামুদ্রিক খাদ্যচক্রে বিঘ্ন ঘটে, আর তার প্রভাব পড়ে পুরো ইকো-সিস্টেমের উপর।'

'ঠেকানো যায় না এই শৈবালকে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'স্যান ডিয়েগোতে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেছে। শৈবালের বিস্তারকে তারপুলিনে ঘিরে ঠেকাতে পেরেছে ওরা, সি-বেডের মাটিতে ক্লোরিন ইনজেক্ট করে উর্বরতা নষ্ট করে দিচ্ছে—গজাতে দিচ্ছে না *কলারপা* কলোনি। কিন্তু বড় ধরনের ইনফেস্টেশনে এ-পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। জড় থেকেই সমস্যা দূর করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাই। অ্যাকুরিয়াম-বিক্রেতা আর ব্যবহারকারীদেরকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে বিশেষ এই শৈবাল ব্যবহার না করার জন্য। কিন্তু এর সুফল পেতে বহু সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের জন্য।'

'সমস্যা ভাবছেন কেন? প্রাকৃতিকভাবে সব মেরিন লাইফেরই ইতি ঘটে। আপনার এই শৈবালেরও ঘটবে। শুধু

দরকার বিস্তার ঠেকানো—পুরনো শৈবাল মরে গেলে যেন নতুন শৈবাল তার জায়গা নিতে না পারে।'

'সমস্যাটা এত সহজ নয়, মাই ডিয়ার আসিফ,' মাথা নাড়লেন সলোমন। '*কলারপা*-র লাইফ-সাইকেল অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। জটিল একটা ডিফেন্স মেকানিজমও আছে এর। পোকামাকড় হামলা করতে পারে না, মাছেরাও এই শৈবাল খায় না। এমনকী শীতকালেও মরে না এই শৈবাল।'

'মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনও দানবের গল্প শুনছি।'

'দানব কী, মহামারী বলতে পারো! এক টুকরো শৈবালই নতুন কলোনির জন্ম দিতে পারে। কপাল ভাল যে, স্রোতের মাধ্যমে রেণু বা বীজ ছড়ানোর ক্ষমতা নেই এর; নইলে পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ আকার ধারণ করত।'

'এই সমস্যার ব্যাপারে আমার জানা আছে, ডক্টর,' তানিয়া বলল। গলায় খানিকটা হতাশা। 'এজন্যেই কি ডেকে এনেছেন আমাদেরকে?'

জবাব না দিয়ে আসিফের কাছে প্রশ্ন রাখলেন সলোমন, 'তুমি তো ওশন-জিয়োলজিস্ট। *গোস্ট সিটি* সম্পর্কে কী জানো?'

আলোচনার প্রবাহ বায়োলজি ছেড়ে ওর ফিল্ডে চলে আসায় খুশি হলো আসিফ। বলল, 'আটলান্টিক ম্যাসিফের একটা বিশেষ এলাকা—অসংখ্য হাইড্রো-থারমাল ভেন্ট আছে ওখানে। হাজার হাজার বছর ধরে ওগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে নানা রকম মিনারেল, বিশাল বিশাল স্তূপের সৃষ্টি হয়েছে—হঠাৎ দেখায় বড় বড় অট্টালিকার মত লাগে। ঠিক যেন একটা পরিত্যক্ত শহর। ঠাট্টার ছলে তাই *গোস্ট সিটি*, বা ভুতুড়ে নগরী বলে ডাকা হয় জায়গাটাকে। খুবই ইন্টারেস্টিং, সময় পেলে ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে আমার।'

'ইচ্ছেটা খুব শীঘ্রিই পূরণ হতে চলেছে,' রহস্যময় কণ্ঠে

বললেন সলোমন।

বিভ্রান্ত হয়ে চাহনি বিনিময় করল আসিফ-তানিয়া। কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

মুচকি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সলোমন। 'আমার সঙ্গে এসো, একটা জিনিস দেখাচ্ছি।' অফিস থেকে ওদেরকে ছোট্ট এক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন তিনি। স্টোরেজ কেবিনেট খুলে একটা কাঁচের পাত্র বের করলেন, ভিতরটা খয়েরি-সবুজ রঙের থিকথিকে এক ধরনের পদার্থে ভরা।

পাত্রের দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল তানিয়া, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। তাই জানতে চাইল, 'কী এটা?'

'জবাব দেবার আগে পেছনের কথা জানিয়ে দিই,' সলোমন বললেন। 'কয়েক মাস আগে উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সঙ্গে যৌথ এক এক্সপিডিশনে অংশ নেয় আমাদের ল্যাব—*গোস্ট সিটি* জরিপ করার জন্য। জায়গাটা নানা ধরনের মাইক্রোব আর কেমিক্যালে ভরপুর। ওগুলো স্টাডি করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।'

'ভাল প্রজেক্ট,' মন্তব্য করল আসিফ। 'ওখানকার উত্তাপ আর কেমিক্যালের কম্বিনেশনকে প্রাণের সূচনাকারী পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়।'

'এনিওয়ে,' বললেন সলোমন, 'ওই এক্সপিডিশনে আমাদের সাবমারসিবল *আলভিন* কিছু শৈবালের স্যাম্পল তুলে আনে। পাত্রের মধ্যে ওগুলোরই মৃত সংস্করণ দেখতে পাচ্ছ তোমরা।'

পাত্রটা আবার ভাল করে দেখল তানিয়া। বলল, '*কলারপা*-র সঙ্গে কিছুটা মিল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার চেনাজানা কোনও প্রজাতির সঙ্গে মেলাতে পারছি না।'

'কারণ এটা *কলারপা*-র একটা নতুন মিউটেশন,' শীতল গলায় বললেন সলোমন। 'আমি এর নাম দিয়েছি—*কলারপা*

গরগনোসা।'

'গরগন-উইড? শুনতে ভালই লাগছে।'

'ভাল লাগাটা উবে যাবে এখুনি। এই মিউটেশন আগেরটার চেয়ে কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর। সেক্সুয়ালি রিপ্রোডাকশন করতে পারে এটা—পানির স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে রেণু, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে পারে নিজের বংশ।'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠল তানিয়া। 'সে তো সাংঘাতিক কথা!'

'পুরোটা শোনো আগে,' তিক্ত গলায় বললেন সলোমন। 'গরগন-উইডের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা কল্পনাতীত। *কলারপা ট্যাক্সিফোলিয়া* নরম কার্পেটের মত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু গরগন-উইড ছড়িয়ে পড়ে শক্ত পাথরের মত! জমাট বেঁধে নিরেট আকৃতি নেয় গরগন-উইডের কলোনি, ওখানে কোনও প্রাণ টিকতে পারে না। *ট্যাক্সিফোলিয়া*-র চেয়ে গ্রোথ রেট-ও কয়েক গুণ বেশি এর। ভয়ের কথা হলো, ছড়াতে শুরু করেছে জিনিসটা। অ্যাজোরেসে দেখা পাওয়া গেছে শৈবালটার, দেখা যাচ্ছে স্পেনের উপকূলেও।'

'হায় খোদা!' বিহ্বল কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'এই গরগন-উইডের কারণে কী ধরনের বিপদ দেখা দিতে পারে বলে ভাবছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

সলোমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ওয়ার্স্ট-কেস সিনারিয়ো শুনতে চাও? প্রথমে দুনিয়ার সমস্ত সি-বেড দখল করবে ওটা। মেরিন লাইফ ধ্বংস করে দেবে। এর প্রভাব পড়বে পুরো গ্রহের ইকো-সিস্টেমের উপর। আবহাওয়া বদলে যাবে, দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেখা দেবে...'

'কী!'

'ভুল শুনছ না। ব্যাপারটা খুব শীঘ্রি ঘটবে। যে-ধরনের গ্রোথ

রেট আমি লক্ষ করেছি শৈবালের স্যাম্পলে, তাতে মাস ছয়েকের মধ্যেই বিপর্যয়ের আলামত দেখা যাবার কথা।'

'এত বড় একটা বিপদ... অথচ কেউ কিছু জানে না কেন?'

'গরগন-উইডের নমুনা বিভিন্ন সাগরে দেখা গেলেও এ-নিয়ে সিরিয়াস গবেষণা আমরা মাত্র অল্প ক'জন করছি। সমাধান পাবার আগেই প্যানিক সৃষ্টি করতে চাইছি না আমরা।'

'কাজটা ঠিক করছেন না, ডক্টর,' বলল তানিয়া। 'সবাইকে জানালে সাহায্য পেতেন। শৈবালটাকে ঠেকানোর একটা উপায় বেরিয়ে আসত।'

'আমি কোনও কিছু গোপন করার পক্ষপাতী নই, তানিয়া,' একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হলেন সলোমন। 'বিপদটা সম্পর্কে জানতেই তো পেরেছি মাত্র ক'দিন আগে। প্রাথমিক অ্যানালিসিসটা সেরে নিতে চাইছি লোকের প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে। আশা করছি আগামী সপ্তাহেই জাতিসংঘ... আর নুমার মত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দিতে পারব। তোমাদেরকে ডেকেছি আগেভাগেই ব্যাপারটার আভাস দেয়ার জন্য, সেইসঙ্গে সাহায্যের আশায়।'

'কী সাহায্য?'

'পুরো ব্যাপারটাই রহস্যজনক, তানিয়া। গরগন-উইডের মিউটেশন খুব সম্প্রতি ঘটেছে, নইলে বহু আগেই দুনিয়ার মেরিন-লাইফ ধ্বংস হয়ে যেত। কোনও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে এই মিউটেশনের পিছনে। সেটা বের করা দরকার। তাই গোস্ট সিটি-তে আরেকটা এক্সপিডিশনের আয়োজন করা হয়েছে। মিউটেশনের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া গেলে প্রতিষেধকও আবিষ্কার করা যাবে। সেজন্য সাবমারসিবল *আলভিন*-কে নিয়ে ওশনোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস* যাচ্ছে ওখানে। আমাকে নিতে চাইছে ওরা, কিন্তু এদিকে অ্যানালিসিস আর

রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ হয়নি। আমি ভাবছি, তোমরা যদি আমার জায়গায় ওই এক্সপিডিশনে অংশ নাও... খুব উপকার হয় আমার...

'কী যে বলেন! আপনার কাজ কি আমরা করতে পারব?'

হাসলেন সলোমন। 'তোমাদের যোগ্যতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই আমার মনে। দু'জনে মিলে আমার চেয়ে ভাল পারফর্মেন্স দেখাবে—আমি শিয়োর! বলো রাজি আছ কি না।'

চোখাচোখি করল স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই উত্তেজনা অনুভব করছে। আসিফ বলল, 'যেতে আপত্তি নেই আমাদের, ডক্টর। নুমা থেকে অনুমতি নিতে হবে, তবে সেটা কোনও সমস্যা নয়। কারণটা জানার পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বরং জোর করেই পাঠাবেন আমাদেরকে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট!' টেবিলে চাপড় দিলেন সলোমন। 'আমি তা হলে এখানে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব।'

'*আটলান্টিস* এখন কোথায়?'

'অন্য একটা এক্সপিডিশন শেষ করে ফিরে আসছে। আগামীকাল অ্যাজোরেসে রিফুয়েলিঙের জন্য থামবে। তোমরা ওখানেই চড়তে পারো জাহাজে। আমি ওদেরকে জানিয়ে দেব তোমাদের যাবার খবর।'

'হুম। তা হলে আজ রাতেই ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। কাল সকালে অ্যাজোরেসের ফ্লাইট ধরব।'

'বেস্ট অভ লাক। আশা করি সফল হবে তোমরা।'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সৌভাগ্যই দরকার আমাদের,' বলল তানিয়া। 'নইলে বিপর্যয় ঠেকানোর কোনও উপায় নেই।'

বারো

'গরগন-উইড?' বলল রানা। 'নতুন উপদ্রব দেখছি! সত্যিই কি জিনিসটা ডেনজারাস?'

'ড. সলোমনের তা-ই ধারণা,' বলল আসিফ। 'ওঁর উপর আস্থা আছে আমাদের।'

'আর তোর ধারণা?'

'গোস্ট সিটিতে যাচ্ছি। সবকিছু নিজ চোখে না দেখে আমি মন্তব্য করতে চাই না।'

সকাল আটটা। স্টারফিশের সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ করেছে আসিফ। এক্সপিডিশনে যাবার আগে রানাকে সবকিছু জানিয়ে রাখা দরকার বলে মনে হয়েছে ওর।

'ফোনের জন্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মি. রেডক্লিফকে জানিয়ে যাচ্ছিস তো?' নুমার ডিরেক্টর আর তাঁর ডেপুটির কথা বলছে ও।

'অবশ্যই। তানিয়া কথা বলেছে। অ্যাডমিরাল বললেন, ওঁরা নাকি কয়েকদিন আগেই গরগন-উইডের ব্যাপারে রিসার্চ শুরু করেছেন।'

'অবাক হবার কিছু নেই। নুমা সবসময়ই এক কদম এগিয়ে থাকে।'

'এক কদম না, আধ কদম বলতে পারিস। শৈবালের সঙ্গে

গোস্ট সিটির কানেকশনের ব্যাপারে জানতেন না অ্যাডমিরাল। আমাদের এক্সপিডিশনের খবর শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

'আমিও। এতদিনে একটা কাজের কাজ পেয়েছিস! শুভকামনা রইল। কী ঘটে না ঘটে জানাস আমাকে।'

'ঠিক আছে। রাখি, কেমন?'

লাইন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রানা। কপালে ভাঁজ। গরগন-উইডের কথা শুনে চিন্তিত বোধ করছে। খানিক পর ফোন করল ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারে, চিফের নাম্বারে। মারাত্মক একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছে, সে-ব্যাপারে রিপোর্ট করা দরকার।

রিং হতে না হতে শোনা গেল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেস কাটিয়ে বলল, 'রানা, সার।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, কী খবর?'

গরগন-উইডের কথা বলতে শুরু করল রানা। কিন্তু মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। বললেন, 'জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে আমার। শৈবালটার ব্যাপারে সবকিছু শুনেছি। বঙ্গোপসাগরে এখনও দেখা যায়নি ওটা, তবু সমস্ত মেরিটাইম এজেন্সিকে সতর্ক করে দিচ্ছি। স্যান ডিয়েগো উপকূলে শৈবালের বিস্তার ঠেকাতে যে-ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তেমনটা এখানেও করবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখব আমরা।'

'জী, সার,' ঢোক গিলল রানা। 'খুব ভাল।'

'তোমার খবর বলো। জলপরীর কণ্ডিশন কী?' ডরমেয়ার

লেকের ঘটনা আগেই চিফকে জানিয়েছে রানা, ফলোআপ রিপোর্ট চাইছেন।

'অপারেশনাল, সার। খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, স্টারফিশেই মেরামত করে নিতে পেরেছি।'

'শুনে খুশি হলাম। তবে যাদের কারণে সাবমারসিবলটাকে অমন ঝুঁকির মধ্যে নিতে হলো তোমাকে, তাদের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। কিছু জানা গেছে ওদের সম্পর্কে?'

'না, সার। পুলিশ এখনও অন্ধকারে।'

'হুম। সুযোগ পেলে খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার তো ভাল কানেকশন আছে বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশ কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না, এখন যদি আমরা কেসটা সলভ করে দিতে পারি, তা হলে ভাল হয়।'

'জী, সার।'

'গুডবাই, এমআরনাইন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। চিফের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিছুদিন হলো ফরাসি পুলিশের সঙ্গে রানা এজেন্সির সম্পর্ক খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। দুটো কেস নিয়ে ওদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধায় এ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিও পোহাতে হচ্ছে এর জন্য। ফ্রান্সে রানা এজেন্সির নতুন একটা শাখা খোলার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ হেডকোয়ার্টারের আপত্তির কারণে আটকে গেছে। ডরমেয়ার লেকের কেসটা সমাধানে পুলিশকে সাহায্য করলে সম্পর্কটা হয়তো স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সেইসঙ্গে ফরাসি বড়কর্তাদেরও দেখিয়ে দেয়া যাবে, ওদের স্থানীয় আইনরক্ষীদের চেয়ে রানা এজেন্সি অনেক বেশি কার্যকর; নতুন একটা শাখা খোলা হলে ওদেরই লাভ।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সেরই

একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। ইয়োরোপে অপারেশনের জন্য ফ্রান্সে বাড়তি একটি শাখা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। রাহাত খান তাই এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছেন। পুলিশি তদন্তে নাক গলাবার নির্দেশ সরাসরি দিতে পারছেন না বলে কৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী চাইছেন তিনি।

দেরি না করে এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জন ফরহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ফ্লোটপ্লেন থেকে যে-এয়ারফিল্ডে বিশালদেহী দুর্বৃত্ত নেমে গেছে, সেখান থেকে লোকটার কোনও ট্রেইল পাওয়া যায় কি না, দেখতে বলল। কাজে লাগাতে বলল আণ্ডারওয়ার্ল্ডের ইনফর্মারদেরকেও। চেহারার বর্ণনা থেকে ওরা হয়তো চিনতে পারবে লোকটাকে।

অর্জনের সঙ্গে কথা শেষ করে স্টারফিশের ডেকে বেরিয়ে এল রানা। স্টারবোর্ড সাইডে রাজহাঁসের মত গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে জলপরী। সমস্ত ডেন্টিং মেরামত করা হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে ককপিটের আচ্ছাদনও। দেখে বোঝার উপায় নেই, দু'দিন আগে কী বিপদ পাড়ি দিয়ে এসেছে। ককপিটে ঢুকে ইনস্ট্রুমেন্ট চেকআপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জলপরীকে নিয়ে আজ পানিতে নামার ইচ্ছে আছে ওর। মেরামতের কাজ কতটা নিখুঁত হয়েছে, সেটা বোঝা দরকার।

চেকআপ শেষে সন্তুষ্ট হলো ও। সাবমারসিবলের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। গ্যালিতে গিয়ে ঢুকল নাশতা সারার জন্য।

লুনাকে পাওয়া গেল ওখানে।

'গুড মর্নিং,' হাসিমুখে বলল রানা। 'কেমন আছ? সুস্থ?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'হ্যাঁ। কিন্তু ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখছি, যেন বরফ চাপা পড়ে মরতে বসেছি।'

'এ-রোগের একটা চমৎকার চিকিৎসা জানি আমি। ডুবো সমাধিতে বেড়াতে যাবে?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লুনার। 'এমন লোভনীয় প্রস্তাব কে ফেরাতে পারে?'

'তা হলে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। আমাদের বাহন অপেক্ষা করছে।'

বিশ মিনিট পরেই পানিতে ডুব দিল জলপরী। কো-অর্ডিনেট মিলিয়ে সমাধির প্রবেশপথে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভিতরে ঢোকার আগে একটু থামল রানা। হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বালল, ভিডিও ক্যামেরা চালু করল, তারপর থ্রাস্টারে সামান্য চাপ দিয়ে সামনে বাড়াল সাবমারসিবলকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সমাধির ভিতরে ঢুকে পড়ল জলপরী।

বিশাল অভ্যন্তর, বর্গাকার একটা চেম্বারের মত। হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো বিপরীত প্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারছে না। ডানদিকের দেয়ালে আলো ফেলল রানা—চোখের সামনে ফুটে উঠল খোদাই করা প্রাচীন চিত্রলিপি। পালতোলা নৌকা, ঘরবাড়ি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নৃত্যরত মানুষ... কী নেই সেখানে! সবকিছুই অবশ্য পুরনো আমলের ডিজাইনে আঁকা, মানুষদের পোশাক-আশাক সচ্ছলতার আভাস দিচ্ছে।

ককপিটের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে লুনা, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে ড্রয়িংগুলো। ফিসফিসিয়ে উঠল, 'কী সুন্দর!'

ছবিগুলো চেনা চেনা লাগছে রানার কাছে। বলল, 'এ-জিনিস আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লুনা।

ভাবল রানা, মনে পড়ে যেতেই বলল, 'উত্তর আটলান্টিকে... ফ্যারো আইল্যাণ্ডের একটা গুহায়। স্টাইল আর বিষয়বস্তু ঠিক একই রকম লাগছে আমার কাছে। তোমার কী ধারণা?'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক না, তাও বলছি, ড্রয়িংগুলো আমার কাছে মিনোয়ান বলে মনে হচ্ছে। স্যাণ্টোরিনি, বা আধুনিক ক্রিট দ্বীপের অ্যাক্রোটিরি-তে যেসব খোদাই পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে প্রচুর মিল দেখতে পাচ্ছি। মিনোয়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শ' শতকে। আর তার মানে হচ্ছে...' রানার দিকে তাকাল লুনা, চেহারায় উত্তেজনা, 'আমরা যা জানি, তারচেয়েও অনেক বেশি এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল মিনোয়ানরা।'

'ওরা তা হলে তোমার কাল্পনিক ট্রেড রুটের মিসিং লিঙ্ক?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল লুনা। 'এই সমাধি প্রমাণ করে দিচ্ছে, পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য কয়েক হাজার বছর আগেও চালু ছিল।' হাততালি দিয়ে উঠল ও। 'প্যারিসে আমার কলিগদের মাথা ঘুরে যাবে এই আবিষ্কার দেখলে।'

ডানদিকের দেয়াল দেখা শেষ করে বাঁয়ের দেয়ালে চলে গেল রানা। এখানে ডরমেয়ার লেক আর গ্লেসিয়ারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হ্রদের তীরে নানা রকম ঘরবাড়ি আর স্ট্রাকচার দেখা গেল।

'হুম, লেকের ধারে সেটেলমেন্টের ব্যাপারে তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে,' বলল রানা।

'মার্ভেলাস!' আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করেছে লুনা। 'এই ড্রয়িংটাকে ম্যাপ হিসেবে ব্যবহার করে আমরা সেটেলমেন্টের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করতে পারব।'

সময় নিয়ে পুরো চেম্বারে তল্লাশি চালাল ওরা, কিন্তু লাশ

রাখার কোনও সারকোফাগাস দেখতে পেল না। কখনও রাখা হতো বলেও মনে হলো না।

'ভুল করেছি আমরা,' শেষ পর্যন্ত বলল লুনা। 'এটা সমাধি না, মন্দির। উপাসনা করা হতো এখানে।'

'আমার-ও তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে? পানিতে যখন নেমেছি, আমি আরেকটা রহস্যের সমাধান খুঁজতে চাই।'

'কী রহস্য?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

পকেট থেকে সাইড-সোনারের প্রিন্টআউট বের করল রানা, সঙ্গিনীর হাতে তুলে দিল। ভাঁজ খুলে ছবিটা কিছুক্ষণ দেখল লুনা। তারপর বলল, 'বিমানের মত লাগছে। কিন্তু এখানে বিমান এল কোত্থেকে?' পরমুহূর্তে সচকিত হলো। 'দাঁড়াও! গ্লেসিয়ারের ওই লাশটা?'

জবাব না দিয়ে রহস্যময় একটা হাসি উপহার দিল রানা। সাবমারসিবলের নাক ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল ডুবো-মন্দিরের ভিতর থেকে। কো-অর্ডিনেট মিলিয়ে এগোতে থাকল ও, চোখ সেঁটে রয়েছে হ্রদের মেঝেতে। হঠাৎ একটা চুরুট আকৃতির বস্তু ভেসে উঠল দৃষ্টিসীমায়।

কাছে যেতেই সিলিণ্ডার আকৃতির কাঠামো দেখতে পেল ওরা, লাল রঙের ফ্যাব্রিক ছিঁড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। নাকের অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদায়, হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইঞ্জিনের জটিল যন্ত্রাংশ। প্রপেলারের চিহ্ন নেই, ভেঙেচুরে কোথায় চলে গেছে কে জানে! ঠাণ্ডা পানির কারণে কোনও শ্যাওলা জমেনি কোথাও।

ফিউজলাজ ঘিরে চক্কর দিল রানা। ভাঙা একটা ডানা দেখতে পেল পঞ্চাশ গজ দূরে। লেজ অক্ষত আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটি প্রতীক—তিন-মাথা এক ঈগল, ধারালো

আঁকড়ে ধরে রেখেছে বর্শা আর তীরের একটা গোছা।

'ওই প্রতীক আমি চিনি,' বলে উঠল লুনা। 'গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটের গায়ে দেখেছি।'

'হেলমেটটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'জাহাজে। গ্লেসিয়ার থেকে বের হবার সময় নিয়ে এসেছি।'

ব্যাগে করে তা হলে লুনা শিরোস্ত্রাণটাই এনেছে, বুঝতে পারল রানা। অমন পরিস্থিতিতেও জিনিসটা ফেলে আসেনি... খাঁটি আর্কিয়োলজিস্ট বটে! ঈগলের দিকে চোখ ফেরাল ও, তারপর তাকাল বিমানের খালি ককপিটের দিকে।

'কী ঘটেছে বুঝতে পারছি,' রানা বলল। 'লেকে বিমানটা ক্র্যাশ করার আগে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা।'

'কিন্তু তাতে লাভ হয়নি,' যোগ করল লুনা। 'সম্ভবত মারাত্মক আহত হয়েছিল।'

'হুম।'

আরও কয়েকবার চক্কর দিল রানা, জলপরীর ভিডিও আর ডিজিটাল ক্যামেরায় নানা দিক থেকে ছবি তুলল। সন্তুষ্ট হবার পর মুখ ঘোরাল, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল সারফেসে। আজকের মত অভিযান শেষ।

আধঘণ্টার মধ্যে স্টারফিশের ডেকে পা রাখল দু'জনে। লুনা তার আবিষ্কারের কথা ভেবে আনন্দে উচ্ছল হয়ে আছে, কিন্তু গ্লেসিয়ারের দিকে চোখ পড়তেই চুপ হয়ে গেল।

ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কী হয়েছে, লুনা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুনা। 'সেদিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, রানা। মৃত্যুর কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম! গ্লেসিয়ারটা যতবার দেখি, ততবারই ভয়ে হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চায় পেটের ভিতর। মনে হয় যেন ওটা গিলে খেতে চাইছে আমাকে।'

সঙ্গিনীর বিমর্ষ মুখটা কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল রানা। তারপর বলল, 'আমি সাইকোলজি বুঝি না, তবে অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মনের ভয়কে কাটানোর জন্য ভয়ের উৎসটার মুখোমুখি হওয়া ভাল।' হাসল ও। 'চলো, বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায়?' লুনা অবাক হলো।

'পিকনিকে,' বলল রানা। 'মেস থেকে হালকা খাবার আর থার্মোসে কফি নিয়ে নাও।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই! যাও, দেরি কোরো না। আমি বোট নামানোর ব্যবস্থা করছি।'

একটু ইতস্তত করল লুনা, তবে রাজি হয়ে গেল। রানার উপর গত ক'দিনে অগাধ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে ওর। দেখাই যাক, দুঃসাহসী লোকটা ওর মনের ভয় দূর করতে পারে কি না। মেসে চলে গেল ও। খাবারের প্যাকেট আর কফি নিয়ে যখন ফিরল, তখন রানা একটা বোট নামিয়ে ফেলেছে পানিতে। সেটায় চড়ে রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

গ্লেসিয়ারের গা ঘেঁষে নৌকা ভিড়াল রানা। পানির কিনার ধরে কয়েক পা এগোলেই বরফের এবড়োথেবড়ো প্রাচীর। অদ্ভুত এক নীল দ্যুতি যেন বেরুচ্ছে সেখান থেকে। লুনাকে প্রাচীরের পাশে নিয়ে গেল রানা। ওর হাত থেকে গ্লাভস্ খুলে নিয়ে বলল, 'যাও, ছুঁয়ে দেখো।'

দু'হাতের নগ্ন তালু প্রাচীরের গায়ে ঠেকাল লুনা, কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'বড্ড ঠাণ্ডা, রানা।'

'হ্যাঁ, কারণ ওটা স্রেফ একতাল বরফ, আর কিছু না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই ওর। তোমাকে গিলে খাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। চোখ বন্ধ করো, মনকে এ-কথাগুলো শোনাও। এর নাম অটোসাজেশন।'

বাধ্য মেয়ের মত চোখ মুদল লুনা। বিড়বিড় করে নিজেকে অটোসাজেশন দিল। অবাক ব্যাপার; হঠাৎ করেই নিজেকে খুব হালকা লাগল ওর। মন ফুরফুরে হয়ে গেছে, বুক ঢিব ঢিব করছে না আর ভয়ে। চোখ খুলে রানার দিকে তাকাল, হাসল।

'কী, বলেছিলাম না?' রানা বলল।

গ্লেসিয়ারের পাশ ছেড়ে চলে এল ওরা। হ্রদের তীরে একটা পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বের করল। ওখানে বসে খাবারের প্যাকেট আর কফির থার্মোস-ফ্লাস্ক খুলল।

'ধন্যবাদ, রানা,' মৃদু গলায় বলল লুনা, 'আমার ভয়টা দূর করে দিয়েছ।'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'ভয় পাওয়া, আর তাড়ানো... দুটো বিষয়েই আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।'

'তুমি আবার ভয় পাও নাকি?' একটা ভুরু উঁচু হলো লুনার। 'দেখে তো মনে হয় না।'

'কে বলেছে? সেদিন তোমাকে নিয়ে আমি কত ভয় পেয়েছিলাম, জানো?'

'উঁহুঁ। তবে এ জানি, ওটা ভয় না মশাই, উদ্বেগ। আমি বলছি সত্যিকার ভয়ের কথা। তোমার মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও কখনও লক্ষ করিনি আমি।'

'রহস্যটা জানতে চাও?'

'কী?'

'আমি খুব ভাল অভিনয় জানি, ভয়কে কখনও চেহারায় ফুটতে দিই না।'

'যাহ্!'

'সত্যি বলছি। আমি তো রোবট নই, রক্ত-মাংসের মানুষ। ভয় থাকবে না কেন আমার?'

'ভয় পেলে আমাকে উদ্ধার করলে কীভাবে? যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছ তুমি বরফের তলার ওই টানেলে।'

'সবই আমার ট্রেইনিং আর অভিজ্ঞতার কেরামতি। বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কাজেই বাদ দাও প্রসঙ্গটা।'

'বললেই কি বাদ দেয়া যায়? যা ঘটে গেছে এই গ্লেসিয়ারে, তা কোনোদিন মন থেকে মুছতে পারব না। সবচেয়ে বড় কথা... কেন এসব ঘটল, কেন আমি মরতে বসেছিলাম... তা-ই জানি না।'

'এসো ওটা নিয়েই আলোচনা করি,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'কী জানি আমরা? আইস-মুভমেণ্ট নিয়ে গবেষণা করছিলেন একদল বিজ্ঞানী, হঠাৎ বরফে জমাট বাঁধা একটা লাশ পাওয়া গেল। কাছাকাছি পাওয়া গেল একটা প্রাচীন হেলমেট আর স্ট্রংবক্স। সাংবাদিক এল, তাদের সঙ্গে এল একজন রহস্যময় লোক। পিস্তল দেখিয়ে স্ট্রংবক্সটা কেড়ে নিল সে, পালাবার পথে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরো টানেল পানিতে তলিয়ে দিল। রাইট? একটা ব্যাপার এখানে অস্পষ্ট—শুধু স্ট্রংবক্স নিল কেন সে? হেলমেট কেন নিল না? ওটার খবর জানত না? নাকি প্রয়োজনীয় মনে করেনি জিনিসটা?'

'আমাদেরকেই বা খুন করতে চাইল কেন?' বলল লুনা। 'ওকে ঠেকাবার সাধ্য ছিল না আমাদের, এমনিতেই পালাতে পারত।'

'আমার ধারণা, লাশটার কাছে যাতে আর কেউ যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছে সে। তোমরা না থাকলেও বিস্ফোরণ ঘটাত।'

'হুঁ, তা অবশ্য হতে পারে...' বলতে বলতে থেমে গেল লুনা।

হালকা একটা শব্দ ভেসে এসেছে কানে। মাথা ঘুরিয়ে

তাকাতেই ধুলোর মেঘ দেখতে পেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ড. দ্যুবোয়ার সিত্রোঁ—ফিফি। ওদের কাছে এসে থামল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ফরাসি বিজ্ঞানী. সঙ্গে ক্যাসিডি আর কলিন্স।

'মসিয়ো রানা! আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি,' হাত মিলিয়ে বললেন দ্যুবোয়া। 'জাহাজে যোগাযোগ করেছিলাম, ওরা বলল আপনারা এখানে।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?' জানতে চাইল রানা।

'না, না, আমরা আসলে বিদায় নিতে এসেছি।'

'চলে যাচ্ছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল লুনা।

'হ্যাঁ,' ক্যাসিডি মাথা ঝাঁকাল। 'অবজারভেটরি পানির তলায়, এখানে বসে থেকে কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি, ওখান থেকে যে-যার বাড়িতে। পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে, ওরা যদি টানেল থেকে পানি বের করতে পারে, তা হলে আগামী মৌসুমে ফিরে আসব।'

'কীভাবে যাচ্ছেন?'

'একটা হেলিকপ্টার আসবে ঘণ্টাখানিকের মধ্যে।'

'হেলিকপ্টার?' চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লুনার। 'আমাকে নেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

লুনার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমিও যেতে চাইছ?'

'এখানে আমার কাজ শেষ, রানা। যেসব ডেটা পেয়েছি, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে তাড়াতাড়ি সংশ্লিষ্ট মহলের সামনে পেশ করা দরকার। দুঃখিত...'

'ইটস্ ওকে,' হাত তুলে ওকে থামাল রানা। 'দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। এমন তো নয় যে, জীবনে আর দেখা হবে না

আমাদের। সত্যি বলতে কী, জলপরীর টেস্ট-ট্রায়ালও শেষ হয়ে গেছে; তাই আমারও আর কাজ নেই এখানে। স্টারফিশকে রওনা করিয়ে দিতে পারি।'

'প্যারিসে যাবে আমার সঙ্গে?'

'এখন সম্ভব না। একটা রিপোর্ট লিখতে হবে পুরো অভিযানের উপর। সেটা শেষ করে আসব নাহয়। ডিনার-ডেটের কথা ভুলিনি, তৈরি থেকো।'

'অবশ্যই!' হাসল লুনা। 'তবে একটাই শর্ত, ডিনারের বিল আমি দেব।'

'এমন লোভনীয় প্রস্তাব কে ফেরাতে পারে?' ওকে নকল করে বলল রানা। 'চলো, শিপে যাই। তোমার জিনিসপত্র নিশ্চয়ই আনতে হবে?'

'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি,' বিজ্ঞানীদের বলল লুনা।

'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব,' বলল ক্যাসিডি।

স্টারফিশে ফিরে এল ওরা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল লুনা। ওকে বোটে তুলে দিতে ডেক পর্যন্ত এল রানা। যাবার আগে ওকে জড়িয়ে ধরল লুনা। ঠোঁটে হালকা চুমু খেয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ, রানা।'

'প্রাণ বাঁচিয়েছি বলে?'

'উঁহু, সবকিছুর জন্য। প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান তোমাকে আমি প্যারিসে দেব।'

'টোপ দিচ্ছ, যাতে যেতে বাধ্য হই?'

'তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই, মাসুদ রানা। টোপ না দিলে আর তোমার দেখা পাবো না।'

রানা চোখ টিপল। 'টোপের প্রয়োজন নেই। আমি এমনিতেই আসব।'

'মনে থাকে যেন।'

বোটে উঠে গেল লুনা। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল রানা। তারপর ঢুকল শিপের রিমোট-সেন্সিং ল্যাবে। জলপরী থেকে ভিডিও ক্যামেরার ক্যাসেট আর ডিজিটাল ডিস্ক নিয়ে এসেছে। কম্পিউটারে ঢোকাল সবকিছু। তারপর ছবি আর ভিডিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। একটু পর বুঝতে পারল, ওর ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই বিমানের রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। সাহায্য দরকার।

স্যাটেলাইট টেলিফোনের অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করল ও, তারপর মেমোরিতে রাখা একটা সংখ্যা টিপল।

দশবার রিং হবার পর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বলছি।'

'হ্যালো, পচা আবর্জনা।'

'রানা!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বিউ মরটন, গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছে। 'তুমি রিং করেছ জানলে আরও আগে ধরতাম।'

'আর নিজের চরিত্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে? বিশ্বাস করি না।'

ছবিটা পরিষ্কার ভাসছে রানার চোখের সামনে—সিল্ক পা'জামায় মোড়া পুরো চারশো পাউণ্ড ওজনের প্রকাণ্ড একটা শরীর নিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু বই-পুস্তকের মাঝখানে ডুবে আছে মানুষটা। প্রাচীন নৌ-পথ আর নৌ-যান সম্পর্কে এত পড়াশোনা দুনিয়ার আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ, সাগর আর ইতিহাস সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায় তাকে।

'কোথেকে বলছ?' জানতে চাইল মরটন।

'ফ্রেঞ্চ আল্পসের মাঝখানে একটা হ্রদ থেকে।'

'নতুন প্রজেক্ট? থাক, বলতে হবে না। তোমার সব

অ্যাসাইনমেন্টই তো টপ সিক্রেট। অধমকে স্মরণ করেছ কেন, সেটা বলো।'

'পুরনো একটা বিমান সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার।'

'ভুল নাম্বারে ডায়াল করে ফেলেছ নাকি?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল মরটন। 'আমি সাগরের বিশেষজ্ঞ, আকাশের নই।'

'এই বিমানটা পানির তলায় শুয়ে আছে।'

'ইন্টারেস্টিং! কী বিমান?'

'সেটাই জানা দরকার। তোমার কম্পিউটার অন্ করো, আমি ই-মেইলে একটা ছবি পাঠাচ্ছি।'

'পাঠাও, তবে কতটুকু সাহায্য করতে পারব, জানি না। অ্যান্টিক এয়ারক্র্যাফটের ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই কম।'

'আমার চেয়ে তো বেশি। পুরনো বইপত্র ঘাঁটো, বিমান সম্পর্কেও নিশ্চয়ই পড়াশোনা আছে?'

'কিছুটা। দেখি তোমার কাজে আসে কি না।'

ভাল একটা ছবি ই-মেইলে পাঠাল রানা। সেটা দেখে নিয়ে মরটন বলল, 'হুম, আন্দাজে তীর ছুঁড়তে হবে, তবে ইঞ্জিন হাউজিং দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা *মোরান-সলনিয়ের*। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মনো-উইংড্ ফাইটার বিমান। সে-আমলের আর কোনও বিমান এটার ধারেকাছে ছিল না। গান আর প্রপেলারের সিংক্রোনাইজেশন সিস্টেমটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কপাল ভাল তোমার, যে-ক'টা অ্যান্টিক বিমান সম্পর্কে ভাল করে জানি আমি, তার মধ্যে এটা একটা।'

'এমন কোনও বিমান আল্পসে ক্র্যাশ করেছিল কি না, জানা আছে তোমার?'

'উঁহুঁ। বিমান-দুর্ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। তবে আমার পরিচিত একজন এয়ার-হিস্টোরিয়ান আছে... ফ্রান্সেই থাকে, প্যারিসের কাছে। তার নাম্বার দেব?'

'দাও।'

মরটনের কাছ থেকে নাম্বারটা নিল রানা। তারপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল। একটু পরেই নতুন নাম্বারটায় ডায়াল করতে শুরু করল। জটিল এক রহস্যের খোঁজ পেয়েছে, এ-রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

তেরো

একরাশ হতাশা নিয়ে মোটা বইটা সশব্দে বন্ধ করল লুনা, সরিয়ে রাখল সামনে থেকে। টেবিলের উপর একই রকম আরও কয়েকটা বই আছে, কোনোটাই ওর কাজে আসেনি। মাঝখান থেকে কোমর-ব্যথা হয়ে গেছে বসে থাকতে থাকতে। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ও, তাকাল টেবিলের উপর রাখা শিরোস্ত্রাণটার দিকে। জড় এক বস্তু, যুদ্ধের হাতিয়ার, তারপরও ওটার কালচে শরীরের দিকে তাকালে গা শিরশির করে ওঠে। যেন প্রাণ আছে, মানুষের মুখের আদলে তৈরি করা ভাইজরটা কথা বলে উঠবে এখুনি।

তিনদিন কেটে গেছে আল্পস্ থেকে ফিরে আসার পর। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল সোসাইটিতে অ্যাম্বার রুট সংক্রান্ত সব তথ্য-প্রমাণ জমা দিয়েছে লুনা। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কয়েকদিন সময় চাওয়া হয়েছে সোসাইটি থেকে। হাতে আপাতত কাজ নেই, তাই উঠে পড়ে

লেগেছিল শিরোস্ত্রাণ নিয়ে, ওটার পরিচয় আর উৎস জানার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কাজে নেমে বুঝতে পারছে, কাজটা অত সহজ নয়। দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য ঘিরে আছে ওটাকে।

জানাশোনা শিরোস্ত্রাণগুলোর সঙ্গে ওটাকে মেলানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শুরুতে ফ্রান্স, তারপর ইটালি আর জার্মানির ইতিহাস ঘেঁটেছে লুনা; মধ্যযুগে বর্ম তৈরিতে এ-তিনটে দেশ শীর্ষে ছিল। কিন্তু ফরাসি, ইতালীয়, বা জার্মান শিরোস্ত্রাণের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়নি। এরপর ক্রমান্বয়ে পুরো ইয়োরোপ, এশিয়া, আর বাকি পৃথিবীর আর্কাইভ দেখেছে ও; গবেষণা করেছে ব্রোঞ্জ সভ্যতার সময় পর্যন্ত। ফলাফল লবডঙ্কা।

শিরোস্ত্রাণটার সবকিছুই পরস্পরবিরোধী। শৈল্পিক দিক থেকে অতুলনীয়, কিন্তু নকশা দেখে মনে হয় না ওটা যুদ্ধে ব্যবহার হতো। সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবেই ওটা বেশি মানানসই। ডিজাইন বলছে অন্তত এগারো শতকের জিনিস, ওজনও তেমন, অথচ এমন সব খুঁটিনাটি আছে, যা ষোড়শ শতকের আগে দেখা যায়নি। যেমন: উপরিভাগের একটা মুকুট-সদৃশ অংশ—বল্লম বা তলোয়ারের আঘাত সরাসরি হেলমেটের গায়ে না লাগার জন্য ওটা রাখা হতো। তবে সেটা মধ্যযুগের শেষাংশে। ভাইজরটাও অদ্ভুত, ওটার জন্য দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে যায়। মধ্যযুগের যোদ্ধাদের কখনোই এমন ভাইজর-অলা হেলমেট ব্যবহার করার কথা নয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিরোস্ত্রাণের ইস্পাত। অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম ইস্পাত তৈরি শুরু হয়, তবে সেটার মানগত উন্নয়ন ঘটাতে প্রচুর সময় লেগেছে। হেলমেটের ইস্পাতটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। নির্মাণশৈলী প্রমাণ করে, অত্যন্ত দক্ষ কোনও কারিগরের হাতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই কারিগরের কোনও চিহ্ন বা স্বাক্ষর নেই কোথাও। থাকার কথা ছিল।

একটাই উপায় আছে এখন। কোনও মেটালারজিস্ট... মানে ধাতু-বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে জিনিসটা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে হয়তো বলতে পারবে—কবে, কোথায়, বা কার হাতে তৈরি হয়েছে এই শিরোস্ত্রাণ। পুরনো আমলের কারিগরদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, ধাতু-বিশেষজ্ঞই শুধু খুঁজে বের করতে পারবে সেই বৈশিষ্ট্য। কার কাছে নেবে, তা ভাবতেই একটা মাত্র নাম মনে পড়ল। দিদিয়ের দেশম।

ফোন করল লুনা। ওপাশ থেকে ভেসে এল ভরাট, মার্জিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, দেশম অ্যান্টিকুইটিস।'

'দিদিয়ের, লুনা পারসেল বলছি।'

'আহ্, লুনা!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল দেশম। 'কেমন আছ তুমি? আল্পসের ওই দুর্ঘটনায় নাকি তুমিও ছিলে?'

'হ্যাঁ, ওটার কারণেই যোগাযোগ করছি তোমার সঙ্গে। একটা হেলমেট পেয়েছি আল্পসের অভিযানে। অদ্ভুত... কোনও আগামাথা পাচ্ছি না। তুমি একটু চোখ বোলাবে?'

'কেন? কম্পিউটার বুঝি হার মেনেছে?' টিটকিরির সুরে বলল দেশম। প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে দুজনের মধ্যে অম্লমধুর বিতর্ক রয়েছে—দেশমের ধারণা, প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত না। হাতেকলমেই সবকিছু করা উচিত, তাতে অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান... দুটোই বাড়ে। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য লুনা কম্পিউটারের ডেটাবেজ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

'কম্পিউটারের কোনও দোষ নেই,' বিরক্ত গলায় বলল লুনা। 'আমি আমার লাইব্রেরির বইপত্রও ঘেঁটে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা কিছুতেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না।'

'কী বলছ!' একটু অবাক হলো দেশম। লুনার রেফারেন্স

লাইব্রেরি দেখেছে সে, অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখান থেকে দুনিয়ার যে-কোনও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বা বর্মের পরিচয় জানা যাবার কথা।

'আমি সিরিয়াস, দিদিয়ের। হেলমেটটা আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'কৌতূহল তো বাড়িয়ে দিলে, মেয়ে! হাতে তেমন কাজ নেই, চাইলে এখুনি নিয়ে আসতে পারো।'

'ঠিক আছে, আসছি।'

ফোন রেখে দিল লুনা। বালিশের একটা কাভারে মোড়াল শিরোস্ত্রাণটা, প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরল। তারপর মেট্রো ট্রেন ধরে চলে গেল *ল্য রিভ দোয়াত*-এ। ওখানেই দেশমের অ্যান্টিক শপ।

প্রথম দেখায় দোকানটা কারও মনেই আকর্ষণ সৃষ্টি করবে না। ছোট্ট, ধুলো-বালিতে ঢাকা, সাইনবোর্ড পড়া যায় কি যায় না। ডিসপ্লে-তেও সস্তা দরের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে এ-সবই হচ্ছে এক ধরনের ছদ্মবেশ... কৌতূহলী লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল। ট্যুরিস্টরা দেশমের দু'চোখের বিষ, সিরিয়াস ক্রেতা ছাড়া আর কারও সঙ্গে ব্যবসা করায় আগ্রহ নেই ওর। সে-ধরনের ক্রেতারা দোকানের জাঁকজমক নিয়ে মাথা ঘামায় না, দেশমের নামডাক শুনে তবেই আসে।

লুনা দোকানে ঢুকতেই দরজায় বাঁধা ঘণ্টা টুনটুন করে বেজে উঠল। ভিতরে কাউকে দেখা গেল না, কাউন্টার শূন্য পড়ে আছে। তবে কয়েক মুহূর্ত পরই পিছনের পর্দা ঠেলে এক লোক উদয় হলো—কালো রঙের পোশাক পরা, ইঁদুরমুখো চেহারা। লুনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর *গলুই* সিগারেট টানতে টানতে হাজির হলো দেশম। মাঝবয়েসী, মাথার সব চুল ইতিমধ্যে সাদা হয়ে গেছে,

ঝুঁটির মত বেঁধে রেখেছে পিছনে। চোখের তারায় বরাবরের মত বুদ্ধির ঝিলিক

'লুনা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দেশম। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে জড়িয়ে ধরল অতিথিকে, গালে চুমো খেল। 'খুব তাড়াতাড়ি এসেছ দেখছি। নিশ্চয়ই হেলমেটটা বিশাল কোনও আবিষ্কার!'

'সেটা তুমি কনফার্ম করবে। এইমাত্র বেরুল... লোকটা কে?'

'ও? আমার এক সাপ্লায়ার।'

'দেখে তো চোরের মত লাগল।'

হাসল দেশম। 'আমার অনেক সাপ্লায়ার-ই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। তাই বলে নাক সিঁটকাতে পারি না। আফটার অল, ওরাই আমার রুটি-রুজির উৎস।'

দোকানের দরজার ছিটকিনি তুলে দিল সে, *ক্লোজড্* সাইন ঝুলিয়ে দিল। তারপর পর্দা সরিয়ে লুনাকে নিয়ে গেল তার ব্যক্তিগত কামরায়। ওঅর্কশপের আদলে সাজানো হয়েছে কক্ষটা। প্রশস্ত, সুন্দরভাবে আলোকিত। চারপাশের দেয়ালে শো-কেস, সেখানে নানা ধরনের আর্টিফ্যাক্ট শোভা পাচ্ছে। মাঝখানে রয়েছে ওঅর্ক-টেবিল, এক পাশে অফিস ডেস্ক। ডেস্কের উপর কম্পিউটার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে লুনাকে খোঁটা দিলেও দেশমের বেশিরভাগ বেচাকেনাই চলে ইন্টারনেটে। ই-মেইলের মাধ্যমে বাছাই করা একদল প্রথম শ্রেণীর ক্রেতার কাছে ক্যাটালগ পাঠায় সে, ওরাও একই পদ্ধতিতে নিজেদের পছন্দ জানায়। টাকা-পয়সার লেনদেন হয় ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিঙের মাধ্যমে। শুধুমাত্র বিক্রিত দ্রব্যটিই প্যাকেজিং করে পাঠানো হয়, বাকি সবকিছু সারা হয় কম্পিউটারে।

দেশমের সঙ্গে লুনার প্রথম পরিচয় হয় কয়েক বছর আগে, একটা জাল আর্টিফ্যাক্ট শনাক্ত করার জন্য সাহায্য নিতে হয়েছিল দেশমের। অল্পদিনেই ও আবিষ্কার করে, পুরনো আমলের যুদ্ধাস্ত্রের বিষয়ে লোকটার গভীর জ্ঞান রয়েছে: বেশিরভাগ অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতই তার ধারে-কাছেও লাগে না। অগত্যা বিভিন্ন সময়ে দেশমের সাহায্য নিতে শুরু করে লুনা, ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে ওঠে ওরা। অ্যান্টিক এবং আর্টিফ্যাক্টের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ আছে দেশমের, এ-কথা অজানা নয়; কিন্তু এ-ও সত্যি, ওই যোগাযোগের ফলেই গোপন অনেক তথ্য তার নাগালের মধ্যে থাকে। লুনা তাই বন্ধুত্বটা অটুট রেখেছে।

'দেখাও তোমার হেলমেট,' ওঅর্কশপে ঢুকে বলল দেশম।

ব্যাগ থেকে শিরোস্ত্রাণটা বের করল লুনা, ওঅর্কটেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে জিনিসটা দেখল দেশম। ঘন ঘন টান দিচ্ছে সিগারেটে, একটা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরাচ্ছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, চমৎকৃত হয়েছে সে। দূর থেকে দেখল হেলমেটটা, কাছে গিয়ে প্রায় নাক ঠেকিয়ে দেখল, তারপর তুলে নিল হাতে। ওজন পরখ করল, শেষে পরল নিজের মাথায়। কিছু বলল না, হেলমেট পরেই গটমট করে চলে গেল একটা শো'কেসের সামনে, নীচের শেলফের ঢাকনা খুলে একটা পেটমোটা বোতল বের করল।

'ব্র্যাণ্ডি?' অবশেষে মুখ খুলল সে।

শিরোস্ত্রাণে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে দেশমকে, হাসি চাপতে পারল না লুনা। খিলখিল করে উঠে বলল, 'দাও। তবে তোমার হাতে ব্র্যাণ্ডির বোতল না, একটা গদা দেয়া দরকার। সার্কাসের জোকার হিসেবে খুব মানিয়ে যাবে।'

দেশমও হাসল। মাথা থেকে শিরোস্ত্রাণ খুলে টেবিলে

নামিয়ে রাখল, তারপর দুটো গ্লাসে ঢালল ব্র্যাণ্ডি। একটা বাড়িয়ে ধরল লুনার দিকে।

'তারপর?' ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে ভুরু নাচাল আর্কিয়োলজিস্ট। 'কী বুঝলে?'

'চমৎকার জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই,' বলল দেশম। 'কোথেকে উদ্ধার করেছ, জানতে পারি?'

'ল্য ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার থেকে। বরফের আটশো ফুট গভীরে পেয়েছি।'

'গ্লেসিয়ার? ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো!'

'পুরোটা শোনোই না! জিনিসটা পাওয়া গেছে বরফে জমাট বাঁধা একটা লাশের পাশে। অথচ লোকটা মারা গেছে বড়জোর একশো বছর আগে। আমাদের ধারণা, লোকটা পাইলট... প্যারাশুট নিয়ে লাফ দিয়েছিল একটা প্লেন থেকে। প্লেনটাকে ডরমেয়ার লেকের তলায় স্পট করতে পেরেছি আমরা।'

হেলমেটের গায়ের ফুটোটাতে আঙুল বোলাল দেশম। 'এটা?'

'সম্ভবত বুলেটের গর্ত।'

অবাক হলো না দেশম। বলল, 'তারমানে এটা ওই পাইলটের মাথায় পরা ছিল?'

'বোধহয়।'

'অমনটা ভাবছ কেন?'

'হেলমেটের ইস্পাত-টা দেখো। ভীষণ শক্ত। পুরনো আমলের মাস্কেট বল এ-জিনিস ফুটো করতে পারবে না। সেজন্য চাই আধুনিক যুগের বুলেট... হাই ক্যালিবারের বুলেট।'

'কী বলছ, বুঝতে পারছ?' ভুরু কোঁচকাল দেশম। 'প্রাচীন এক শিরোস্ত্রাণ পরে একটা মানুষ উড়ে যাচ্ছিল গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে। তাকে গুলি করা হয়েছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের

সাহায্যে!'

'জানি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে। কিন্তু আর কোনও ব্যাখ্যা তো পাচ্ছি না।'

'হুম, আমাকে গোড়া থেকে সব শোনাও। দেখি কিছু বুঝতে পারি কি না।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল লুনা। বলতে শুরু করল ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে ওর অভিজ্ঞতার কাহিনি--কীভাবে হেলমেট আর স্ট্রংবক্স পাওয়া গেল, কীভাবে বিশালদেহী এক লোক হামলা চালাল, কীভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করা হলো ওদেরকে।

সব শোনার পর মাথা ঝাঁকাল দেশম। বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। মসিয়ো মাসুদ রানা মনে হচ্ছে খুবই দুঃসাহসী লোক।'

'শুধু দুঃসাহসী নয়; নিঃস্বার্থ, পরোপকারী...' বলতে বলতে থেমে গেল লুনা। গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে, প্রশংসা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে নিজের দুর্বলতা।

মুচকি হাসল দেশম। 'যা-ই হোক, ভদ্রলোকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখি, লুনা। কিছু হয়ে গেলে খুব কষ্ট পেতাম।'

'মার্সি, দিদিয়ের,' বলল লুনা। 'এখন বলো, কী বুঝলে তুমি আমার গল্প থেকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল দেশম। 'জটিল রহস্য, তাতে সন্দেহ নেই। তবে শিরোস্ত্রাণটার ব্যাপারে নির্দ্বিধায় দু-একটা মন্তব্য করতে পারি।'

'যেমন?'

'যতটা দেখাচ্ছে, তার চেয়েও প্রাচীন এটা। তোমার কথা

ঠিক, ইস্পাতটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। এ-ধরনের নমুনা আগে কখনও দেখিনি আমি, তুমিও তোমার লাইব্রেরি তছনছ করে জিনিসটার রেফারেন্স পাচ্ছ না। কাজেই ধরে নিতে দোষ নেই, এটা একটা প্রোটোটাইপ।'

'কোনও খুঁত দেখতে পাচ্ছি না এতে,' লুনার কণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ ফুটল। 'যদি প্রোটোটাইপ-ই হবে, তা হলে পরবর্তীতে এই মডেলের মাস-প্রোডাকশন করা হয়নি কেন?'

'মানুষের স্বভাব তো জানো। ভাল জিনিস সবসময় হালে পানি পায় না। পোলিশরা প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশনের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী নামিয়েছিল। এরিয়াল বম্বিঙের গুরুত্ব বোঝাতে বিলি মিচেলকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই হেলমেটের ব্যাপারেও হয়তো তেমন কিছু ঘটেছে। কেউ হয়তো বলেছে, নতুন হেলমেটের দরকার কী? পুরনোগুলোই তো ভাল সার্ভিস দিচ্ছে!'

'হতে পারে,' স্বীকার করল লুনা। 'আর ঈগলের প্রতীকটা? ওটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?'

'অচেনা প্রতীক,' দেশম বলল। 'কী বোঝাতে চাইছে, তা জানি না। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে পারি, তবে সেটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হবে না।'

'অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই শুনি না।'

চোখে একটা চশমা লাগাল দেশম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রতীকটা। তারপর বলল, 'তিন-মাথা ঈগল... আমি বলব, এটা একটা জোটের চিহ্ন—তিনটে পক্ষ একত্রিত হয়েছে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য। থাবায় অস্ত্রশস্ত্র ধরা আছে... কাজেই যুদ্ধ বা লড়াইয়ের সঙ্গে এই জোটের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি।'

'অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে মন্দ বলোনি,' প্রশংসা করল লুনা।

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

'তা তো বটেই, সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের কোনও উপায় নেই যখন!' দেশম হাসল। তারপর তাকাল হাতঘড়ির দিকে। 'কিছু মনে কোরো না, লুনা। লণ্ডনের এক ডিলারের সঙ্গে এখন আমার ই-কনফারেন্সে বসতে হবে। হেলমেটটা চাইলে রেখে যেতে পারো, আমি সময় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।'

'ঠিক আছে, থাকুক।' বলে উঠে দাঁড়াল লুনা। 'তোমার কাজ শেষ হলে আমাকে রিং দিয়ো। অফিসে কিংবা বাসায় থাকব।'

'সাবধানে থেকো,' গম্ভীর গলায় বলল দেশম। 'বিপদ হতে পারে। স্ট্রংবক্স তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, হেলমেটের উপরও চোখ পড়তে পারে ওদের। এটা যে তোমার কাছে, তা কে কে জানে?'

'রানা জানে... আর টানেলে যারা আটকা পড়েছিলাম।'

'লেগ্রাঁ ছিল ওদের মধ্যে, তাই না? ওকে নিয়েই ভয়।'

'লেগ্রাঁকে আমি থোড়াই পরোয়া করি,' সরোষে বলল লুনা। 'হেলমেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখুক, বাকি আঙুলগুলোও ভেঙে দেব।'

'আমি সিরিয়াস, লুনা,' বলল দেশম। 'ও যদি জিনিসটা চেয়ে বসে, কী করবে তুমি? আফটার অল, এটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ... আর লেগ্রাঁ সরকারের লোক।'

'চেয়েছে তো! এরই মধ্যে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে, আমি পাত্তা দিইনি। ঘোরাচ্ছি। যদি বেশি জোরাজুরি করে, বলব হেলমেটটা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। রিল্যাক্স, ওকে সামলাতে পারব। কিচ্ছু ভেবো না।'

ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে তুলতে দেশম বলল, 'ফোন এসে গেছে। এখন তা হলে এসো। পরে কথা হবে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের পথে রওনা হলো লুনা, ফোনের অ্যান্সারিং মেশিন চেক করে দেখবে—রানা

যোগাযোগ করেছে কি না। দেশমের সামনে ড্যামকেয়ার ভাব দেখিয়ে এলেও গা শিরশির করছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বিপদের কালো মেঘ ঝুলছে মাথার উপর। কেন যেন মনে হচ্ছে, রানার কণ্ঠ শুনলে ভয়টা দূর হয়ে যাবে।

ল্যাটিন কোয়ার্টারের *মুফেতার*-এ লুনার অ্যাপার্টমেন্ট। ব্যস্ত এলাকা। দালানটা পুরনো, এককালে টাউন হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতো; এখন অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তর করা হয়েছে। তিনতলায় থাকে লুনা, লাগোয়া ব্যালকনি থেকে প্যারিসের প্রাচীন অংশের সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মনেই হয় না, সময়টা একবিংশ শতক। বাড়িতে ফিরেই প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা ব্যালকনিতে কাটায় লুনা, কফি কিংবা চা খেতে খেতে ঐতিহাসিক ইমারতগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করে। নিজেকে তখন মধ্যযুগের নিঃসঙ্গ রাজকন্যার মত মনে হয়।

আজ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটল। ব্যালকনিতে গেল না, বাসায় ঢুকে প্রথমেই আন্সারিং মেশিনের টেপ বাজিয়ে দেখল লুনা। রানার কোনও মেসেজ নেই তাতে। কোথায় গেল লোকটা? এখনও যোগাযোগ করছে না কেন?

ক্লান্তি অনুভব করছে লুনা। সোফায় আধশোয়া হয়ে টিভি ছাড়ল। এখন আর কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, স্নায়ুর বিশ্রাম দরকার। টিভির পর্দায় রঙের ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে অগাস্টিন লেগ্রাঁ কী করছে, তা জানলে ঘুমাতে পারত না লুনা। নিজের অফিসে বসে আছে লোকটা, রাগে ফুঁসছে। ডেস্কের উপর ঝুঁকে মোটাসোটা একটা ফাইল সাজাচ্ছে, তাতে লুনা পারসেলের বিরুদ্ধে অসংখ্য নালিশ রয়েছে। বেয়াদব, বেয়াড়া মেয়েটাকে শায়েস্তা না করে তার শান্তি নেই।

ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে চরম অপমান করেছে তাকে সবার সামনে, এখনও অগ্রাহ্য করে চলেছে। প্রাচীন হেলমেটটার জন্য কয়েকবার লুনাকে ফোন করেছে লেগ্রাঁ, মেয়েটা কথাই বলতে রাজি হয়নি। একই বিল্ডিঙে অফিস দুজনের, আজ সকালে এলিভেটরে দেখা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কথা বলেনি লুনা, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, সাধারণ ভদ্রতাটুকু দেখায়নি!

সেই থেকে মাথায় আগুন জ্বলছে লেগ্রাঁর। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এবার প্রতিশোধ নেবে সে। চরম প্রতিশোধ! ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে লুনার। জীবনে যেন কোথাও আর্কিয়োলজিস্টের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করে ছাড়বে। এ-জন্য যত জায়গায় ধরনা দিতে হয়, দেবে। যত সুতো টানতে হয়, টানবে। নিজের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে মেয়েটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সে। লুনা পারসেল তখন টের পাবে, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল। আজ সারাদিন ধরে সে নালিশ জড়ো করেছে, রিপোর্ট লিখেছে। এখন সব সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে ফাইলে। এই ফাইল আগামীকাল আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের সামনে পেশ করবে। বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের সময় সাহায্য করেছিল সে, সেই উপকারের প্রতিদান চাইবে।

লুনা পারসেলের অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনার সাগরে ভাসছিল লেগ্রাঁ, সচকিত হয়ে উঠল দরজা খোলার শব্দ পেয়ে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল।

বিশালদেহী একজন মানুষ এসে ঢুকেছে তার অফিসে। গ্লেসিয়ারে দেখা সেই ভুয়া সাংবাদিক! এই লোকই স্ট্রংবক্স ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, থেঁতলে দিয়েছিল ওর হাতের আঙুল।

ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল লেগ্রাঁর। না চেনার ভান করল লোকটাকে। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'ইয়েস? কী

করতে পারি আপনার জন্য?'

কয়েক পা এগিয়ে এল লোকটা। থমথমে গলায় বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'ইয়ে... জী না। এই অফিসে কাজ করেন?'

'কানের লতি যখন কেটে নেব, তখন বুঝবে আমি কোথায় কাজ করি।'

'প্লিজ,' অনুনয় করল লেগ্রাঁ, অভিনয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে, 'আমি কোনও ঝামেলা চাই না। কী চান আপনি আমার কাছে?'

'টিভিতে দেখেছি তোমাকে,' বলল লোকটা। 'গ্লেসিয়ারের তলায় অনেককিছু পেয়েছ বলে জানিয়েছ। আমি তো শুধু বাক্সটা নিয়েছি। আর কী ছিল ওখানে?'

নিচু গলায় নিজেকে শাপশাপান্ত করল লেগ্রাঁ। আল্পস্ থেকে ফেরার পর টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছে সে, গলাবাজি করে নিজেকে হিরো প্রমাণের চেষ্টা করেছে। একার চেষ্টায় বহু আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করেছে, সাহসিকতার সঙ্গে সঙ্গীদের উদ্ধার করে এনেছে... এসব বলেছে। ব্যাপারটা যে গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে, কে জানত!

'কথা বলো!' ধমকে উঠল বিশালদেহী।

'ইয়ে... আমি আসলে বাড়িয়ে বলেছি। মাত্র দুটো জিনিস পাওয়া গেছে ওখানে—বাক্স আর পুরনো একটা হেলমেট। আর কিছু না।'

'হেলমেটটা এখন কোথায়?'

'আমাদের সঙ্গের একটা মেয়ে ওটা বের করে নিয়ে এসেছে। ওর কাছেই আছে।'

'কে এই মেয়ে?'

নিষ্ঠুর এক আনন্দে লাফিয়ে উঠল লেগ্রাঁর হৃৎপিণ্ড। ভয়ঙ্কর বদমাশটাকে লুনার পিছনে লেলিয়ে দেয়ার সুযোগ দেখতে

পাচ্ছে। মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'ওর নাম লুনা পারসেল। আর্কিয়োলজিস্ট। এই বিল্ডিঙেই অফিস... তিনতলায়। রুম নাম্বার ২১৬।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনল। 'যা খুশি করতে পারেন ওকে নিয়ে। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

উল্টো ঘুরল বিশালদেহী। দরজার দিকে চলে যাচ্ছে। স্বস্তি অনুভব করল লেগ্রাঁ। যাক, ব্যাটার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়া গেছে।

ওর ধারণা ভুল। ডোরনবে হাত দিতে গিয়ে থেমে গেল লোকটা, লেগ্রাঁর দিকে ফিরল আবার।

'আর কিছু?' জানতে চাইল লেগ্রাঁ।

'হ্যাঁ... ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাকে মরতে হবে।'

পরমুহূর্তে জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে আনল বিশালদেহী। মৃদু শব্দ হলো, লেগ্রাঁর কপালে সৃষ্টি হলো তৃতীয় নয়ন। হুড়মুড় করে ডেস্কের উপর পড়ে গেল সে, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এখন শুধু খিঁচুনি দিচ্ছে দেহটা।

লাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না আততায়ী, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

চোদ্দ

রানার মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে একটা অ্যান্টিক বিমান,

পদার্থবিদ্যা আর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মনীতিকে অগ্রাহ্য করে ব্যালে নর্তকীর মত নেচে চলেছে আকাশের বুকে। প্যারিসের দক্ষিণে, এক টুকরো ঘেসো জমিতে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মুগ্ধ চোখে দেখছে যান্ত্রিক পাখিটার কসরত। এরিয়াল স্পাইরাল করল বিমান, তারপর হাফ-আপওয়ার্ড লুপ, সবশেষে হাফ রোল... নিখুঁত *ইমেলম্যান ম্যানুভার*-এর মাধ্যমে দিক পাল্টাল। নিজের অজান্তে হাততালি দিয়ে উঠল রানা।

একটু পরেই সজোরে ভূমির দিকে ছুটে এল বিমান। বাইসাইকেল-স্টাইল ল্যান্ডিং গিয়ার চুমো খেল মাটিকে। গোটা কাঠামো পিংপং বলের মত ড্রপ খেল কয়েকটা, তারপর গতি কমিয়ে হ্যাঙারের সামনে এসে থেমে গেল।

দুই ব্লেডের কাঠের প্রপেলারের ঘূর্ণন শেষ হতেই মাঝবয়েসী একজন রোগা-পাতলা মানুষ নেমে এলেন ছোট্ট ককপিট থেকে। গগলস্ খুলে হনহনিয়ে এগোলেন রানার দিকে। মুখভর্তি হাসি, যেন এইমাত্র বিশ্বজয় করে এসেছেন।

'প্লেনে একটাই মাত্র সিট বলে দুঃখিত, মসিয়ো রানা,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে পারলে খুব ভাল হতো।'

ছোট্ট বিমানটার দিকে তাকাল রানা। চোখ বোলাল বুলেট-আকৃতির ইঞ্জিন কাভার, কাঠ আর ফ্যাব্রিকের ফিউজলাজ, ত্রিকোণ টেইল ফিনের উপর। লেজের গায়ে কঙ্কালের খুলি আর হাড় আঁকা—জলদস্যুদের প্রতীক। ইংরেজি *এ* বর্ণের মত একটা ফ্রেম রয়েছে ককপিটের সামনে, ওয়ায়্যারের মাধ্যমে সেখান থেকে সাপোর্ট পাচ্ছে নড়বড়ে দুই ডানা।

'সম্মান জানিয়ে বলতে চাই, মসিয়ো ফাঁনু,' রানা বলল, 'আপনার বিমান যে একজনকে বহন করতে পারছে, সে-ই বেশি।'

সশব্দে অট্টহাসি করে উঠলেন ফরাসি এয়ার-হিস্টোরিয়ান। 'ভাল বলেছেন! যদিও কথাটা একেবারেই ভুল। অবশ্য এই মনোভাবের জন্য আপনাকে দোষ দেয়া যাবে না, *মোরান-সলনিয়ের* দেখে সত্যিই মনে হয়, কোনও স্কুলছাত্র তার বেজমেন্টে বসে ডিজাইনটা তৈরি করেছে। মাত্র বাইশ ফুট লম্বা, ডানার দৈর্ঘ্য সাতাশ ফুট। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই ছোট্ট পতঙ্গই তার যুগের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিমান ছিল। ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটতে পারে, নড়তে পারে অত্যন্ত দ্রুত। দক্ষ পাইলট এই বিমান নিয়ে জাদু দেখাত সেইকালে।'

এগিয়ে গিয়ে মোরানের গায়ে হাত রাখল রানা। বলল, 'ফিউজলাজ আর সিঙ্গেল উইং ডিজাইন দেখে খুব অবাক হয়েছি, জানেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবলে চোখের সামনে শুধু ভোঁতা নাক-অলা বাইপ্লেনের ছবি ভাসে।'

'তা অবশ্য ঠিক,' বললেন ফাঁনু। 'সে-আমলে বেশিরভাগ বিমানে জোড়া-ডানা থাকত। তবে ফরাসিরা মনোপ্লেন তৈরির ক্ষেত্রে বাকি পৃথিবীর চেয়ে এগিয়ে ছিল। মোরান-সলনিয়ের এককালে অ্যারো-ডাইনামিক্সের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বলে খ্যাতি পেয়েছিল।'

'অবাক হচ্ছি না, আপনার ইমেলম্যান ম্যানুভার-টা একেবারে নিখুঁত হয়েছে। যে-সে বিমানে এই খেলা দেখানো সম্ভব নয়।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। এই ছোট্ট বিমানটার ওজন হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি, একশো ষোলো হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ওড়ানোর চেয়ে নামানো কঠিন। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ল্যাণ্ডিঙের সময় আমার স্পিড অনেক বেশি ছিল।'

'ভয় পাচ্ছিলাম মুখ থুবড়ে পড়েন কি না।'

'অতীতে অনেকেই পড়েছে,' বললেন ফাঁনু। 'আমার জন্য তো কাজটা কঠিন ছিল না, অক্ষত একটা বিমান ল্যাণ্ড করিয়েছি। কিন্তু পুরনো আমলের পাইলটদের কথা ভাবুন... গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বিমান নিয়ে ল্যাণ্ড করতে হতো ওদেরকে। চ্যালেঞ্জ ছিল বটে সেটা!'

নস্টালজিয়ার ছোঁয়া পাওয়া গেল ভদ্রলোকের কণ্ঠে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফরাসি এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট ছিলেন জাভোয়া ফাঁনু, সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আকাশে। রিটায়ার করার পরও সেই আসক্তি কাটাতে পারেননি, একটা এয়ার-মিউজিয়াম খুলেছেন, সেখানে রাজ্যের বিমান। বর্তমানে দুনিয়ার সেরা এয়ার-হিস্টোরিয়ানদের একজন তিনি, এঁর কথাই বলেছিল বিউ মরটন। ফোনে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিয়েছে রানা, নুমার জাহাজ *স্টারফিশ* ভূমধ্যসাগরে পৌঁছুনোর পর চলে এসেছে প্যারিসে, মসিয়ো ফাঁনুর সঙ্গে দেখা করতে।

ডরমেয়ার লেকের তলায় পড়ে থাকা বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনিও একমত হয়েছেন বিউ মরটনের সঙ্গে—ওটা একটা *মোরান-সলনিয়ের।* বিমানটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে রানা, তাই ওকে এয়ার-মিউজিয়ামের হ্যাঙারে নিয়ে এসেছেন ফাঁনু, ওঁর সংগ্রহে একটা অক্ষত মোরান আছে। সেটাই উড়িয়ে দেখালেন ওকে।

ডেমোনস্ট্রেশন শেষ হয়েছে, রানাকে নিজের অফিসে নিয়ে গেলেন এয়ার-হিস্টোরিয়ান। কফি খেতে খেতে আলোচনায় বসল ওরা। টেবিলের উপর রানার তোলা ছবিগুলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ফাঁনু। যেগুলো দরকারি মনে হচ্ছে, স্ক্যান করে ঢোকাচ্ছেন কম্পিউটারে।

একটা ছবি হাতে নিল রানা, ভাঙাচোরা প্লেনটা দেখল, তারপর বলল, 'এই জঞ্জাল দেখে বিমানটাকে ঠিকমত

আইডেন্টিফাই করতে পারবে কেউ, তা ভাবতে পারিনি।'

কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন ফাঁনু। 'ভেঙেচুরে জঞ্জালই হয়ে গেছে বটে, প্রথম দর্শনে আইডেন্টিফিকেশনের অযোগ্য মনে হয়েছিল। হচকিস মেশিনগান চেনা যাচ্ছে, তবে ওটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশিরভাগ বিমানেই থাকত। আমার হাতে একমাত্র ক্লু ছিল ইঞ্জিন হাউজিঙের চোখা আকৃতিটা; তবে শেষ পর্যন্ত আরও ভাল একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলাম।' একটা ছবি বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'এটা দেখুন।'

চ্যাপ্টা, ভোঁতা একটা দণ্ড দেখা যাচ্ছে ওটায়, ডগাটা গোল। রানা বলল, 'প্রপেলার ব্লেড?'

'হ্যাঁ, তবে যে-সে প্রপেলার ব্লেড নয়। ভাল করে দেখুন—জিনিসটা কাঠের, কিন্তু একটা মেটাল প্লেট লাগানো আছে ওটার সঙ্গে।'

'কেন?'

'ডিফ্লেক্টর হিসেবে কাজ করার জন্য। ১৯১৪ সালে রেমণ্ড সলনিয়ের এক বৈপ্লবিক সিংক্রোনাইজিং গিয়ার আবিষ্কার করেন, ওটার কারণে ঘুরতে থাকা প্রপেলারের মাঝ দিয়েও হচকিস মেশিনগান ফায়ার করা যেত। পদ্ধতিটা চমৎকার, তারপরও বিপদ এড়াবার জন্য মেটাল ডিফ্লেক্টর বসিয়ে দেয়া হতো প্রপেলার ব্লেডের ভিতর দিকে—যাতে মিসফায়ার হওয়া অ্যামিউনিশন ব্লেডকে দু'টুকরো করতে না পারে।'

'গুড আইডিয়া।'

'নট রিয়েলি। রিকোশেট হওয়া বুলেটে কয়েকজন পাইলট মারা পড়ায় পুরো প্রজেক্টই বাতিল হতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত রোঁলা গাঁরো নামে এক বৈমানিক যোগ দেন সলনিয়েরের সঙ্গে। দু'জনে মিলে স্টিলের ডিফ্লেক্টর বসান মোরান-সলনিয়ের বিমানে—নতুন সেটআপে, যাতে রিকোশেটের বুলেট ককপিটের

দিকে না যায়। কৌশলটা কাজে লেগেছিল, কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়া রোঁলা গাঁরো তাঁর বিমান নিয়ে জার্মানদের বহু ক্ষতি করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওটা ক্র্যাশ করে শত্রুপক্ষের এলাকায়, তবে তাতে সিংক্রোইনাইজিং গিয়ারের দোষ ছিল না। জার্মানরা সেই নমুনা হাতে পেয়ে পরবর্তী সময়ে ফকারের সিংক্রোনাইজিং সিস্টেম ডেভেলপ করে।'

আরেকটা ছবি তুলে নিল রানা। 'এটা কী?' জানতে চাইল ও। ছবিতে মোরানের ভাঙা ককপিটের গায়ে একটা কমলা রঙের আয়তক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে। 'মেটাল প্লাক?'

'আপনার নজর খুব চোখা,' তারিফ করলেন ফাঁনু। 'প্লাক-ই বটে... ম্যানুফ্যাকচারারের কোড খোদাই করা। ওটা ইতিমধ্যে এনলার্জ করেছি আমি কম্পিউটারে, নাম্বারটা মিলিয়ে দেখেছি আমাদের মিউজিয়ামের ওউনারশিপ রেকর্ডের সঙ্গে।'

'মালিকের খোঁজ পেয়েছেন?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন ফাঁনু। 'মোট উনপঞ্চাশ-টা মোরান-সলনিয়ের তৈরি করা হয়েছিল। গাঁরো-র সাফল্য দেখে অন্যান্য ফরাসি পাইলটও আগ্রহী হয়ে উঠেছিল বিমানটার প্রতি। ব্রিটেন কিনেছিল কয়েকটা, রাশিয়াও। ফকারের চেয়ে ভাল পারফর্মেন্স ছিল ওটার। আপনি এই ধ্বংসাবশেষ আল্পসে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের লেকে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন ফাঁনু। 'অদ্ভুত ব্যাপার, কয়েক বছর আগে ওখানে যেতে হয়েছিল আমাকে—কয়েকটা পুরনো বিমানের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করতে। এভিয়াটাক মডেলের বিমান ছিল ওগুলো, রিকনিসান্স আর স্কাউটিঙের কাজে ব্যবহার হতো। কীভাবে ওগুলো ওখানে পৌঁছুল, তা জিজ্ঞেস করেছিলাম স্থানীয় লোকজনের কাছে। ওরা

বলল, বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছে বিমানে-বিমানে যুদ্ধ হয়েছিল বহু বছর আগে, এভিয়াটাকগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সম্ভবত ঘটেছে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে, সঠিক তারিখ পিনপয়েন্ট করতে পারিনি।'

'আমাদের মোরানের সঙ্গে সেই লড়াইয়ের সম্পর্ক আছে ভাবছেন?'

'সম্ভাবনা খুবই বেশি। একশো বছরের পুরনো এক রহস্য জড়িয়ে আছে এতে—থিয়োডর বুভারি-র রহস্যময় অন্তর্ধান! লোকটা আপনার ওই মোরানের মালিক।'

'থিয়োডর বুভারি? নাম শুনিনি কখনও।'

'ইয়োরোপের সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজন ছিল থিয়োডর। যদ্দূর মনে পড়ে, ১৯১৪ সালে লোকটা তার মোরান-সলনিয়ের সহ হারিয়ে যায়। শৌখিন পাইলট ছিল সে, বিমান নিয়ে নিজের এস্টেট আর আঙুর-বাগানের উপর ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত। সেটা করতে গিয়েই একদিন আর ফিরে আসেনি। প্রচুর তল্লাশি চালানো হয়েছে, কিন্তু লোকটার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। পরে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল, ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময় পায়নি কেউ।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আঙুর-বাগানের মালিক যুদ্ধবিমান ওড়াত কেন?'

'ওটা সাইড-বিজনেস। থিয়োডর বুভারি আসলে ছিল একজন আর্মস-ম্যানুফ্যাকচারার। যুদ্ধবিমানের শখ পূরণ করা তার জন্য কোনও ব্যাপারই না, ফরাসি মিলিটারির বেশিরভাগ অস্ত্র তার কোম্পানি সাপ্লাই দিত। কথা হচ্ছে, সে আল্পসে পৌঁছুল কীভাবে?'

'পথ হারিয়েছিল?'

'উঁহুঁ। মোরানের ট্যাঙ্কে যে-পরিমাণ ফুয়েল ধরে, তাতে

আল্পস্ পর্যন্ত পৌঁছুনো সম্ভব নয়। রিফুয়েলিং করতে হয়েছে। তার জন্য পূর্ব-নির্ধারিত প্ল্যান-প্রোগ্রাম প্রয়োজন।'

'তা হলে যাচ্ছিল কোথায়?'

'লেকটা সুইস বর্ডারের কাছে...'

'...আর গোপন ব্যাঙ্কিঙের জন্য সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হতে পারে না। হয়তো টাকাপয়সার লেনদেনের জন্য জুরিখে যাচ্ছিল।'

মাথা নাড়লেন ফাঁনু। 'থিয়োডর বুভারির মত লোক সশরীরে ওসব লেনদেন করে না। অন্য কোনও কারণ ছিল নিশ্চয়ই। গ্লেসিয়ারের ওই লাশটা দেখেছেন আপনি?'

'না, তবে দেখেছে, এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলল, পুরনো আমলের এভিয়েটরদের মত পোশাক ছিল গায়ে।'

'তা হলে একটাই ব্যাখ্যা—সুইটজারল্যাণ্ড যাবার পথে এক গ্রুপ এভিয়াটাকের হামলার শিকার হয় সে, প্লেনটা ক্র্যাশ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দেয় থিয়োডর, লাশটা আছড়ে পড়ে গ্লেসিয়ারে। ইশ্‌শ্... ওটা যদি পরীক্ষা করে দেখা যেত!'

'সম্ভব না,' হতাশ গলায় বলল রানা। 'টানেলটা রি-ওপেন করতে গেলে রীতিমত মহাযজ্ঞ দরকার।'

'বুভারিদের জন্য সেটা কোনও সমস্যা না। টাকার অভাব নেই ওদের।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'পরিবারটা এখনও আছে?'

'হ্যাঁ, তবে বোঝার উপায় নেই। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে, ভুলেও কোথাও দেখা দেয় না।'

'তাতে কোনও দোষ দেখছি না। অনেক ধনী পরিবারই প্রচারণা এড়িয়ে চলে।'

'ওদেরকে শুধু ধনী বললে অপমান করা হয়, মসিয়ো রানা,'

তিক্ত গলায় বললেন ফাঁনু। 'বুভারি পরিবারকে লোকে বলে মার্চেন্ট অভ ডেথ... মানে মৃত্যুর সওদাগর! শত শত বছর ধরে বিশাল স্কেলে অস্ত্রের ব্যবসা করছে ওরা... বংশ পরম্পরায়। টাকার চেয়েও বেশি ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার জোর।'

'শুনে মনে হচ্ছে জার্মানির বিখ্যাত ক্রুপ-পরিবারের ফরাসি ভার্শান।'

'ক্রুপ-দের সঙ্গে তুলনা করা হয় ওদেরকে, তবে আইরিন বুভারি তাতে বেজায় নাখোশ।'

'আইরিন?'

'থিয়োডর বুভারির বোন আইরিনের নাতনি। দাদীর নামেই নাম রাখা হয়েছে বলে শুনেছি। ডেনজারাস মহিলা... শক্ত হাতে ব্যবসা সামলাচ্ছেন। বিশ্বস্ত দু'চারজন ছাড়া আর কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে।'

'কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া যায় না?'

'অসম্ভব! লইয়ার, পাবলিক রিলেশন্স একজিকিউটিভ আর বডিগার্ডদের বলয় পেরিয়ে তাঁর নাগাল পাওয়া খুবই কঠিন।'

'আমার হাতে গোপন অস্ত্র আছে। মাদাম বুভারি নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষের পরিণতির খবর জানতে চাইবেন।'

'হুম, সেটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, দেখি কী করা যায়। ওই কোম্পানিতে আমার পরিচিত একজন ডিরেক্টর আছেন, তাঁকে বলে দেখব। আপনাকে পাবো কোথায়?'

'প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি, কয়েকদিন ওখানেই থাকব। আমার সেলফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'ঠিক আছে। কোনও খবর পেলে আপনাকে জানাব।'

একটা চিরকুটে নিজের নম্বর লিখে দিল রানা, তারপর উঠে

দাঁড়াল। ফাঁনু ওকে মিউজিয়ামের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। যাবার আগে হাত মেলাচ্ছে রানা, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, পুরো ব্যাপারটায় নুমা-র আগ্রহ কেন, সেটা জানতে পারি?'

'নুমার কোনও আগ্রহ নেই, আগ্রহটা আমার,' বলল রানা। 'আসলে... ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের ঘটনা একগাদা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে আমার মনে, সেগুলোর জবাব খুঁজছি।'

'তারমানে বুভারিদের সঙ্গে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করবেন? কোনও অফিশিয়াল চ্যানেলে এগোবেন না?'

'তাতে অসুবিধে আছে?'

সরাসরি জবাব দিলেন না ফাঁনু। বললেন, 'আমি বহুদিন মিলিটারিতে ছিলাম, মসিয়ো রানা; শক্ত লোক দেখলেই চিনতে পারি। সন্দেহ নেই, নিজেকে রক্ষা করতে জানেন আপনি, তবু অনুরোধ করব—বুভারি পরিবারের দিকে একটু বুঝেশুনে পা বাড়াবেন।'

'কেন? আমি তো ওদের ক্ষতি করতে যাচ্ছি না।'

'ওদের অতীত অন্ধকারে ঢাকা, মসিয়ো। সেই অতীত খোঁচাখুঁচি করতে চাইছেন... না চাইতেই হয়তো ক্ষতিকর কিছু বেরিয়ে আসবে। তাই বলছি, সাবধানে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ, কথাটা মাথায় রাখব আমি।' বলে বিদায় নিল রানা।

প্যারিসের পথে ড্রাইভ করতে করতে ফাঁনুর সতর্কবাণী নিয়ে ভাবল রানা। দুনিয়ার সমস্ত ধনী পরিবারেরই অন্ধকার ইতিহাস রয়েছে। বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্য আসে নারী-ব্যবসা, চোরাচালান, কিংবা সংঘবদ্ধ অপরাধের ভিত্তিমূল থেকে। বুভারিদেরও যে তেমন কোনও ইতিহাস আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথা হচ্ছে, সেটা কতখানি গুরুতর? অতীতকে ঢেকে রাখার জন্য ওরা

কতখানি মরিয়া হয়ে উঠতে পারে?

ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের ঘটনা কি বুভারিদের অতীত লুকানোর অপচেষ্টা? সেটা যথাসময়ে জানা যাবে। রানা শুধু এটুকু বুঝতে পারছে—রহস্যটা সমাধানের পথে বেশ খানিকটা এগোনো গেছে।

পনেরো

প্যান্থিয়নের দক্ষিণে, সরবোন সায়েন্স সেন্টারে লুনার অফিস। জায়গাটা নির্জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গোনা কিছু ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া বিল্ডিঙের আশপাশে চোখে পড়ে না কাউকে। কিন্তু আজ মোড় ঘুরতেই ভিড় দেখতে পেল ও। দুটো পুলিশ কার আড়াআড়িভাবে আটকে রেখেছে রাস্তা, বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েকটা। ইউনিফর্ম আর সাদা পোশাকে আইনরক্ষীরা গিজগিজ করছে সবখানে।

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল লুনা। কয়েক পা এগোতেই দশাসই চেহারার এক সার্জেন্ট পথরোধ করল। নেমটাগিতে নাম লেখা—পিয়েরে।

'দুঃখিত, মাদমোয়াজেল। আর এগোতে পারবেন না।'

'কী হয়েছে এখানে?'

'দুর্ঘটনা,' সংক্ষেপে জানাল সার্জেন্ট পিয়েরে।

'কী দুর্ঘটনা?'

কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট। 'আমি ঠিক জানি না।'

ব্যাগ থেকে নিজের আইডি কার্ড বের করল লুনা। লোকটার মুখের সামনে তুলে বলল, 'আমি এই বিল্ডিঙে কাজ করি, মসিয়ো। কী ঘটেছে, সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

আইডি-র সঙ্গে লুনার চেহারা মিলিয়ে দেখল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আপনি বরং আমাদের ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলুন।'

সাদা পোশাকে রয়েছেন ইন্সপেক্টর—মোটাসোটা, মাঝবয়েসী মানুষ। গায়ে একটা ওভারসাইজ ট্রেঞ্চকোট। একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দুজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর সামনে লুনাকে নিয়ে গেল পিয়েরে।

'এক্সকিউজ মি, সার। এই ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'কে আপনি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

আইডি বাড়িয়ে ধরল লুনা, নিজের পরিচয় দিল। 'লুনা পারসেল... আর্কিয়োলজিস্ট। এ-বিল্ডিঙেই আমার অফিস।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কার্ডটা দেখলেন ইন্সপেক্টর। লুনার নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন নোটবুকে। তারপর কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে খুলে ধরলেন গাড়ির পিছনের দরজা। বললেন, 'আসুন, গাড়িতে বসে কথা বলি।'

নড়ল না লুনা। 'কী ঘটেছে, সেটা আগে বলুন।'

'বলব, মাদমোয়াজেল। গাড়িতে বসুন।'

আর আপত্তি করল না লুনা, গাড়িতে উঠে পড়ল। ইন্সপেক্টরও উঠলেন, ওর পাশে বসে বন্ধ করে দিলেন দরজা। বললেন, 'আমি ইন্সপেক্টর জাঁ লুই, মাদমোয়াজেল পারসেল্। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না। অফিস-বিল্ডিঙে শেষ কখন এসেছিলেন আপনি?'

'সকালে। সারাদিনই ছিলাম। দুপুরের দিকে বেরিয়েছি।'

'কখন?'

ঘড়ি দেখল লুনা। 'তিন-চার ঘণ্টা আগে। বেশিও হতে পারে। কেন?'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একজন অ্যান্টিক-বিশেষজ্ঞের কাছে, পুরনো একটা আর্টিফ্যাক্ট দেখাতে। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে... বিশ্রাম নিতে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

নোট নিচ্ছেন ইন্সপেক্টর। লেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে যখন ছিলেন, অস্বাভাবিক কোনও কিছু চোখে পড়েছে?'

'না তো! কেন? কী হয়েছে?'

'একজন মানুষ খুন হয়েছে এখানে, মাদমোয়াজেল। গুলি করা হয়েছে তাকে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল লুনা। 'কে খুন হয়েছে?'

'ড. অগাস্টিন লেগ্রাঁ। আপনি তাঁকে চেনেন?'

'অবশ্যই! ভার্সিটিতে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমার ওপরতলাতেই ওঁর অফিস। লেগ্রাঁ... লেগ্রাঁ খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে। শেষ কবে মসিয়ো লেগ্রাঁকে দেখেছেন আপনি?'

'আজ সকালে... এলিভেটরে। কথা হয়নি অবশ্য। আমি একটু তাড়ায় ছিলাম।'

নার্ভাস বোধ করল লুনা। চেহারায় কি লেগ্রাঁর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে?

'মসিয়ো লেগ্রাঁর কোনও শত্রু ছিল কি না, জানেন? মানে... তাঁর ক্ষতি করতে চায়?'

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল লুনা। খামোকা মিথ্যে বলার মানে হয় না, লেগ্রাঁর যে শত্রুর অভাব ছিল

না, সেটা পুলিশ হয়তো ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে। বিশেষ করে ওর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা।

'মসিয়ো লেগ্রাঁ ছিলেন একজন বিতর্কিত মানুষ, ইন্সপেক্টর,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল লুনা। 'ওঁর কাজকর্ম বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করত না।'

'আর আপনি?'

'আমার কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নেই। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি—যে-পদে কাজ করতেন মসিয়ো লেগ্রাঁ, তার জন্য তিনি যোগ্য ছিলেন না।'

প্রথমবারের মত হাসি ফুটল ইন্সপেক্টর জাঁ লুইয়ের ঠোঁটে। 'খুব ডিপ্লোমেটিক উত্তর দিলেন, মাদমোয়াজেল! যা হোক, আপনার অ্যালিবাই চেক করে দেখব আমরা। কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তার ঠিকানা দিন।'

দেশমের দোকান আর নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা বলল লুনা, ইন্সপেক্টর সেগুলো লিখে নিলেন নোটবুকে। তারপর লুনাকে নিয়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। ভিজিটিং কার্ড দিলেন ওকে।

'ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল পারসেল। কিছু মনে পড়লে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না। আপনি এখন যেতে পারেন।'

লুনা নিচু গলায় বলল, 'ইয়ে... যদি কিছু মনে না করেন, ইন্সপেক্টর, আমি কি আমার অফিসে যেতে পারি? জরুরি কিছু কাগজপত্র রয়ে গেছে, ওগুলো না আনলেই নয়।'

'ঠিক আছে, তবে আমার লোক থাকবে সঙ্গে।'

গলা চড়িয়ে সার্জেন্ট পিয়েরেকে ডাকলেন ইন্সপেক্টর। লুনার সঙ্গে যেতে বললেন তাকে।

হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকাল লুনা। প্যারিসের সমস্ত পুলিশ যেন জড়ো হয়েছে এখানে। লেগ্রাঁ একটা তৃতীয় শ্রেণীর

লম্পট হলেও উপরমহলে বেশ দহরম-মহরম ছিল। ডরমেয়ার গ্রেসিয়ারের ঘটনার পর টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েও মোটামুটি নাম করে ফেলেছিল। সন্দেহ নেই, তার হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাতামাতি করবে মিডিয়া; তাই কর্মতৎপরতা দেখানোয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পুলিশ।

বিল্ডিঙের ভিতরেও চলছে এলাহী কারবার। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোকজন ফিঙ্গারপ্রিন্টের খোঁজে ডাস্টিং করছে, পুলিশ ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে সব কামরার, ডিটেকটিভরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিল্ডিঙের লোকজনকে। এলিভেটর বন্ধ, সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে এল লুনা, নিজের অফিসে ঢুকল। সবকিছু ঠিকঠাক আছে ভিতরে, কিন্তু কেন যেন খটকা লেগে উঠল ওর।

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল লুনা, কাগজপত্র দেখল। তারপর গেল বুকশেলফের কাছে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, ওর অনুপস্থিতিতে এখানে ঢুকেছিল কেউ। দক্ষ হাতে তল্লাশি চালিয়েছে পুরো কামরায়, তারপর আবার সবকিছু গুছিয়ে রেখেছে আগের জায়গাতে। নিখুঁত কাজ; ভুল করেছে শুধু বুকশেলফে এসে, কয়েকটা বইয়ের সিরিয়াল ঠিক রাখতে পারেনি, এলোমেলো হয়ে গেছে লুনার কালেকশন। ওটা দেখেই অচেনা অনুপ্রবেশকারীর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে ও।

'কোনও সমস্যা, মাদমোয়াজেল?' পিছন থেকে বলে উঠল সার্জেন্ট পিয়েরে।

সংবিৎ ফিরে পেল লুনা। 'কী... না। কিছু না।' বুক ধক ধক করছে ওর। তাড়াতাড়ি ডেস্ক থেকে কয়েকটা ফাইল তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস থেকে। এসকর্ট করে ওকে বিল্ডিং থেকে বের করে আনল সার্জেন্ট পিয়েরে, পুলিশ কর্ডন পেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার্জেন্ট,' মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে গাড়িতে চড়ল লুনা। স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর, ইচ্ছে করছে অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে উড়ে চলে যায়। অফিসের সীমানা থেকে যত দ্রুত সরে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওর রুমে কে ঢুকেছিল। লেগ্রাঁর খুনি! হেলমেটের খোঁজে! এখনও হয়তো লোকটা বিল্ডিঙের আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। একবার ভাবল পুলিশের কাছে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কিছু বলতে গেলে হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, পুলিশ ওকে লেগ্রাঁর হত্যাকারী বলেও সন্দেহ করে বসতে পারে। তা যদি না-ও করে, হেলমেটটা নিশ্চয়ই এভিডেন্স হিসেবে চেয়ে বসবে। ওটার রহস্য আর ভেদ করা হবে না। কাজেই... পুলিশের চিন্তা বাদ! রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল লুনা, খুনি ওর পিছু নেয়নি তো!

আয়না দেখে কিছু বোঝা গেল না, তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে প্যারিসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঘুরল ও। অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার যে-সব কৌশল টিভি-সিনেমাতে দেখেছে, সব খাটাল। কাজে লাগল কি না কে জানে, তবে মনে খানিকটা শান্তি পেল। শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি ফিরল, তখন সূর্য পাটে বসেছে।

সন্ত্রস্ত হরিণীর মত বিল্ডিঙে ঢুকল লুনা, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল তিনতলায়। চাবি বের করে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে যেতেই থমকে গেল, পাল্লাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। বুকের ধুকপুকানি ফিরে এল প্রবল প্রতাপে, লুনা বুঝতে পারল—অফিসের মত এখানেও কেউ হানা দিয়েছে। লোকটা এখনও আছে কি না কে জানে, লুনার উচিত উল্টো ঘুরে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কেন যেন নড়তে পারল না ও, ভয়ের পাশাপাশি

এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে শুরু করেছে। হচ্ছেটা কী? কেন ওরা ওর পিছু নিয়েছে এভাবে? এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

সন্তর্পণে পাল্লাটা আরেকটু ফাঁক করল ও, পা টিপে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টে। লিভিংরুমের দোরগোড়ায় গিয়ে থামল। এবার আর গোছানোর ঝামেলায় যায়নি অচেনা শত্রু, পুরো বাড়ি ওলট-পালট করে ওভাবেই ফেলে রেখেছে। লিভিংরুম তছনছ করা হয়েছে—এমনকী কার্পেট গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সব ক'টা পেইন্টিং। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ভাঙাচোরা ফার্নিচার আর ছড়ানো-ছিটানো অর্নামেন্টের ভেতর দিয়ে হাঁটছে লুনা। সাবধানে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে পোকার-রড তুলে নিল হাতে—অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। তারপর অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল।

বেডরুমটাও বাদ দেয়া হয়নি। ওর সমস্ত কাপড়চোপড় মেঝেতে পড়ে আছে, কাবার্ডের দরজাগুলো খোলা। একটা কাবার্ডের দরজা কজা সহ খুলে ফেলা হয়েছে। বিছানাটা ওল্টানো, চাদর আর বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিল খালি করে ফেলা হয়েছে, কসমেটিকস আর পারফিউমের বোতল সবক'টা ভাঙা। প্যাসেজ ধরে বড় কামরাটার দিকে এগোল লুনা। ওটাই ওর স্টাডি আর ওঅর্কশপ।

এখানেও সব ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়েছে, তবে প্রথমেই লুনার চোখ পড়ল ওর শখের চিনামাটির অ্যান্টিক মূর্তিগুলোর উপর। ওগুলোর উপর যেন মনের ঝাল মেটানো হয়েছে। কাঠের স্ট্যান্ডটা ভেঙে দু'টুকরো করা হয়েছে, মূর্তিগুলো অকারণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কামরার চারদিকে। ঝুঁকে একটা মূর্তি তুলে নিল লুনা। মোচড় দিয়ে ওটার ঘাড় ভাঙা হয়েছে। কী নির্মম! কষ্ট চাপা দিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ও। সম্ভবত হাতুড়ি

দিয়ে বাড়ি মেরে চুরমার করা হয়েছে ওর পি.সি। মনিটরের স্ক্রিন ফেটে চৌচির, মেইনফ্রেম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। দেখে বোঝা যায়, আর মেরামত করা যাবে না। দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের সব জিনিস মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

পিছনে কাঠের মেঝে মড়মড় করে উঠল, কেউ পা ফেলছে তাতে। পাঁই করে উল্টো ঘুরল লুনা, আঘাত করার ভঙ্গিতে উঁচু করে ফেলেছে হাতের পোকারটা। আঁতকে উঠল আগন্তুক, সভয়ে বলল, 'অ্যাই, অ্যাই... মাথা ফাটিয়ে দেবে নাকি!'

হাত থেকে পোকার ফেলে দিল লুনা। 'রানা! থ্যাঙ্ক গড ইউ আর হিয়ার!'

স্বভাবজাত হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রানার মুখ। 'খুশি হয়েছ? তা হলে মাথা ফাটাতে গেলে কেন?'

'তুমিই বা চোরের মত ঢুকেছ কেন? আমি আরেকটু হলে হার্টফেল করতাম!'

'অনুপ্রবেশের জন্য দুঃখিত। কিন্তু দরজা খোলা পেয়েছি, ভিতরের দশা দেখা যাচ্ছিল করিডোর থেকে, তাই কৌতূহল সামলাতে পারলাম না।' কামরার দিকে ইশারা করল রানা। 'আমার জানা ছিল না, প্যারিসে টর্নেডো হয়।'

'ঠাট্টা করছ?' উল্টে থাকা একটা চেয়ার সোজা করে বসে পড়ল লুনা। 'দিস ইজ সিরিয়াস, রানা!'

'সরি, তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'আমার ধারণা, লেগ্রাঁকে যে-লোক খুন করেছে, সে-ই হানা দিয়েছিল এখানে। আমার অফিসেও তল্লাশি চালিয়েছে।'

'লেগ্রাঁ? মানে... গ্লেসিয়ারে তোমার সঙ্গে আটকা পড়া সেই ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ। অফিসে ঢুকে গুলি করা হয়েছে ওকে।'

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। চকিতে চারপাশে নজর বোলাল। 'সবগুলো রুম চেক করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ... বাথরুম বাদে।'

'এখানেই থাকো,' বলল রানা। 'আমি দেখে আসছি।'

পিস্তল নেই ওর সঙ্গে। আজকাল অস্ত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট পেরুনোয় হাজারটা ঝামেলা—লাইসেন্স থাকুক, বা না থাকুক। কাস্টমসে অকারণ হেনস্থা এড়াবার জন্য পিস্তল আনেনি ও ফ্রান্সে ঢোকার সময়, ভেবেছিল রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জনের কাছ থেকে একটা চেয়ে নেবে। সময়ের অভাবে সেটা করা হয়নি, দরকার হবে বলেও ভাবেনি। এখন রানা নিরস্ত্র। কী আর করা, আত্মরক্ষার জন্য মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল পোকারটা।

পা টিপে টিপে বাথরুমে গেল ও, ফিরে এল দু'মিনিট পরে। মুখ থমথম করছে। বলল, 'ধরে নিচ্ছি তুমি সিগারেট খাও না।'

'ঠিকই ধরেছ,' লুনা ভুরু কোঁচকাল। 'কেন?'

'বাথটাবে অনেকগুলো পোড়া সিগারেট পড়ে আছে। কেউ তোমার অপেক্ষায় বসে ছিল ওখানে।'

'চলে গেল কেন?'

'কে জানে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল।'

'খুব বেশি সময় তো বাইরে ছিলাম না আমি। বড়জোর দু-আড়াই ঘণ্টা।'

'হোয়াটএভার। চলে গেছে, সেটাই বড় কথা।' আরেকটা চেয়ার সোজা করল রানা, বসল ওতে। 'লেগ্রাঁ সম্পর্কে বলো। কী জেনেছ ওর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে?'

সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল লুনা। সবশেষে যোগ করল, 'আমার মনে হচ্ছে, ওই হেলমেটটাই সব নষ্টের

গোড়া। ওটার জন্য ঘটছে এতকিছু। নাকি ভুল করছি কোথাও?'

'উঁহুঁ, আর কোনও ব্যাখ্যা নেই এর পিছনে,' রানা একমত হলো। 'তোমার এখান থেকে কোনও কিছু হারিয়েছে?'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্রের দিকে তাকাল লুনা। 'বলা মুশকিল।'

রানাও চোখ বোলাচ্ছে কামরার ভিতর। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে ঢোকার পর আন্সারিং মেশিন চেক করেছ তুমি?' জিনিসটার উপর দৃষ্টি আটকে গেছে ওর।

'না... সময় পেলাম কোথায়? কেন, কী হয়েছে?'

'বাতি জ্বলছে না ওটায়।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আসার পথে গাড়ি থেকে ফোন করেছিলাম আমি। তুমি ছিলে না, মেশিনে রেকর্ড হয়েছে কলটা। যদি ওটা চেক করে না থাকো, তা হলে নতুন মেসেজের বাতি জ্বলছে না কেন?'

দু'জনে এগিয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা যন্ত্রটার দিকে। ডিসপ্লের দিকে তাকাল লুনা। হিস্ট্রিতে চারটা মেসেজ দেখতে পেল। বাড়ি ছেড়ে বেরুনোর সময় ছিল দুটো। মানে দুটো কল এসেছে ওর অনুপস্থিতিতে।

'শুধু তোমারটা না, আরও একটা কল এসেছিল। দুটোই চেক করা হয়েছে।' বলল ও।

'কে করেছে আরেকটা কল?'

প্লে বাটন চাপল লুনা। স্পিকারে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'লুনা, দিদিয়ের দেশম বলছি। ইয়ে... একটা কথা... হেলমেটটা আমি আমার ভিলায় নিয়ে যেতে চাই। কোনও অসুবিধে নেই তো? জিনিসটা রীতিমত চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে আমার কাছে, রাত জেগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব ভাবছি। আপত্তি থাকলে ফোন কোরো আমাকে। গুডবাই!'

'হা যিশু!' লুনার মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। 'আমার জন্য যে অপেক্ষা করছিল, সে শুনতে পেয়েছে মেসেজটা। সেজন্যই লোকটা চলে গেছে, রানা। আমাকে আর দরকার ছিল না তার, হেলমেটের খোঁজ পেয়ে গেছে!'

'এই দিদিয়েরে দেশমের কাছেই ওটা দিয়ে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। ওর দোকানে।'

মেঝেতে স্তূপ হয়ে থাকা কাগজপত্র ঘেঁটে নিজের টেলিফোন বুক বের করল লুনা। দেশমের ঠিকানা আর ফোন নম্বর যে-পাতায় লিখে রেখেছিল, সেটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'ঠিকানা পেয়ে গেছে বদমাশটা, ওখানেই গেছে!'

'দেশমকে সতর্ক করে দাও। বলো গা-ঢাকা দিতে।'

টেলিফোন তুলে ডায়াল করল লুনা। ওপাশে রিং হচ্ছে, কিন্তু জবাব দিচ্ছে না কেউ।

'আমার মনে হয় পুলিশে খবর দেয়া ভাল,' বলল রানা।

'দিদিয়ের সেটা পছন্দ করবে না। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে নানা রকম কাজ করে ও, পুলিশ গিয়ে ওর দোকানে নাক গলাক... এটা কখনোই চাইবে না।'

'জান নিয়ে টানাটানি... তাও তুমি এ-কথা বলছ?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল লুনা। 'হয়তো খামোকা ভয় পাচ্ছি। দিদিয়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এমনটাও তো হতে পারে।'

'আমি অতটা আশাবাদী হতে পারছি না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'দোকানটা কোথায়?'

'*ল্য রিভ দোয়াত*-এ। ট্যাক্সিতে দশ মিনিটের পথ।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। দশ মিনিট না, পাঁচ মিনিটে পৌঁছুতে পারব ওখানে। চলো!'

ছুটল রানা-লুনা।

ষোলো

দেশমের অ্যান্টিক শপের ভিতরে কোনও আলো জ্বলছে না, দরজা তালাবন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল লুনা। রানাকে বলল, 'দিদিয়েরের ওঅর্কশপে বাতি জ্বলছে, পর্দার তলা দিয়ে আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'হুম, কেউ আছে ওখানে,' বলল রানা। 'ভিতরে চলো।'

'কীভাবে? দরজার চাবি নেই আমাদের কাছে।'

'কে বলল নেই?' হাসল রানা। 'একটা হেয়ারপিন দাও।'

চুল থেকে একটা হেয়ারপিন খুলে দিল লুনা। সেটা চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। একটু পর খুট করে শব্দ হলো—দরজা খুলে গেছে।

'ইয়াল্লা!' বিস্মিত গলায় বলল লুনা। 'তুমি দেখি তালার জাদুকর।'

'তা-ও ভাল। ভয় পাচ্ছিলাম সিঁধেল চোর ভেবে বসো কি না।'

পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল লুনা।

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের সামনে আঙুল তুলল রানা। 'শব্দ কোরো না।'

সন্তর্পণে দোকানে ঢুকল দু'জনে। নিঃশব্দে পেরুল সামনের অংশ, তারপর পর্দা সরিয়ে পা রাখল দেশমের ওঅর্কশপে...

এবং থমকে গেল। দৃশ্যটা থমকে যাবার মতই বটে।

নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে বসানো হয়েছে মাঝবয়েসী অ্যান্টিক ডিলারকে, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, সেজদার ভঙ্গিতে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে একটা কাঠের বাক্সের উপরে—মধ্যযুগে গর্দান দেয়ার সময় এভাবেই চপিং ব্লকের উপর মাথা রাখতে হতো দণ্ডিত মানুষদের। দৃশ্যটা আরও বাস্তব করে তুলেছে বিশালদেহী এক লোক... অনায়াসে মানব-দৈত্য বলা যায় তাকে। জল্লাদের ভঙ্গিতে দেশমের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে—হাতে তলোয়ার, কোপ দিতে উদ্যত। শুধুমাত্র মোমের জাদুঘরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।

আচমকা রানা আর লুনাকে উদয় হতে দেখে একটুও চমকাল না দৈত্য, কাঁপল না একটা পেশিও। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল কেবল। বলল, 'স্বাগতম! যেখানে আছ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, বাছারা। খবরদার, কোনও চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলে তোমাদের বন্ধু গর্দান হারাবে।'

অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরুল লুনার গলা থেকে। রানা নির্বিকার রইল, তাকাল দেশমের দিকে। ভালই মার খেয়েছে বেচারা। জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে আছে, বুজে গেছে একটা চোখ। প্রতিপক্ষকেও যাচাই করল ও—অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না, সারা গায়ে কিলবিল করছে পেশি, চোখের তারায় নিষ্ঠুরতা। এক নজরেই বোঝা গেল, কঠিন মাল। লুনার কাছে বর্ণনা শুনেছে, তাই বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই লোকই ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে হানা দিয়েছিল।

'আমরা বোকা-সোকা মানুষ,' হালকা গলায় বলল রানা। 'চালাকি কাকে বলে, সেটাই জানি না।'

ওকেও ইতিমধ্যে যাচাই করে ফেলেছে দৈত্য। ঠাট্টা-মশকরায় তাই প্রভাবিত হলো না। তলোয়ারটা ধীরে ধীরে দেশমের ঘাড়ের পিছনে ঠেকাল সে। বলল, 'নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবছ, না?'

'উঁহুঁ। ভাবছি তুমি কেন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছ। মাঝবয়েসী একজন মানুষকে খালি হাতে ট্যাকেল করতে কষ্ট হচ্ছে?'

'ওকে একটু সবক দেয়া দরকার,' বলল দৈত্য, তলোয়ারের হালকা খোঁচা দিল দেশমকে। 'কিছুতেই বলছে না, আমি যে-হেলমেটটা চাইছি, সেটা কোন্‌টা।'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেয়ালে লাগানো শো-কেসের দিকে তাকাল রানা। অনেকগুলো শিরোস্ত্রাণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। দৈত্য জানে না, এর মধ্যে কোন্‌টা ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দেশমের তারিফ করল রানা মনে মনে। বুদ্ধিমান লোক... বুঝতে পেরেছে, হেলমেটটা চিনিয়ে দেয়ামাত্র তাকে খুন করবে শয়তানটা। তাই মার খেয়েও মুখ বন্ধ রেখেছে।

'অ! এই ব্যাপার?' বলল রানা। 'একটাও ফিট হচ্ছে না? তোমার মাথা বুঝি বড্ড বেশি মোটা?'

কথাটা শুনে বিশালদেহীর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। 'মুখ সামলে কথা বলো, মসিয়ো।'

'ঠিক আছে, সামলেই বলছি। ভাল চাও তো এখান থেকে চুপচাপ কেটে পড়ো। হেলমেটটা পাচ্ছ না তুমি।'

মুখে টিটকিরি মেরে চলেছে রানা, কিন্তু মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছে পিস্তল আনেনি বলে। খালি হাতে এই দানবকে মোকাবেলা করা এককথায় সম্ভব নয়। চঞ্চল চোখে কামরার উপর নজর বোলাল—যদি একটা অস্ত্র পাওয়া যায়!

রানার অসহায়ত্ব দৈত্যও সম্ভবত আঁচ করতে পারছে, তাই ওকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল। লুনাকে বলল, 'এই যে মিস আর্কিয়োলজিস্ট! তুমিই হেলমেটটা গ্লেসিয়ার থেকে এনেছ, তাই না? তুমি এখন ওটা চিনিয়ে দেবে আমাকে।'

রানা পাশে থাকায় কিছুটা সাহস পাচ্ছে লুনা, সরোষে বলল, 'কক্ষনো না! তুমি একটা খুনি... লেগ্রাঁকে খুন করেছ...'

'ওই শুঁয়োপোকার জন্য মায়াকান্না কেঁদো না। তোমার খবর তো আমাকে ও-ই দিয়েছে।' তলোয়ারটা একটু তুলল দৈত্য। 'এখন ভালয় ভালয় হেলমেটটা দেখিয়ে দাও আমাকে। তা হলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

'জ্যান্ত, না মৃত অবস্থায়?' বাঁকা সুরে বলল রানা। কয়েক ফুট দূরে... দেয়ালে ঝোলানো একটা ব্যাটল-অ্যাক্সের উপর দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর। লঘু পায়ে হেঁটে ওদিকে গেল ও, প্রতিপক্ষ মুখ খোলার আগেই কুঠারটা এক ঝটকায় নিজের হাতে তুলে নিল।

'ফেলো ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য।

'না,' শান্ত গলায় বলল রানা, লোকটার দিকে ফিরল। 'ফেলবে তো তুমি! তলোয়ারটা!'

'আমাকে ফেলতে বলছ?' তলোয়ার উঁচু করে ধরল দৈত্য। 'তা হলে তো মসিয়ো দেশমের মাথাটাই ফেলে দিতে হয়!'

'ফেলতে পারো,' কাটা কাটা স্বরে বলল রানা। 'কিন্তু আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তোমার মাথাও ওটার পাশে গড়াগড়ি খাবে।'

হুমকিটা জোরালো করার জন্য কুঠারটা সামনে বাগিয়ে ধরল ও। আদ্দিকালের অস্ত্র, কিন্তু ভয় জাগানো চেহারা। কার্বন-স্টিলে তৈরি ফলাটা চওড়া, ডগা ছুঁচালো—বর্শার মতও ব্যবহার করা যায়। ফলার পিছনদিকে একটা চোখা গজাল বেরিয়ে আছে। কাঠের হ্যাণ্ডেলটা খাঁজ কাটা, হাতের তালু ঘামে ভেজা থাকলেও

যেন মুঠো না পিছলায়।

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল দৈত্য। রানার অবিচল কণ্ঠ বলে দিচ্ছে, ও বেঁচে থাকতে দেশম বা লুনার ক্ষতি হতে দেবে না। তারমানে তিনজনের মধ্যে আগে রানাকেই খতম করতে হবে তাকে, পরে বাকিরা। রানাও তা-ই চাইছে, মনে মনে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো ও।

দেশমের পিছন থেকে সরে এল দৈত্য, আচমকা ছুটে এসে তলোয়ার চালাল রানাকে লক্ষ্য করে। এতবড় দেহ নিয়ে লোকটা এমন দ্রুততায় নড়তে পারে, সেটা কল্পনাই করতে পারেনি ও। কোনোমতে কুঠারটা মাথার উপর তুলে আঘাত ঠেকাল।

লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষে ফুলকি উঠল। কেঁপে উঠল রানা—আঘাতের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে ওর হাতের পেশিতে। আরেকটু হলে খসে পড়ছিল কুঠারটা।

তৈরি হবার সময় পেল না, আবার তলোয়ার চালাল দৈত্য। আগের মতই সেটা ঠেকাতে বাধ্য হলো রানা, তবে হাতের কাঁপুনি থামার অপেক্ষা না করে দ্রুত পিছিয়ে গেল দু'পা। হিংস্র হাসি ফুটল দৈত্যের ঠোঁটে। মাথার উপর বনবন করে তলোয়ার দু'পাক ঘুরিয়ে আচমকা সামনে বাড়ল। তবে এবার তৈরি আছে রানা, ঠেকাবার চেষ্টা করল না, পাশ থেকে কোপ মারার ভঙ্গিতে ঘোরাল কুঠার, সেটার গায়ে বাড়ি খেয়ে সরে গেল তলোয়ারটা। বেসামাল হয়ে গেল দৈত্য। লোকটার পেট লক্ষ্য করে কোপ মারল রানা। ক্ষিপ্র গতিতে কোমর দুলিয়ে ফলার সামনে থেকে সরে গেল দৈত্য, নইলে পেট দু'ফাঁক হয়ে যেত।

ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে রানা। বুঝতে পারছে, মধ্যযুগের লড়াইয়ে পেশিশক্তি কতটা জরুরি ছিল। কুঠারটা ভীষণ ভারী, হাতে ধরে রাখাই মুশকিল। দু'টো মাত্র কোপ মেরেছে ও, তাতেই শক্তি ফুরিয়ে গেছে, টনটন করছে বাইসেপ।

কুঠারের ওজনে আরেকটু হলে হাত থেকে ছিটকে যাচ্ছিল। টলমল পায়ে কোনোমতে ব্যালান্স রক্ষা করেছে।

রানার বেসামাল অবস্থা দেখে দেরি করল না দৈত্য, আবার আক্রমণ করল—ঠাণ্ডা মাথায়, নিখুঁতভাবে। পিছু হটল রানা, তবে এবার জায়গা ছাড়ছে থেমে থেমে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে। ঠেকানোর পরপর পাল্টা আঘাত খুবই কম করল, যা-ও বা করল তা শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্যে, ঠিক ক্ষতি করার জন্যে নয়। কুঠারের ওজনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে চাইছে। বুঝতে পারছে, ছুটে গিয়ে হামলা করাটা হবে পাগলামি... স্রেফ আত্মহত্যা।

পরের পর্বটা দীর্ঘ ও দর্শনীয় হলো, মেপে মেপে তলোয়ার চালাল দৈত্য, ফেন্সিঙে তার দক্ষতার প্রমাণ রাখল। সাড়া দিল রানা, উৎসাহিত করতে চাইছে, জানে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পেরে গর্ববোধ করছে প্রতিপক্ষ। দু'বার তার ডগা টার্গেট স্পর্শ করল। অবশেষে রানা যখন লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে চলে এল, দেখা গেল ওর বুকের উপরে লাল একটা ফুল ফুটেছে, আর কুৎসিত একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে পাঁজর বরাবর।

চোখ সরু করে রানাকে এক মুহূর্ত দেখল দৈত্য, কর্কশ চেহারায় আক্রোশ, সেইসঙ্গে মেশানো রয়েছে ক্ষীণ শ্রদ্ধার ভাব। এত আঘাতের পরও হালকা-পাতলা লোকটা টিকে থাকবে, সেটা আশা করেনি। প্রতিপক্ষের এই বিস্ময়টুকু কাজে লাগাল রানা, এবং এই প্রথম আক্রমণে গেল। কুঠারটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে বুঝে গেছে। ছোট ছোট কোপ আর গুঁতোই সবচেয়ে ভাল মুভ ওর জন্য—তাতে বেশি শক্তি খরচ হয় না।

সামান্য বিস্মিত হলো দৈত্য। হামলা প্রতিহত করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্প পরিসরে রানার হাতে ঘুরন্ত কুঠারের উপরের অংশ আঘাত হানল... আঘাত হানল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের সবচেয়ে

দুর্বল অংশে, ডগা থেকে খানিক নীচে। ব্যাটল-অ্যাক্সের ডগা আর ফলার মাঝখানের খাঁজে তলোয়ারটা আটকে ফেলল রানা, আটকে নিয়ে টান দিল, ঝাপটা খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল তলোয়ারের ডগা। দ্রুতই প্রতিক্রিয়া দেখাল দৈত্য। এখন পিছু হটলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে, ফলে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে না রানা। তার বদলে সামনে বাড়ল সে, দুটো শরীর প্রায় এক হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকল ওরা, দুটো মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান, শরীরের মাঝখানে আটকে আছে অস্ত্রদুটো। ঠিক এই সময় একটা হাঁটু ভাঁজ করে ওপরে তুলল রানা, সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁতো মারল প্রতিপক্ষের দুই উরুর সন্ধিতে।

জান্তব এক গোঙানি বেরিয়ে এল বিশালদেহী লোকটার গলা চিরে। পিছিয়ে গেল, স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের ফলে দু'হাত চলে গেল আহত জায়গাটার দিকে, হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়েছে। পরমুহূর্তে টের পেল, কতবড় ভুল করে ফেলেছে। রানার কুঠার এখন মুক্ত, সজোরে ছুটে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে। খপ্ করে কুঠারের ফলা আর হাতল ধরে ফেলল সে, নিজের প্রাণ বাঁচাল।

লোকটার শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। শুধু গায়ের জোরে ওর ফুল-সুইং ঠেকিয়ে দিয়েছে ব্যাটা, বজ্রমুঠিতে আটকে পড়া কুঠারটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। যেন কুস্তিতে মেতে উঠল দুজনে—ব্যাটল-অ্যাক্স নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মানতে বাধ্য হলো রানা, দানবের সঙ্গে পেরে উঠল না শক্তিতে। এক ঝটকায় কুঠারটা কেড়ে নিল সে ওর হাত থেকে, পরমুহূর্তে বুক বরাবর জোর ধাক্কা খেয়ে

ছিটকে পড়ল রানা মেঝেতে। মাথা ঠুকে যাওয়ায়, চকিতের জন্য আঁধার দেখল চোখে। যখন দৃষ্টি ফিরে পেল, আঁতকে উঠল ও। মেইল-ট্রেনের মত ছুটে আসছে দৈত্য, দু'হাতে মাথার উপর ধরে রেখেছে কুঠার... এক কোপে রানাকে ফেড়ে ফেলবে চেলা কাঠের মত।

অস্থির হলো না রানা, দুই হাঁটু ভাঁজ করে ফেলল, যেন ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। লোকটা নাগালের মধ্যে পৌঁছুতেই সজোরে ছুঁড়ল জোড়া-পা। দৈত্যের বুকের নিম্নাংশে হাতুড়ির মত আঘাত করল ওর জুতোর তলা। মড়মড় করে মৃদু শব্দ হলো, সম্ভবত পাঁজরের হাড় ভাঙল কয়েকটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল দৈত্য, উড়ে গিয়ে পড়ল হেলমেট-ভর্তি শো-কেসের গায়ে। কাঠ আর কাঁচ ভাঙল বিকট শব্দে, হুড়মুড় করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শিরোস্ত্রাণ... সঙ্গে বিশালদেহী লোকটা। কাশল সে, তাজা রক্ত উঠে এল মুখে। তার একটা ফুসফুস পাংচার করে দিয়েছে পাঁজরের ভাঙা হাড়।

চরম অবিশ্বাসে রানার দিকে তাকাল দৈত্য। এতক্ষণে টের পেয়েছে, অর্ধেক-সাইজের যুবকটিকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে বিরাট ভুল করে ফেলেছে সে। হাতের কুঠারটা ফেলে দিল তাই, কোটের ভিতর থেকে বের করে আনল নিজের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। আর কোনও ঝুঁকি নেবে না।

অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দেখতে পেল রানা—গুলি খেয়ে এখুনি মারা যাবে ও। কিছু করার নেই। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, শরীর শক্ত করে ফেলল বুলেটের আঘাত সহ্য করার জন্য।

কিন্তু গুলি করল না দৈত্য। তার বদলে বাতাসে শিস কাটার একটা শব্দ ভেসে এল কানে। বিস্মিত চোখে লোকটার পিস্তল ধরা হাত এঁফোড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে দেখল রানা - কোথেকে যেন একটা তীর ছুটে এসেছে! আর্তনাদ করে

আগ্নেয়াস্ত্রটা ফেলে দিল দৈত্য। মাথা ঘোরাতেই লুনাকে দেখতে পেল রানা—হাতে একটা প্রাচীন ক্রসবো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডিসপ্লে থেকে বের করে নিয়েছে অস্ত্রটা। বিশালদেহীও তাকিয়েছে ওদিকে। প্রবল আক্রোশে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রসবো-তে আরেকটা তীর লোড করল লুনা।

বেকায়দা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না দৈত্যের। উল্টো ঘুরেই ছুট লাগাল। রানা ডাইভ দিল লোকটার পা লক্ষ্য করে—আটকে ফেলতে চায়। কিন্তু লাভ হলো না, ভয়ঙ্কর এক লাথি খেয়ে ছিটকে গেল ও কয়েক হাত দূরে। দৌড়ের গতি কমাল না দৈত্য, ছোঁ মেরে পড়ে থাকা একটা হেলমেট তুলে নিল, তারপর দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল অ্যান্টিক শপ থেকে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে উঠল দোকানের দরজা।

লাথির ব্যথাটা সয়ে আসতেই উঠে দাঁড়াল রানা, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল পিস্তলটা, তারপর বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে দৈত্য, মিনিটদশেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। অগত্যা ভিতরে ফিরে এল ও।

দেশমের বাঁধন কেটে দিয়েছে লুনা। একটা চেয়ারে বসিয়ে পরিচর্যা করছে ক্ষতস্থানগুলোর। রানাকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'সরি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাটা পগার পার হয়ে গেছে।' দেশমের দিকে ইশারা করল। 'কী অবস্থা ওঁর।'

'সারা শরীরে কাটাছেঁড়া,' লুনা বলল। 'তবে সিরিয়াস কোনও আঘাত পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' মুখ খুলল দেশম, রানাকে সম্মান দেখিয়ে নড় করল। 'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছেন, নইলে খুন হয়ে যেতাম। অনেক-অনেক ধন্যবাদ। যদিও,

রক্ষাকর্তার নামটা এখনও জানি না আমি।'

'মাসুদ রানা, সার,' সবিনয়ে বলল রানা। 'তবে খামোকাই আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। দৈত্যটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি ছাড়া কী-ই বা এমন করতে পেরেছি? খেল্ তো দেখাল লুনা।' অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল ও তরুণী আর্কিয়োলজিস্টের দিকে। 'এত ভাল তীর ছুঁড়তে জানো, সেটা আগে কখনও বলোনি কেন?'

'দূর ছাই! আগে কোনোদিন তীর ছুঁড়েছি নাকি?' মুখ ঝামটা দিল লুনা।

'ছোঁড়োনি? তা হলে হাতের টিপ এত ভাল হলো কী করে?'

'টিপ না ঘোড়ার ডিম! আমি তো ব্যাটার বুক সই করে মেরেছিলাম, লাগল গিয়ে হাতে। তোমার গায়ে লাগলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।'

'অ্যাঁ!'

হাসতে গিয়ে ঠোঁটের ব্যথায় ককিয়ে উঠল দেশম।

রানার শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। লুনা বলল, 'তুমি আহত।'

পাঁজর আর বুকের ক্ষত পরীক্ষা করল রানা। বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কেটেছে। তবে শখের শার্টটার সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত,' বলল দেশম, 'আপনার হাতে যদি *বুভারিয়া*-টা না থাকত।'

'কী বললেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ব্যাটল অ্যাক্স-টার কথা বলছি। একসেলেন্ট অস্ত্র... মানে যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায় আর কী! আপনি চমৎকারভাবে সামলেছেন ওটাকে।'

'কুঠারটার নাম বুভারিয়া?'

'হ্যাঁ। পঞ্চদশ শতাব্দীর অস্ত্র... ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র-নির্মাতা

বুভারির আবিষ্কার। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে।'

'বুভারি? ইন্টারেস্টিং! নামটা শুনেছি আমি।'

'অবাক হচ্ছি না। দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র-নির্মাতা ওরা। আজও টিকে আছে।'

'অস্ত্র নিয়ে আলোচনায় একটু ক্ষান্ত দিতে পারো?' বিরক্ত গলায় বলল লুনা। 'একটু আগে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এখন কী করা উচিত আমাদের?'

রানা বলল, 'আমি পুলিশে খবর দেয়ার পক্ষে।'

'না, না!' প্রতিবাদ করল দেশম। 'আমি এখানে পুলিশ চাই না। সমস্যা আছে।'

'আপনার সমস্যার কথা জানি আমি,' বলল রানা। 'তবু পুলিশে খবর দেয়া উচিত। খুন হতে বসেছিলেন, সেটা ভুলে যাবেন না। বিপদ কাটেনি এখনও।'

'আর ওদেরকে ডাকলেই বুঝি সব বিপদ কেটে যাবে? তলোয়ার-অলা দানবের কথা ওরা বিশ্বাস করবে ভেবেছেন?'

অসিযুদ্ধের গল্পটা যে আজগুবি শোনাবে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। বলল, 'মানলাম। তবু...'

'আচমকা ঢুকে কাবু করে ফেলেছিল বটে, তবে ভবিষ্যতে আর পারবে না। ফ্রম নাউ অন, আই শ্যাল টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ, মসিয়ো রানা।'

পড়ে থাকা হেলমেটের স্তূপ পরীক্ষা করছে লুনা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে নেই হেলমেটটা।'

'দৈত্যটা নিয়ে গেছে?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ,' মুচকি হাসল দেশম। চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালের কাছে চলে গেল। গোপন একটা বোতাম চাপতেই উন্মুক্ত হলো প্যানেল, পিছনে চোরা খোপ আছে। সেখান থেকে চকচকে শিরোস্ত্রাণটা বের করে আনল। 'গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি কখনও

বাইরে সাজিয়ে রাখি না।'

'তা হলে ওই ব্যাটা কোন্‌টা নিল?'

'হাতের কাছে যেটা পেয়েছে। খালি হাতে ফিরতে চায়নি আর কী!' গম্ভীর হয়ে হাতের শিরোস্ত্রাণটা দেখল দেশম। 'যা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও অনেক মূল্যবান এটা।'

'দুঃখিত, দিদিয়ের,' বলল লুনা। 'ব্যাটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছিল। তোমার মেসেজ শুনতে পেয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি এমন কিছু ঘটতে পারে...'

'ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। তোমার কোনও দোষ নেই এতে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেশম। 'যা বলছিলাম... হেলমেটটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার আপত্তি আছে?'

'কীসের আপত্তি? দেখো পরীক্ষা করে... যত সময়ই লাগুক না কেন। লেগ্রাঁ মারা গেছে, হেলমেট নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কেউ নেই এখন।'

'লেগ্রাঁ মারা গেছে?' চমকে উঠল দেশম।

অফিসের ঘটনা খুলে বলল লুনা। শেষে যোগ করল, 'এর পরেও জিনিসটা রাখবে কি না, ভেবে দেখো। রানা ঠিক বলেছে, বিপদ সত্যিই কাটেনি।'

'রিল্যাক্স, আমি গা ঢাকা দেব,' বলল দেশম। 'প্রোভেন্সে একটা ভিলা আছে আমার, কেউ জানে না। দোকান বন্ধ করে দিয়ে ওখানে চলে যাব। চাইলে তুমিও আসতে পারো। তোমার উপরও তো নজর আছে ওদের!'

'ধন্যবাদ, কিন্তু এদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। তা ছাড়া হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে পুলিশ সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে।'

'ছুটি নাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির কথা বললে কেউ মানা করতে পারবে না। মসিয়ো দেশম ঠিক

বলেছেন। তুমিও বিপদের মধ্যে আছ। আমার তো মনে হয়, গা-ঢাকা দেয়াই উচিত।'

'যেতে বলছ তা হলে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে তো জামাকাপড় নেই। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সব গুছিয়ে নিতে হবে, অফিসে ছুটির দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে...'

'চলো, আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করল দেশম।

'হেলমেট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না,' বলল রানা। 'আপনি ভিলায় চলে যান। ঠিকানা দিন, লুনাকে আমি পৌঁছে দেব ওখানে।'

এক টুকরো চিরকুটে ভিলার ঠিকানা লিখে দিল দেশম। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লুনার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল দুজনে। বাড়িতে ঢোকার একটু পরেই বেজে উঠল রানার সেলফোন। কল রিসিভ করে কিছুক্ষণ কথা বলল রানা।

গোছগাছ শেষ হয়েছে লুনার। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কার ফোন?'

'মেঘ না চাইতেই জল বলতে পারো,' হাসল রানা। 'মাদাম আইরিন বুভারির সেক্রেটারি... গদগদ ভাষায় জানাল, ওর মহীয়সী মালকিন আগামীকাল আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হয়েছেন।'

'বুভারি? দিদিয়েরের মুখেও নামটা শুনে অদ্ভুত আচরণ করেছ তুমি। কী ব্যাপার বলো তো!'

গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশ আর লেকের তলার বিমানের সঙ্গে বুভারিদের কানেকশনের কথা খুলে বলল রানা। পিঠ খাড়া হয়ে গেল লুনার। বলল, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সেটা ঠিক হবে না। বিপদ দেখা দিতে পারে।'

'বুড়ি এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাব, এতে বিপদ কোথায়?'

'আমি সিরিয়াস, লুনা। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে বুভারিদের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস আমার। এতে তোমাকে জড়াতে চাই না।'

'আমি অলরেডি জড়িয়ে গেছি, রানা। গ্লেসিয়ারের তলায় আমাকে মারতে চেয়েছে ওরা, বাড়ি-অফিস তছনছ করেছে, দেশমের উপরও হামলা করেছে শুধুমাত্র আমারই কারণে! এখন চাইলেও আমার পক্ষে পিছু হটা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু...' ভাবছে রানা।

'কোনও কিন্তু নয়, রানা। পুরনো অস্ত্র-শস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ আমি, বুভারিদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানি। আমার সাহায্য কাজে লাগবে তোমার।'

'কঠিন যুক্তি দাঁড় করিয়ে দিলে দেখছি!' বলল রানা। ভাল করে লক্ষ করল লুনার মুখ। বুঝতে পারল, মানা করে ঠেকানো যাবে না ওকে। তাই কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, নেব তোমাকে... কিন্তু ছদ্ম-পরিচয়ে। বলব তুমি আমার অ্যাসিসটেন্ট। রাজি?'

'রাজি।'

'গুড। চলো এখন।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল রানা-লুনা। সরবোন সায়েন্স সেন্টারে যাচ্ছে, ওখানে লুনার ছুটির দরখাস্ত পৌঁছে দিয়ে প্রোভেন্সের পথ ধরবে। রাতটা দেশমের ভিলায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, কাল ওখান থেকেই মাদাম বুভারির সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কী অপেক্ষা করছে বুভারি এস্টেটে? সেটা সময়ই বলে দেবে।

সতেরো

নির্জন মেঠোপথ ধরে চলেছে একটা মিনিট্রাক। ড্রাইভারের চেহারা হাবাগোবা, উদাস নয়নে তাকিয়ে আছে সামনে, গুনগুন করে পল্লীগীতির সুর ভাঁজছে। আচমকা লালচে একটা ছায়া উড়ে গেল তার গাড়ির উপর দিয়ে, প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা চেসিস। আঁতকে উঠে স্টিয়ারিং ঘোরাল ড্রাইভার, পথ ছেড়ে পাশের নালায় আছড়ে পড়ল ট্রাক। ঝাঁকি খেয়ে পিছন থেকে ছিটকে পড়ল কয়েকটা কাঠের খাঁচা, ভেঙে গেল। সেখান থেকে চেঁচামেচি করে বেরিয়ে এল অনেকগুলো মুরগী, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চারদিকে।

দৃশ্যটা দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ল লাল-রঙা বিমানের পাইলট। ড্রাইভারকে ভয় দেখানোর জন্য ট্রাকের উপর দিয়ে আরেক দফা উড়ে গেল সে, তারপর কোর্স বদলাল। নীচে দিগন্তবিস্তৃত জমি দখল করে রেখেছে আঙুরের খেত। প্যানেলের একটা সুইচ টিপল সে—বিমানের ডানার তলায় লাগানো টুইন পড থেকে কীটনাশকের মেঘ সৃষ্টি হলো, ইলশেগুঁড়ির মত ছড়িয়ে পড়ল খেতের উপর। দিক বদলাল পাইলট, আঙুরের

খেত পেরিয়ে এল। নীচে এখন ঘন অরণ্যের ভিতর সুনীল জলাশয়। ছবির মত দৃশ্য।

ধীরে ধীরে উচ্চতা কমল বিমানের। সামনে উদয় হলো একটা শ্যাতো, মানে প্রাসাদ—উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর রয়েছে গার্ড টাওয়ার। প্রাচীরের বাইরে, গোটা সীমানা ঘিরে রেখেছে গভীর পরিখা, ড্র-ব্রিজ ছাড়া পেরুনোর উপায় নেই। মধ্যযুগের স্থাপত্যশৈলীর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

শ্যাতোর ছাদ ছুঁই ছুঁই করে উড়ে গেল বিমান, কিছুক্ষণ পর মাইলখানেক দূরে বুক চিতিয়ে থাকা এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করল। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই ককপিট থেকে নেমে এল পাইলট, এগিয়ে গেল স্ট্রিপের একপ্রান্তে পার্ক করে রাখা তার জাগুয়ার সেডানের দিকে। পিছনে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে উদয় হলো গ্রাউণ্ড ক্রু-র দল, বিমানটাকে টেনে নিয়ে গেল নিঃসঙ্গভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাথুরে হ্যাঙারের ভিতর।

ক্রু-দের দিকে ফিরেও তাকাল না ফিলিপ বুভারি, গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে সে গাড়ির উদ্দেশে। চোখ থেকে ফ্লাইং গগলস্ খুলে ছুঁড়ে দিল শোফারের দিকে, তারপর দরজা খুলে উঠে পড়ল জাগুয়ারের পিছনের সিটে। গাড়ি চলতে শুরু করলে বিল্ট-ইন বার থেকে কনিয়াকের বোতল আর গ্লাস বের করল। ট্রাক ড্রাইভারের ভয়ার্ত চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে, ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে হেসে উঠল সে আনমনে।

রীতিমত সুপুরুষ বলা চলে ফিলিপকে। লম্বা, ঋজু দেহ সৌষ্ঠব দেখায় অ্যাথলিট বলে ভ্রম হতে পারে। প্রাচীন রোমান মূর্তির মত চেহারা, যেন পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে, একবিন্দু খুঁত নেই কোথাও। খুঁত রয়েছে কেবল চোখের তারায়—বড্ড শীতল... বড্ড নিষ্ঠুর। ওদিকে তাকালেই আঁচ করা যায়, দয়ামায়া বলে কোনও অনুভূতি নেই তার ভিতরে।

বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়াবহ সে। স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা তাকে শয়তানের দূত বলে মনে করে। ফিলিপকে দেখলেই বুকে ক্রুশ আঁকে তারা। আঁকবে না-ই বা কেন? মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় ফিলিপ, কারণে-অকারণে অত্যাচারের খড়গ নামিয়ে আনে অসহায় লোকজনের উপর।

অরণ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে জাগুয়ার, গাছের ডাল আর পাতার আচ্ছাদনে সেখানে ন্যাচারাল এক টানেলের সৃষ্টি হয়েছে। ওখান থেকে বেরুলেই ঘাসে ঢাকা খোলা মাঠ, তারপর রয়েছে পরিখা আর শ্যাতোর ফটক। মাঠ পেরিয়ে এণ্ট্রান্সের সামনে থামল গাড়ি। হর্ন বাজাতেই ধীরে ধীরে নেমে এল ড্র-ব্রিজ, উঠে গেল প্রবেশপথে স্থাপন করা লোহার গ্রিল। প্রাসাদের নুড়ি-বিছানো উঠোনে ঢুকে গেল জাগুয়ার।

বুভারি শ্যাতোর অবয়ব যে-কোনও ইতিহাসের বইয়ে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে। রেনেসাঁ যুগের পর এ-ধরনের আর কোনও প্রাসাদ তৈরি হয়নি ফ্রান্সে। ভীমদর্শন এক ইমারত, মোটা আর ভারী পাথরে গড়া। চারকোনায় চারটে টাওয়ার আছে; জানালাগুলো ছোট, সংকীর্ণ—আলো-বাতাস ঢোকার জন্য নয়, ওখান থেকে শত্রুর উদ্দেশে তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে ফোকর। এক দর্শনেই যে-কেউ বলতে পারবে, আবাস হিসেবে নয়, যুদ্ধশিবির হিসেবে বানানো হয়েছে ওটা।

স্থূলকায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে শ্যাতোর নকশা-কাটা ভারী ডাবল-ডোরের সামনে—মাথা-কামানো, পরনে বাটলারের পোশাক। রুক্ষ চেহারার সঙ্গে বেশভূষা মোটেই মানাচ্ছে না। গাড়ি থেকে ফিলিপকে নামতে দেখে এগিয়ে এল। খসখসে গলায় বলল, 'আর্মারি-তে আপনার মা অপেক্ষা করছেন। আপনি পৌঁছুনোমাত্র দেখা করতে বলেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম, ভ্যাসিলি,' কাঠখোট্টা স্বরে বলল ফিলিপ,

বাটলারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ব্রিটেনের রানীকে যেভাবে রয়্যাল গার্ড পাহারা দেয়, সেভাবে ওর মা-কেও দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আগলে রাখে ছোটখাট এক বাহিনী—সদস্যরা ফ্রেঞ্চ লিজিয়ন, কিংবা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন সদস্য। ভ্যাসিলি সেটার প্রধান। ভয়ঙ্করদর্শন রক্ষীদের বাধা না পেরিয়ে এমনকী ফিলিপও নিজের মায়ের কাছে পৌঁছুতে পারে না। লোকগুলো ওর দু'চোখের বিষ। নিজের বাড়িতে নিজেকেই বহিরাগত বলে মনে হয় ওর... শুধুমাত্র মায়ের এই বডিগার্ডদের কারণে।

বাড়ির ভিতর ঢুকল ফিলিপ। পোরট্রেট গ্যালারির দীর্ঘ করিডর ধরে হনহন করে হেঁটে চলল। দু'পাশের দেয়ালে বুভারি পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের তৈলচিত্র ঝুলছে, সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে ফিলিপের মোটেই আগ্রহ নেই; তাদের অনেকেই এই প্রাসাদে নির্মম মৃত্যু বরণ করেছে, মাথা ঘামায় না সে-ইতিহাস নিয়েও। ঘামাবেই বা কেন? সহস্র বছর ধরে এখানে বাস করছে ওদের পরিবার; খুঁজলে এমন একটা কামরাও পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনও না কোনও বুভারি ছুরিকাঘাত, বিষপ্রয়োগ কিংবা গুলিবর্ষণের শিকার না হয়েছে। সত্যি বলতে কী, অতৃপ্ত আত্মা বলে যদি কিছু থাকত, তা হলে বুভারি-শ্যাতোয় জ্যান্ত মানুষের চেয়ে ভূত-প্রেতের সংখ্যা অনেক বেশি হতো।

গ্যালারি পেরিয়ে আর্মারিতে পৌঁছুল ফিলিপ। বিশাল, ব্যাঙ্ক ভল্টের মত এক কামরা—ভিতরে হরেক রকম অস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীন আর্মামেন্টের মিউজিয়াম বলা চলে, ব্রোঞ্জ যুগের তলোয়ার থেকে শুরু করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত সবকিছু আছে। আর আছে মধ্যযুগীয় নাইটদের বর্ম—স্টেইনড্-গ্লাসের ডিসপ্লে কেসে শোভা পাচ্ছে সব, সময়কাল অনুসারে রক্ষিত।

একদর্শনে বোঝা যায়, এই আর্মারি আসলে যুদ্ধ আর ধ্বংসের ইতিহাসের এক নীরব প্রদর্শনী।

আর্মারির এক অংশে রয়েছে মিলিটারি হিস্ট্রির লাইব্রেরি, দরজা ঠেলে ওখানে ঢুকল ফিলিপ। চারদিকে বইভর্তি শেলফ, মাঝখানে একটি মেহগনি কাঠের ডেস্ক। উপরে নকশাদার ঝাড়বাতি জ্বলছে, তার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো ঘর। ডেস্কের পিছনে একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে আছে বিজনেস-সুট পরা এক মহিলা, মাথা নিচু করে একগাদা কাগজপত্র ঘাঁটছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিলিপ, গলা খাঁকারি দিল।

মুখ তুলে তাকাল আইরিন বুভারি। যৌবন পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তারপরও রূপের ছটা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি চেহারা থেকে। ফ্যাশন মডেলদের মত একহারা দেহ, বয়সের ভারে মোটেই ন্যুজ হয়ে পড়েনি, বরং বয়স তার ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। চোখের তারায় আগুন জ্বলে আজও। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু গায়ের রঙ আজও পোর্সেলিনের মত ধবধবে সাদা। মাথার চুল ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্য হারায়নি। ঢেউ খেলে ঘন কেশরাজি নেমে গেছে কোমর পর্যন্ত। এই মুহূর্তে অবশ্য খোঁপা বেঁধে রাখা হয়েছে।

শীতল চোখে ছেলেকে দেখল মাদাম বুভারি। বলল, 'বসো তোমার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি আমি।'

একটা চেয়ার টেনে মায়ের মুখোমুখি বসল ফিলিপ। 'দেরির জন্য দুঃখিত। ফকার নিয়ে আঙুর-খেতে ওষুধ ছিটাতে গিয়েছিলাম।'

'ছাতের টালিগুলোর কাঁপুনি শুনেছি আমি,' গম্ভীর গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'আজ কয় শ' গরু-ছাগলকে ভয় পাইয়ে

দিয়ে এসেছ, জানতে পারি?'

'একটাও না,' হাসল ফিলিপ। 'তবে একটা কনভয়ের উপর হামলা চালিয়ে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্ত করেছি।'

'কনভয়? বন্দি?' ভুরু কোঁচকাল মাদাম বুভারি।

'মুরগীভর্তি একটা ট্রাক। ভয় দেখিয়ে ওটাকে নালায় ফেলে দিয়েছি।' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো ফিলিপের। 'ছাড়া পেয়ে মুরগীগুলোর আনন্দ যদি দেখতে!'

'তোমার এসব ছেলেমানুষি কবে বন্ধ হবে, বলতে পারো?' ছেলের রসিকতায় প্রভাবিত হলো না মাদাম বুভারি। 'চাষাভুষোদের ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি। বিমান নিয়ে খেলাধুলার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তোমার জন্য...

'যেমন?'

'বুভারি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ। নাকি সেটার কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে?'

মায়ের কণ্ঠের পরিবর্তন টের পেয়ে পিঠ সোজা হয়ে গেল ফিলিপের। যেন দুষ্টু স্কুলছাত্রের পিঠে বেতের বাড়ি পড়েছে। মিনমিন করে বলল, 'অবশ্যই আছে, মা। বিমান ওড়ানো স্রেফ আমার শখ... নার্ভ শান্ত করার একটা উপায়। আর কিছু না।'

'আমাদের ব্যবসা আর জীবনযাত্রার উপর অনেক হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, ফিলিপ। সেগুলো দূর করার ব্যাপারে কতদূর কী করেছ, জানতে পারি? সহস্র বছর ধরে বুভারিরা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, তুমি তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ-দায়িত্ব হালকাভাবে নিয়ো না।'

'নিচ্ছি না তো! ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই, বিব্রতকর একটা ঝামেলাকে হাজার হাজার টন বরফের তলায় কবর দিয়েছি আমি!'

সুন্দর ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'থিয়োডর বুভারিকে *বিরক্তকর ঝামেলা* বললে কম বলা হয়। হ্যাঁ, ওটা সামলেছ তুমি। কিন্তু কাজটা নিখুঁত হয়নি। গ্যাস্টন একটা গর্দভ, ওর বোকামির জন্য মহামূল্য রেলিক-টা চিরদিনের জন্য হারাতে বসেছিলাম আমরা।'

'ওর কী দোষ? হেলমেটটা যে বরফের তলায় আছে, তা আমরা কেউই জানতাম না। ওকে শুধু স্ট্রংবক্স আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল।'

'হাহ্, গুরুত্বহীন একটা জিনিস! পানি ঢুকে ভিতরের কাগজপত্র বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। বাক্সটা এখন কেজি দরে বিক্রির বস্তু ছাড়া আর কোনও কাজের না।'

'হাতে পাবার আগে তো সেটা বোঝার উপায় ছিল না।'

অজুহাতটা কানে তুলল না মাদাম বুভারি। 'ওই আর্কিয়োলজিস্ট মেয়েটা যে আমাদের রেলিক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তা-ও তো জানতে না তুমি। না, এভাবে আর চলে না। হেলমেটটা যে-কোনও মূল্যে উদ্ধার করতে হবে আমাদেরকে। বুভারিদের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে ওটার উপর। গ্যাস্টনের উপর আর নির্ভর করা যায় না, সরবোনে আরেক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে এসেছে গাধাটা। পুলিশ এখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ওই অ্যান্টিক ডিলারের কাছ থেকেও আসল জিনিস আদায় করতে পারেনি তোমার পা-চাটা কুকুর, ফালতু এক নমুনা উঠিয়ে এনেছে!'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ হয়েছে গ্যাস্টন,' স্বীকার করল ফিলিপ। 'আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

'দেখাদেখি বাদ দিয়ে কাজে নামো, ফিলিপ!' গমগম করে উঠল মাদাম বুভারির গলা। 'আমাদের পরিবারে ব্যর্থতার কোনও স্থান নেই। দুর্বলতা দেখালে বহু আগেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে

যেতাম। গ্যাস্টন এখন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরবোনে ওকে কেউ দেখে ফেলেছে কি না, কে জানে। ওই অ্যান্টিক ডিলারও পুলিশের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারে। আমার মনে হয়, বোঝাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেললেই ভাল করবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'গ্যাস্টনকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি ওর ব্যবস্থা নেব।'

ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল মাদাম বুভারি, সে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। গ্যাস্টন একটা প্রভুভক্ত শিকারি কুকুর, শুধু ফিলিপের কথায় ওঠে-বসে। এমন একটা অস্ত্র সে কখনোই হাতছাড়া করবে না। পারিবারিক মূল্যবোধ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই বুভারি পরিবারে, সদস্যদের মধ্যে সংঘাত লেগে থাকে, একে অন্যের পিঠে ছুরি বসানোয় ওরা অভ্যস্ত। সে-ধরনের পরিস্থিতিতে গ্যাস্টনের মত খুনি খুব কাজে আসে।

'ব্যবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ো,' শান্ত গলায় বলল মাদাম বুভারি।

'বেশ,' ফিলিপও নির্বিকার। 'কিচ্ছু ভেবো না। গ্যাস্টনের কপালে যা-ই ঘটুক, আমাদের গোমর কখনও ফাঁস হবে না।'

'গ্যারান্টি দিতে পারো? আরেকটু হলে তো ডরমেয়ারেই সর্বনাশ ঘটে যেত। এখনও সে-বিপদ কাটেনি। আমাদের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি চলে গেছে অচেনা এক মানুষের হাতে। আসল কাজ উদ্ধার হয়নি, মাঝখান থেকে হৈচৈ বেধে গেছে। ব্যাপারটা হালকাভাবে নিয়ো না। আমার উদাহরণ অনুসরণ করো। ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসনের কথাই ধরো, ওকে ফিরিয়ে এনেছি আমি, কিন্তু কাকপক্ষীও টের পায়নি কিছু।'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল ফিলিপের ঠোঁটে। 'তুমি শুধু

হেণ্ডারসনকেই ফিরিয়ে এনেছ, মা। কিন্তু প্রজেক্টের বাকি সব বিজ্ঞানীকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছ... ওদের কাজ শেষ হবার আগেই!'

ছেলের দিকে বিষমাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মাদাম বুভারি। শান্ত গলায় বলল, 'সামান্য মিসক্যালকুলেশন। নিজেকে নিখুঁত বলে দাবি করছি না আমি। ভুল স্বীকার করা, এবং সেই ভুলের সংশোধন করাই সত্যিকার ম্যাচিউরিটির লক্ষণ। ড. হেণ্ডারসনকে আবার গবেষণায় লাগিয়ে দিয়েছি আমি। ও কাজ করতে থাকুক, এই ফাঁকে হেলমেটটা উদ্ধার করতে হবে আমাদেরকে। তুমি কদ্দূর এগোলে?'

'দিদিয়ের দেশম... অ্যান্টিকুইটিজ ডিলার... গায়েব হয়ে গেছে। ওকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি।'

'আর আর্কিয়োলজিস্ট মেয়েটা?'

'ওকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খুঁজতে থাকো। আমিও নিজস্ব কিছু লোক লাগিয়েছি ওর পিছনে। গোপনে কাজ করতে হবে আমাদেরকে। এবার আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। আর হ্যাঁ, নতুন একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। গোস্ট সিটিতে একটা এক্সপিডিশনের আয়োজন করেছে উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট। নুমা সাহায্য করছে ওদেরকে।'

'মাসুদ রানা... মানে ডরমেয়ারের উদ্ধার অভিযানের নায়ক... ও-ও নুমার সঙ্গে জড়িত। কোনও কানেকশন আছে ভাবছ?'

'মনে হয় না,' মাদাম বুভারি মাথা নাড়ল। 'রানা ব্যাপারটায় জড়াবার বহু আগেই ওই এক্সপিডিশনের কাজ শুরু হয়েছে। ওকে নিয়ে ভাবছি না আমি, অভিযানটার ব্যাপারে ভাবছি। আমরা কী করছি, সেটা আবিষ্কৃত হলে বাজে একটা পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে হবে।'

'তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।'

'ঠিক বলেছ। সেজন্যেই একটা প্ল্যান খাড়া করেছি আমি। গোস্ট সিটিতে প্রথম ডাইভেই গায়েব হয়ে যাবে এক্সপিডিশনের ডিপ-সি ভেহিকল *আলভিন।*'

'সেটা কি উচিত হবে? বড় মাপের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন চালানো হবে ওটার জন্য। একটার জায়গায় দশটা সাবমারসিবল ডাইভ দেবে ওখানে।'

'কোথায় গায়েব হয়েছে, সেটা জানলে তো! আলভিনের পাশাপাশি ওটার সাপোর্ট শিপও গায়েব হয়ে যাবে, ডিয়ার। হাজার হাজার বর্গমাইল সাগরের কোথায় ওরা হারিয়ে গেছে, তা কেউ জানতে পারবে না।'

'গোটা একটা জাহাজ গায়েব করে দেবে? কীভাবে?'

'ভুলকে সাফল্যের সিঁড়ি বানাতে শেখো, ফিলিপ। গোস্ট সিটির উদ্দেশে দুটো জাহাজ পাঠিয়েছি আমি, একটায় রয়েছে আমাদের ভুলের ফসল... রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ওটাকে চালাবে দ্বিতীয় জাহাজটা। ডাইভ সাইটের কাছাকাছি নোঙর ফেলবে প্রথম জাহাজ। আলভিন পানিতে ডাইভ দেয়া মাত্র মে-ডে সিগনাল পাঠানো হবে। রিসার্চ শিপ থেকে রেসকিউ পার্টি আসবে, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে একদল ক্ষুধার্ত পশু। তারপর স্যালভেজ করার ভঙ্গিতে জাহাজটা রিসার্চ শিপের পাশে গিয়ে ভিড়বে, ভিতরে রাখা বোমা ফাটানো হবে দূর থেকে। ফলে দুটো জাহাজই ডুবে যাবে। কোনও সাক্ষী থাকবে না। মোলাভশান ক্রু-দের ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না আমি।'

'ওখানে মাত্র একজন বেঁচেছে,' বলল ফিলিপ। 'তাকে পাগল ভাবছে সবাই। ও নিয়ে ভাবনার কিছু দেখছি না।'

'কপাল ভাল ছিল আমাদের, তাই মেয়েটার কথা বিশ্বাস

করেনি কেউ,' চাঁছাছোলা গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'বার বার ভাগ্যের সহায়তা পাবে, এ-কথা ভাবতে যেয়ো না। আর হ্যাঁ, মাসুদ রানা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশের ব্যাপারে তথ্য জানাতে চায়।'

'ও থিয়োডরের কথা জানে?' অবাক হলো ফিলিপ।

'বুঝতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'ওকে এখানে আসতে বলেছি আমি, কথা বলে দেখি। যদি মনে হয় লোকটা বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে, তা হলে ওকে তোমার হাতে তুলে দেব।'

'ঠিক আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ, মায়ের কাছে গিয়ে গালে চুমু খেলো, তারপর বেরিয়ে গেল লাইব্রেরি থেকে।

ছেলের গমনপথের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকল মাদাম বুভারি, পারিবারিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভালমতই রপ্ত করেছে সে। পিতার মত ফিলিপও মেধাবী, নিষ্ঠুর, উচ্চাভিলাষী এবং লোভী। খুঁত বলতে রয়েছে কেবল উপস্থিতবুদ্ধির অভাব, আর জেদ। এই দুটো দুর্বলতার কারণেই বহু বছর আগে স্বামীকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল মাদাম বুভারি, নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল পারিবারিক সাম্রাজ্যের লাগাম।

ফিলিপ ওর উত্তরসূরি হিসেবে সবকিছু পাবার আশা করছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে না পেলে মায়ের পেটে ছুরিও বসাতে পারে। কিন্তু কারও হাতেই কিছু তুলে দেবার ইচ্ছে নেই মাদাম বুভারির। মস্ত বড় একটা পরিকল্পনা রয়েছে ওর, সেটার কথা ফিলিপকে জানায়নি। জানায়নি হেলমেটের সত্যিকার গুরুত্বটাও। আনমনে মাথা নাড়ল মাদাম বুভারি—আপন সন্তানকে হত্যা করতে ভাল লাগবে না তার, কিন্তু বিষধর সাপকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। বিশেষ করে সেই সাপ যদি ওর

[illegible] পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। মুরগীঅলাকে খুঁজে বের করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অভিজাত পরিবারে সেটাই নিয়ম। কোনও কেলেঙ্কারি বাধতে দেয়া যাবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাদাম বুভারি—মায়ের দায়িত্ব কখনও শেষ হয় না।

আঠারো

শান্ত সমুদ্র আর চমৎকার আবহাওয়ার কল্যাণে খুব দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে গেছে রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*। মিড-আটলান্টিক রিজের উত্তরে, আটলান্টিক ম্যাসিফ নামে এক ডুবো-পাহাড়ের মাথায় নোঙর ফেলেছে। জায়গাটা অ্যাজোরেস দ্বীপের দক্ষিণে, বারমুডা থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে। এককালে সাগর থেকে অনেক হাজার ফুট উঁচুতে ছিল এই পাহাড়ের চূড়া, এখন আড়াই হাজার ফুট গভীরে তলিয়ে গেছে।

আগামীকাল সকালে প্রথম ডাইভ দেবে আলভিন। তাই ডিনারশেষে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিটিঙে বসল ড. আসিফ রেজা আর তানিয়া রেজা। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গোস্ট সিটি এবং আশপাশের এলাকা থেকে পাথর, খনিজ পদার্থ আর জৈব স্যাম্পল সংগ্রহ করা হবে। এ-ছাড়া যতটা সম্ভব ভিজুয়াল অবজার্ভেশন রেকর্ড করা হবে। মোট সাতজন বিজ্ঞানী

এসেছেন আটলাণ্টিসে, তবে আলভিনে চেপে ডাইভ দেবে শুধুমাত্র তিনজন—সাবমারসিবলের পাইলট, আর রেজা দম্পতি। বাকিরা সারফেস থেকে মনিটরিং এবং অ্যানালিসিসের কাজ করবেন।

পরদিন ভোর ছ'টায় বিছানা ছাড়ল আসিফ আর তানিয়া, সাবমারসিবলের চেকলিস্ট মেলানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাতটা নাগাদ ইকুইপমেণ্ট আর ব্যাটারির চেকআপ সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর ক্যামেরা, খাবার-দাবার আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তোলা হলো আলভিনে। সবশেষে ডুবোযানটার গায়ে বাঁধা হলো বাড়তি ওজন, যাতে ওটা দ্রুত তলিয়ে যেতে পারে পানিতে। ওঠার সময় সেগুলো খুলে ফেলে দেয়া যাবে। ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ম্যানিপুলেটর আর্মও খুলে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা আছে; চাইলে শুধু ফাইবারগ্লাসের কেবিনটাও আলাদা করা যায়। তারপরও যদি ওরা পানির তলায় আটকা পড়ে, অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টা লাইফ সাপোর্ট দিতে পারবে আলভিন।

রওনা হবার আগে ওয়েদার রিপোর্ট চেক করল আসিফ, ডেকে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সাগর দেখল। পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ ভাসছে, নীচে নিস্তরঙ্গ জলরাশি। ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে ডাইভ দেবার জন্য আদর্শ পরিবেশ। সন্তুষ্ট হয়ে পানিতে দুটো ট্রান্সপণ্ডার ফেলার নির্দেশ দিল ও—পাতালের অন্ধকার জগতে ওগুলো ওদের নেভিগেশন মার্কার হিসেবে কাজ করবে।

ব্রিজ উইংে দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ফোনে ড. সলোমনের সঙ্গে কথা বলছে তানিয়া—গরগন-উইড ইনফেস্টেশনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে।

'আমাদের ক্যালকুলেশনের চেয়ে দ্রুত ছড়াচ্ছে শৈবালটা,' বললেন সলোমন। 'আমেরিকার ইস্ট কোস্টের কাছাকাছি পৌঁছে

গেছে, প্যাসিফিকেও দেখা দিয়েছে ওটা।'

'আলভিনকে নামাতে যাচ্ছি আমরা,' জানাল তানিয়া। 'আবহাওয়া ভাল, পানি স্বচ্ছ থাকবে বলে আশা করছি।'

'চোখকান খোলা রেখো,' সতর্ক করলেন সলোমন। 'ইনফেস্টেশনের উৎসটা হয়তো এক দেখায় চিনতে পারবে না।'

'ক্যামেরায় পুরো ডাইভের রেকর্ডিং করব আমরা। নীচে কিছু বোঝা না গেলেও যাতে শিপে ফিরে স্টাডি করতে পারি। উল্লেখযোগ্য কিছু পেলেই আপনাকে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেব।'

'ওকে। বেস্ট অভ লাক।'

আটলান্টিসের আফট ডেকে জড়ো হয়েছে ক্রু-রা। ড. সলোমনের সঙ্গে কথা শেষ করে ওখানে হাজির হলো তানিয়া। আসিফ তখন বডিবিল্ডার গোছের এক যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। লেফটেন্যান্ট অ্যারন বেকার... মার্কিন নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, সিল-কমাণ্ডো; বর্তমানে একটি সিকিউরিটি ফার্মের সঙ্গে জড়িত। ছোট একটা টিম নিয়ে আটলান্টিসে এসেছে সে, এক্সপিডিশনের নিরাপত্তার জন্য।

'আপনাদের সাহস আছে বলতে হবে,' আলভিনের দিকে তাকিয়ে বলল লে. বেকার। 'এইটুকু একটা সাবমারসিবল নিয়ে অথৈ সাগরে নামছেন! আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসত!'

হাসল আসিফ। 'হ্যাঁ, একটু চাপাচাপি হবে। কিন্তু দু-চার ঘণ্টারই তো ব্যাপার, সহ্য করে নেব।'

ছোট একটা হ্যাঙার আছে সাবমারসিবল রাখার জন্য। সেটার দরজা খুলে গেছে। রেইলের উপর পিছলে বেরিয়ে এসেছে আলভিন। বড় একটা ডেরিকের তলায় এসে থামল। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে সাত অভিযাত্রী উঠে গেল উপরে, তারপর হ্যাচ খুলে ভিতরে ঢুকল। দু'জন এসকর্ট ডাইভার আলভিনের গা বেয়ে উঠল, ডেরিকের কেইবল আটকে দিল দু'প্রান্তে।

শক্তিশালী মোটর একটু পরেই শূন্যে তুলে ফেলল ডুবোজাহাজটাকে, ডেক পেরিয়ে ধীরে ধীরে পানিতে নামাল। ডাইভাররা এবার খুলে দিল কেইবলের বাঁধন, বিদায় নিয়ে সাঁতার শুরু করল আটলান্টিসের দিকে।

আলভিনের ককপিট কাম কেবিনে ঠাসাঠাসি করে আসন গ্রহণ করেছে অভিযাত্রীরা, টাইটেনিয়ামে তৈরি প্রেশার স্ফিয়ারটার ডায়ামিটার মাত্র বিরাশি ইঞ্চি। যে-দিকেই তাকানো হোক, শুধু কন্ট্রোল প্যানেল চোখে পড়বে। পাওয়ার অ্যাকটিভেশন, ব্যালাস্ট কন্ট্রোল, অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নিরূপণ, ইত্যাদি সারা হয় ওগুলোর সাহায্যে। পাইলটের সিটটা একদম সামনে, নেভিগেশন সিস্টেম আর প্রপালশন কন্ট্রোলের কনসোল রয়েছে ওখানে, তার উপর স্বচ্ছ ভিউপোর্ট।

পাইলটের স্টেশনের দু'পাশে জড়সড় হয়ে বসেছে রেজা-দম্পতি। অস্বস্তিকর অবস্থা, তবু উত্তেজনা অনুভব করছে আসিফ। একজন ডিপ-সি জিয়োলজিস্টের জন্য আলভিনের খুপরির মত কেবিন যে-কোনও পাঁচ-তারা হোটেলের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। রীতিমত বিখ্যাত এক সাবমারসিবল এটা, ১৯৬৪ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানিতে নামার পর থেকেই সাফল্য দেখিয়ে চলেছে আলভিন, নাম করেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। স্পেনের উপকূলে একটি হারানো হাইড্রোজেন বোমা খুঁজে বের করা হয়েছে এই ডুবোজাহাজের সাহায্যে, এমনকী *টাইটানিক*-এর সমাধিতেও প্রথমবারের মত মানুষ নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে এর। উত্তেজনা অনুভব না করে উপায় কী?

এ-যাত্রায় আলভিনকে চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে এক মহিলা মেরিন বায়োলজিস্ট—জয়েস কোর্ট। সাউথ ক্যারেলাইনায় জন্ম,

বয়স বত্রিশ, মায়াবী মুখশ্রী। পরনে জিন্স আর উলের সোয়েটার, মাথায় বেসবল ক্যাপ। দেখে মনে হতে পারে, সমুদ্রে ডুব দিতে নয়, হাওয়া খেতে বেরিয়েছে সে। একই ধরনের পোশাক আসিফেরও গায়ে। লেদারের জ্যাকেট, সুতি শার্ট, জিন্সের প্যান্ট আর রেক্সিনের কেডস্। তানিয়া ওসবের মধ্যে যায়নি, সত্যিকার গবেষকের মত একপ্রস্থ জাম্পসুট পরেছে।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে পানি ঢোকানো হচ্ছে, ধীরে ধীরে আড়াই হাজার ফুট গভীরতার ডাইভ শুরু করল আলভিন। রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে জয়েস জানাল, 'আমরা নামতে শুরু করেছি।'

'কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'আলভিন মিনিটে একশো ফুট নামতে পারে,' বলল জয়েস। 'তারমানে আধঘণ্টার মধ্যেই সাগরের মেঝে স্পর্শ করব আমরা। মিউজিক দেব? গান শুনলে সময়টা ভাল কাটবে।'

'হালকা কিছু থাকলে চালাতে পারেন। ধুম-ধাড়াক্কা গান মানাবে না এখানে।'

'বেশ।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মোৎজার্টের সিম্ফনিতে ভরে গেল কেবিনের অভ্যন্তর।

'অর্ধেক পথ নেমে এসেছি,' পনেরো মিনিট পর ঘোষণা করল জয়েস।

আসিফ বলল, 'মাত্র! আমার তো আর তর সইছে না।'

হাসল জয়েস। 'একটু সবুর করুন, ডক্টর।'

ডাইভ এরিয়ার উপরে, সারফেসে বৃত্তাকারে চক্কর দিচ্ছে আটলাণ্টিস। ব্রিজের নীচে রয়েছে টপ-ল্যাব, সেখানে সাপোর্ট ক্রু আর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জড়ো হয়েছে ডাইভ মনিটর করার জন্য। অ্যাকুস্টিক টেলিফোনে তাদের সঙ্গে আলভিনের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করছে জয়েস। খানিক পরে বাঙালি দম্পতির

দিকে ফিরল।

বলল, 'গোস্ট সিটি সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনারা?'

'২০০৪ সালে কাকতালীয়ভাবে জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে শুনেছি,' বলল তানিয়া। 'ওটার খোঁজ পেয়ে সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল... এমন জায়গা থাকতে পারে, তা আগে ভাবা যায়নি।'

'ওই অভিযানে আমিও ছিলাম,' বলল জয়েস। 'অবাক না, বলতে পারেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। মূল অভিযান শেষ করে বাড়ির পথে ফিরছিলাম, আণ্ডারওঅটর ড্রোন *আরগো*-কে পানিতে ডুবিয়ে টো করা হচ্ছিল ভলকানিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করার জন্য। মাঝরাতের দিকে আমাদের শিফট লিডার দেখল, মনিটরে ক্রিসমাস ট্রি-র মত সাদা অবয়ব ফুটে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, হাইড্রো-থারমাল ভেণ্টের খোঁজ পেয়েছি আমরা। একটা না, শত শত! ...এবং অন্যান্য ভেণ্টের চেয়ে ব্যতিক্রম! এখানে টিউব ওয়ার্ম বা শামুকের অস্তিত্ব নেই। খবর পেয়ে আমরা সবাই জড়ো হলাম কণ্ট্রোল কেবিনে, প্রথমবারের মত দেখতে পেলাম বিশাল বিশাল সব টাওয়ার... ওফ্, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

'আমি শুনেছি, গোস্ট সিটির আকার মাঝারি সাইজের বনের চেয়েও বড়,' বলল আসিফ।

'আকারের চেয়ে ওটার লোকেশন বেশি ইণ্টারেস্টিং, ড. রেজা,' জয়েস বলল। 'অতীতে বেশ কিছু ভেণ্টের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলো টেকটোনিক প্লেটের খাঁজে অবস্থিত। অমন জায়গায় ভেণ্ট সৃষ্টি হতেই পারে। অথচ গোস্ট সিটির ধারেকাছে কোনও ভলকানিক সেণ্টার নেই। কীভাবে ওগুলো তৈরি হলো, সেটা এক মস্ত বড় রহস্য।'

'কোনও কোনও কলাম নাকি বিশতলা উঁচু?'

আলভিনের ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিল জয়েস। 'নিজের চোখেই দেখুন।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল আসিফ আর তানিয়া। গোস্ট সিটির ছবি দেখেছে ওরা আগে, কিন্তু বাস্তব দৃশ্য দুজনেরই বাক্‌রোধ করল। মাটি-পাথর আর পানিতে গড়া অপার্থিব এক অরণ্যে যেন প্রবেশ করেছে ওরা—যেদিকে তাকায়, শুধু সুউচ্চ কলামের সারি। কোনোটা গাঢ়, কোনোটা হালকা। চূড়ো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্প-ভরা গরম পানি, সাদাটে মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রাচীন কলামগুলোর গায়ে বাসা বেঁধেছে শ্যাওলা আর নাম-না-জানা জলজ আগাছা... পরিত্যক্ত, ভৌতিক রূপ দিয়েছে পরিবেশটাকে।

আলভিনের গতি কমাল জয়েস, একটা কলামের উপর হোভার করতে শুরু করল। ভেন্টটা মৃত, বাষ্প বেরুচ্ছে না, তাই সমতল চূড়াটা ভালমত দেখা গেল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ত্রিশ ফুটের কম হবে না। চিমনির মত ফুটো আছে মাঝখানে, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে জলজ উদ্ভিদে।

'মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি,' ফিসফিস করে বলল তানিয়া।

'হ্যাঁ, স্বপ্নের মতই বটে,' একমত হলো জয়েস। 'কিছুতেই পুরনো হয় না। যতবার দেখি, ততবার বুক কাঁপে।'

উঁচু একটা কলামের ডগায় আলভিনকে নিয়ে গেল সে। বলল, 'ব্যাপারটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে এখানে। মাটির তলা থেকে উঠে আসা গরম পানি আর বাষ্প আটকে যায় শ্যাওলা আর আগাছার জালে। ঘন আচ্ছাদনের মত যেগুলো দেখছেন, সেগুলো আসলে মাইক্রোব বা অণুজীবের কলোনি। ভেন্টের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসা মিথেন, হাইড্রোজেন আর নানা ধরনের খনিজ পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া

ঘটে ওগুলোর, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। তারপর যখন পানির প্রেশার বেড়ে যায়, তখন ছিটকে যায় চারপাশে... ছড়িয়ে পড়ে স্রোতের সঙ্গে। কারও কারও ধারণা, এভাবেই বহুকোষী জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল পৃথিবীতে।'

বায়োলজিস্ট স্ত্রীর দিকে তাকাল আসিফ। 'আমি মাটি-পাথর নিয়ে কাজ করি, এই থিয়োরির মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। তোমার কী ধারণা?'

'ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব নয়,' বলল তানিয়া। 'এখানে যে-পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টিকালের পরিবেশের মিল আছে। বহু নামি-দামি বিজ্ঞানীই মনে করেন, জমিতে নয়, সমুদ্রেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। এখানকার মাইক্রোবগুলো আমাদের গ্রহের সেই প্রথম প্রাণ হতে পারে। উত্তপ্ত থারমাল ভেন্ট ওগুলোর ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করছে... মাইক্রোবকে পরিবর্তিত করে নতুন প্রাণের জন্ম দিচ্ছে... তারপর আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে দূর-দূরান্তে। তাই কেউ যদি গোস্ট সিটিকে প্রাণের উৎস বলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'বাপ রে!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল আসিফ। 'বলো কী!'

জয়েসের দিকে ফিরল তানিয়া। 'গরগন-উইড দেখা গেছে কোথায়?'

'এখান থেকে একটু পুবে,' বলল জয়েস। 'আলভিনের টপ স্পিড মাত্র দুই নট, কাজেই পৌঁছুতে কিছুটা সময় লাগবে.। ততক্ষণ বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করুন।'

সাবমারসিবলের মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই থারমাল ভেন্টের আরও ঘন এক অরণ্যে প্রবেশ করল ওরা, এখানকার কলামগুলো অনেক বেশি উঁচু।

'এটাকে সিটি না বলে মেগাসিটি বলা উচিত,' মন্তব্য করল

আসিফ। 'অন্তত শ'খানেক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি।'

'ভাল বলেছ,' বলল তানিয়া। 'বড় বড় শহরের মত এখানেও পরিবেশ দূষণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভিউপোর্ট দিয়ে সামনে তাকাল আসিফ। পানির স্বচ্ছতা কমে এসেছে, গাঢ় সবুজ একটা পর্দা যেন ঝুলছে কলামগুলোর মাঝে। শৈবালের স্তর।

'ওই যে আমাদের গরগন-উইড,' বলল জয়েস। 'থামব?'

'না, এগোতে থাকুন,' বলল তানিয়া। 'দেখি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে জিনিসটা।'

চল্লিশ ফুট উচ্চতা বাড়াল জয়েস, শৈবালের স্তরের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল সাবমারসিবল। যেন মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে উড়োজাহাজ। মিনিট পাঁচেক পর আবার পরিষ্কার পানি পাওয়া গেল, আলভিনকে নীচে নামাল সে।

'পানির এত গভীরে আবর্জনা দেখতে পাব, আশা করিনি,' বলল তানিয়া।

'ওটা আশা করেছ?' আঙুল তুলে সাবমারসিবলের ডানদিকে দেখাল আসিফ। 'অদ্ভুত না?'

ডানদিকে নাক ঘোরাল জয়েস। ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হলো সাগরের মেঝে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ওরা। চওড়া দুটো সমান্তরাল ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে সি-ফ্লোরে, মাঝে ত্রিশ ফুটের ব্যবধান, সমান করে দিয়েছে মাটি।

তানিয়ার চোখে পলক পড়ছে না। 'এত নিখুঁত, এত পরিচ্ছন্ন, এ মানুষের তৈরি না হয়েই যায় না।' গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'আমাদের আগেও কেউ এসেছে এখানে।'

'দেখে তো বুলডোজারের ট্র্যাক মনে হচ্ছে,' হতভম্ব গলায় বলল জয়েস। 'কিন্তু তা কী করে হয়? এত গভীরে বুলডোজার

আসে কোত্থেকে?'

'যেখান থেকেই আসুক. খুব বেশিদিন হয়নি,' বলল আসিফ। 'ট্র্যাকগুলো বড্ড পরিষ্কার। চলুন ফলো করি।'

তিনশো গজের মত এগোতেই ট্র্যাকের মাহাত্ম্য টের পাওয়া গেল। সরলরেখায় এগিয়েছে অচেনা যন্ত্রটা, পথে যত টাওয়ার পেয়েছে, ভেঙেচুরে দিয়েছে। সি-ফ্লোরে পড়ে আছে সেগুলোর ধ্বংসস্তূপ—কোনোটা আস্ত. কোনোটা ভাঙাচোরা, কোনোটা আবার গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে।

'আণ্ডারওঅটর ক্লিয়ার-কাটিং অপারেশনের মত লাগছে ব্যাপারটা,' বলল আসিফ। 'এমন কাজ করা সম্ভব, সেটা জানা ছিল না আমার।'

'এগোতে থাকুন,' জয়েসকে বলল তানিয়া। 'কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বোঝা দরকার।'

আলভিনের সবক'টা ক্যামেরা চালু করা হলো। স্থিরচিত্র আর ভিডিওতে সাগরতলের ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুলে নেয়া হচ্ছে। মাইলখানেক এগোল ওরা। গোস্ট সিটির সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ এটা। টাওয়ারের সংখ্যা এখানে অনেক বেশি, আকারেও প্রথমে দেখাগুলোর চেয়ে অনেক বড়। কোনও কোনোটা এত উঁচু যে চূড়াই দেখা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত ট্র্যাকজোড়া অনুসরণ করছে জয়েস। কয়েকবার দিক পাল্টাল ভেসে থাকা শৈবালের স্তর এড়াবার জন্য, তারপর আবার ফিরে এল কোর্সে।

'ভাগ্যিস ক্যামেরা আছে আমাদের সঙ্গে,' বলল ও। 'নইলে এখানে যা দেখছি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারতাম না উপরের ওদেরকে।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আসিফ। 'আমার তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না...' বলতে বলতে থমকে গেল

ও। দৃষ্টিসীমার প্রান্তে চকিতের জন্য কী যেন দেখল। 'আরে! কী এটা?'

তানিয়াও দেখেছে। বলল, 'কী জানি! মনে হলো একটা ছায়া উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে।'

'তিমি?'

'এত গভীরে তিমি থাকে না।'

'জায়াণ্ট স্কুইড? শুনেছি ওরা তিমির চেয়ে গভীরে নামতে পারে।'

'স্কুইডের মত তো লাগল না।' কাঁধ ঝাঁকাল তানিয়া। 'জয়েস, আলভিনকে উল্টো ঘোরাবে? কী গেল বোঝা দরকার।'

'নো প্রবলেম।' কণ্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জয়েস।

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল সাবমারসিবল। তবে জায়গাটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে—ট্র্যাকের দু'পাশে পুরো দৃষ্টিসীমা জুড়ে বিশাল বিশাল টাওয়ার দাঁড়ানো। গুঁতো না খাবার জন্য রীতিমত কসরত দেখাতে হচ্ছে জয়েসকে। অর্ধেকের মত ঘুরতেই চমকে গেল ও। ঠিক চোখের সামনে, ভিউপোর্টের ওপাশে দাঁড়ানো টাওয়ারটা কাঁপতে শুরু করেছে। ভূমিকম্পের মত প্রতিক্রিয়া হলো। ফাটল ধরল কলামের গায়ে। প্রথমে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল ছোট-বড় চাঁই, পিছু পিছু পুরো কাঠামোই ধসে পড়ল। মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো মাটি-পাথরের তাল, কাদা আর ময়লার মেঘে পরিণত হয়ে ঢেকে ফেলতে লাগল চারপাশ।

এরপর... যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত কাদার মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এল বিশাল এক কালো আকৃতি; ছুটে আসছে সোজা ওদের সাবমারসিবল লক্ষ্য করে। ওটার মাথায় লাগানো উজ্জ্বল বাতির আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

চেঁচিয়ে উঠল আসিফ, জয়েসকে পিছিয়ে আসতে বলছে; যদিও তাতে খুব একটা লাভ নেই। রিভার্স প্রপালশনে

আলভিনের গতি একটা জেলিফিশের চেয়েও কম। জয়েস শুনতে পেল না ওর কথা, সম্মোহিতের মত সে তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান দানবটির দিকে। যখন সংবিৎ ফিরে পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল সাবমারসিবলের প্রেশার হাল। সিটবেল্ট বাঁধা আছে, নইলে ছিটকে পড়ত আরোহীরা। পাগলের মত কণ্ট্রোল প্যানেলের বোতাম আর জয়স্টিক নাড়ল জয়েস, কিন্তু আলভিনের তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ভিউপোর্ট দিয়ে সামনে তাকাল আসিফ আর তানিয়া। হাঁ হয়ে বিশাল এক মুখ খুলে যেতে দেখল। সেখান দিয়ে দানবের উদরে ঢুকতে শুরু করল আলভিন।

উনিশ

সাবমারসিবলের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ঝড় বয়ে গেল রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এ। তবে আলভিনের সেফটি রেকর্ডের কথা ভেবে কিছুটা সময় অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন—যে-কোনও ধরনের ইমার্জেন্সি সামলাবার ক্ষমতা আছে ছোট্ট ডুবোযানটার। তা ছাড়া কমিউনিকেশনের সমস্যা অনেক কারণেই হতে পারে... হয়তো বা সি-বেডের প্রাকৃতিক কাঠামোর

কারণে আলভিনের সিগনাল বাধা পাচ্ছে। অপেক্ষা করে দেখা যাক কী ঘটে।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চরমে উঠল। নীচে যে সমস্যা হয়েছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকল না কারও। বিজ্ঞানীদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন ক্যাপ্টেন—করণীয় ঠিক করছেন।

লেফটেন্যান্ট অ্যারন বেকার চলে এল আপার ডেকে। গার্ড রেইলে ভর দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করল।

হঠাৎ দিগন্তে ছোট একটি বিন্দু উদয় হলো—ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। একটু পর জাহাজের আকৃতি পেল। কপালে ভাঁজ পড়ল বেকারের। বিনকিউলার এনে ভাল করে দেখল ওটাকে।

ছোট একটা ফ্রেইটার... পুরনো, দিন ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। সারা শরীরে মরিচার করাল থাবা পড়েছে, কতদিন রঙ করা হয়নি কে জানে! অযত্ন আর অবহেলার ছাপ প্রকট হয়ে আছে। স্টার্নের নীচে জাহাজের নাম অস্পষ্ট, শুধু বোঝা যাচ্ছে বন্দরের নাম—মাল্টা। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বেকার আন্দাজ করতে পারছে, আদপে ওটা মাল্টিজ ফ্রেইটার না হবারই সম্ভাবনা বেশি। এ-ধরনের জাহাজ সাধারণত জলদস্যুরা ব্যবহার করে, তারা সত্যিকার নাম-পরিচয় লিখে রাখে না খোলের গায়ে।

পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে লে. অ্যারন বেকারের দুনিয়াটা খুবই সরল। টাকার বিনিময়ে কাজ করে সে, আর কোনও ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। স্বপ্ন দেখে, প্রাচীন আমলের কুখ্যাত জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের একটা মূর্তি তৈরি করাবে কোনও একদিন। কারণ ব্ল্যাকবিয়ার্ড আর রক্তপিপাসু উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ড বেকারের জীবনে সাফল্য এনে দিয়েছে। নইলে পেন্টাগনের কোনও এক ডেস্কে কেরানি হিসেবে দিনপাত করতে হতো তাকে, বিষণ্ণ হৃদয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবতে হতো।

সি সিকিউরিটি সার্ভিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তিন কর্ণধারের একজন লে. অ্যারন বেকার। জাহাজ-মালিকরা জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভাড়া করে ওদেরকে। পুরোদস্তুর সিকিউরিটি টিম দেয় ওরা, জাহাজের ক্রু-দেরকেও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়। রমরমা ব্যবসা করছে গত ক'বছর ধরে; তবে শুরুটা উজ্জ্বল ছিল না।

দশ বছর আগে ট্রেইনিং এক্সারসাইজে আহত হয়ে নৌবাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়েছিল বেকারকে। ডেস্ক জবের সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ও সেটা গ্রহণ করেনি। মনেপ্রাণে একজন যোদ্ধা ও, কলম পেষার কথা ভাবতেও পারে না। কিছুদিন পর একই মনোভাবের আরও দুজন অবসরপ্রাপ্ত সিল-কমাণ্ডোর সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। তিনজনে মিলে গড়ে তোলে *সি সিকিউরিটি সার্ভিস।* ব্যবসার জন্য নয়, নিজেদের লড়াকু জীবনের নস্টালজিয়া হিসেবে। তবে সারা পৃথিবীতে জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ করে ওদের ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। শুরুতে বড় বড় মার্চেন্ট শিপের নিরাপত্তা দিত ওরা, ইদানীং সায়েন্টিক কমিউনিটিও তাদের রিসার্চ শিপে সিকিউরিটির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছে, তাই ব্যবসার নতুন মক্কেল পেয়ে গেছে বেকার। অবশ্য বিজ্ঞানীদের দোষ দেয়া যায় না। প্রতিটি রিসার্চ শিপে লাখ লাখ ডলারের ইকুইপমেণ্ট থাকে, তা ছাড়া শিপের ইঞ্জিন-জেনারেটর, খুচরা যন্ত্রাংশ, এমনকী লোহার শরীরটারও দাম আছে। জলদস্যুরা তাই রিসার্চ শিপকেও লোভনীয় টার্গেট মনে করে।

উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে গত একমাস ধরে চারজনের একটি টিম নিয়ে আটলাণ্টিসে থাকছে বেকার। জাহাজের বিজ্ঞানী ও নাবিকদেরকে আত্মরক্ষার নিয়মকানুন শেখাচ্ছে, নিজেরাও পালা করে পাহারা

নিয়েছে বেকো। গোস্ট সিটিতে আসার আগে দক্ষিণ সাগরে ছিল আটলান্টিস্, ওখানে জলদস্যুর উপদ্রব খুবই বেশি। সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হতো। আটলান্টিক ম্যাসিফে আসার কথা শুনে তাই খুশি হয়েছিল বেকার, এই এলাকায় পাইরেসির কোনও ইতিহাস নেই, ভেবেছিল শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু আচমকা আলভিনের গায়েব হয়ে যাওয়া, এবং তার পর পরই রহস্যময় এক জাহাজ উদয় হওয়ায় মন খুঁতখুঁত করছে ওর। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে।

ফ্রেইটারটা থেমে যাওয়া পর্যন্ত বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে রাখল বেকার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জাহাজের দৃশ্যমান প্রতিটি অংশ। বিস্মিত হলো একবারও কোনও মানুষের চেহারা দেখতে না পেয়ে। ক্রু-রা সব কোথায়? একজনও বাইরে নেই কেন? মনের খুঁতখুঁতানি বেড়ে গেল বেকারের। ল্যাডার বেয়ে ব্রিজে উঠে এল সে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

হুইলহাউসে ঢুকতেই রেডিওতে একটা আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'মে ডে! মে-ডে!!'

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে ক্যাপ্টেন ফিরে এসেছেন, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'মে-ডে রিসিভড্। দিস ইজ রিসার্চ ভেসেল আটলান্টিস। কী ধরনের বিপদে পড়েছেন, জানান।'

'মে ডে! মে-ডে!!' আবার বলা হলো রেডিওতে। প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

'ক্যাপ্টেন!' বলে উঠল ব্রিজ-উইঙের ওয়াচার। 'আগুন!'

পোর্টহোলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। ফ্রেইটারের ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। চোখে

বিনকিউলার লাগালেন তিনি। ধারণা করলেন, হোল্ডে লেগেছে আগুন।

'নোঙর তোলো,' ফার্স্ট অফিসারকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'জাহাজটার কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলতে শুরু করল আটলাণ্টিস। ফ্রেইটারের দুইশ' গজ দূরে পৌঁছে থামল। তীক্ষ্ণ চোখে ডেকের দিকে তাকাল বেকার, জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। খুবই অস্বাভাবিক। এতক্ষণে সমস্ত ক্রু-র বেরিয়ে আসার কথা, রেইলের কাছে এসে চেঁচামেচি করবে তারা উদ্ধার পাবার আশায়।

'কিছু বুঝতে পারছেন, ক্যাপ্টেন?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামালেন ক্যাপ্টেন। বিভ্রান্ত গলায় বললেন, 'না। কী যেন মিলছে না। আগুনে সবাই নিশ্চয়ই একসঙ্গে মারা পড়েনি? কয়েক মিনিট আগেও জাহাজটা চলছিল। ব্রিজ থেকে কেউ একজন ডিসট্রেস কল পাঠাচ্ছে। তা হলে বাইরে কেউ নেই কেন?'

'ঠিকই ধরেছেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক।'

'তদন্ত করে দেখা দরকার। একটা টিম পাঠাই, কী বলেন? ক্রু-রা হয়তো নীচের ডেকে আটকা পড়েছে। ওদেরকে উদ্ধার করতে হতে পারে।'

'আমার টিমকেই পাঠান,' বলল বেকার। 'বোর্ডিং এবং মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের ট্রেইনিং আছে আমাদের। ঝামেলা দেখা দিলেও ট্যাকেল করতে পারব।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আপনারা গেলে তো খুবই ভাল হয়। আলভিন নিয়ে এমনিতেই আমার মাথা খারাপ হবার দশা।'

ছোট একটা শাটল বোট নামানো হলো পানিতে। নিজের টিমকে ডেকের উপর জড়ো করল বেকার। বলল, 'যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছ তোমরা, এবার কাজে নামার পালা। অস্ত্র অ্যামিউনিশন আর ক্যামোফ্লাজ গিয়ার পরে রেডি হয়ে নাও।' ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ফ্রেইটারটা দেখাল। 'ওখানে যাচ্ছি আমরা।'

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল টিমের সদস্যরা। বেকারের মতই অভিজ্ঞ যোদ্ধা ওরা, ট্রেইনড্ কমাণ্ডো। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে অবসর নেবার পর ওরা যোগ দিয়েছে *সি সিকিউরিটি সার্ভিস*-এ। লড়াইয়ের সম্ভাবনা উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়েছে ওদের মধ্যে।

সৈনিক নয়, সাধারণ নাবিকের মত সাজ নিল কমাণ্ডোরা। জিন্স পরল, সঙ্গে নোংরা ওঅর্ক-শার্ট। হাত-মুখে মাখল তেল-কালি। আগ্নেয়াস্ত্র মুড়ে নিল কাপড় দিয়ে, দূর থেকে যাতে বোঝা না যায়। সংখ্যায় মাত্র চারজন হলেও ফায়ারপাওয়ারে যে-কোনও দস্যুদলের চেয়ে এগিয়ে আছে ওরা। বারো গেইজের একটা শটগান নিয়েছে বেকার, এক গুলিতে ওটা একটা মানুষকে দু'টুকরো করে দিতে পারে। ওর সঙ্গীদের হাতে রয়েছে কালো রঙের *কার-১৫* সাবমেশিনগান... *এম-১৬*-এর কম্প্যাক্ট ভার্শান। অ্যামিউনিশনের কোনও অভাব নেই। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের কাছে ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, কমাণ্ডো নাইফ, আর একটা করে পিস্তল আছে।

বোটে চড়ল কমাণ্ডো দল, আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালিয়ে অল্প সময়েই পৌঁছে গেল ফ্রেইটারের কাছাকাছি। হেলমে রয়েছে বেকার, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল। স্মল আর্মসের ফায়ারিং রেঞ্জের কিনারে পৌঁছে থামিয়ে ফেলল বোট, যাতে গোলাগুলি শুরু হলে দ্রুত সরে আসতে পারে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, কিন্তু

কেউ গুলি ছুঁড়ল না ওদেরকে লক্ষ্য করে। এবার একটা লাউডহেইলার তুলে নিল সে পায়ের কাছ থেকে, জাহাজের আরোহীদের উদ্দেশে ডাকাডাকি শুরু করল। ওদিক থেকে জবাব এল না কোনও।

এগোবার সিদ্ধান্ত নিল বেকার। ঢেউয়ের দোলায় ফ্রেইটারের বো একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছে। অনেক কষ্টে অ্যালুমিনিয়াম গ্র্যাপলিং হুক সহ একটা নাইলন বোর্ডিং ল্যাডার বো-র একপাশে, রেইলিঙে আটকানো গেল... তিনবার চেষ্টা করার পর। গ্যাস-মাস্ক পরে নিল ওরা, কাঁধে অস্ত্র ঝোলাল। তারপর রশির মই বেয়ে প্রথমে উঠে গেল বেকার। তার পিছু নিল বাকি সবাই। প্রকাণ্ড অ্যাঙ্কর উইঞ্চ-এর সামনে জড়ো হলো কমাণ্ডোরা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো ডেক, মাস্ক না থাকলে দম নেয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ত। চারপাশে নজর বোলাল বেকার, কিন্তু প্রাণের সাড়া পেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দলকে দু'ভাগ করল সে। ডেপুটিকে নিয়ে সে থাকবে সামনে, বাকি দু'জন পিছন থেকে কাভার দেবে ওদেরকে। পালা করে এই পদ্ধতিতে পুরো জাহাজে তল্লাশি চালানো হবে।

দলকে নিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে এগোল বেকার, সিঁড়িটা দেখতে অনেকটা ফায়ার এস্কেপ-এর মত, জানালাবিহীন ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের গায়ে লেগে আছে। তিন ডেক উপরে ওঠার পর ব্রিজে পৌঁছুল ওরা। ভিতরে কোন মানুষ নেই; তবে চার্ট, সেক্সট্যান্ট ও অন্যান্য নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। মনে হলো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কেবিনেটের ভিতর থেকে বের করে তছনছ করা হয়েছে ওগুলো। একটা উৎকট দুর্গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

বিস্মিত হলো বেকার, আগে কখনও এমন ব্রিজ দেখেনি সে। যন্ত্রপাতিতে বোঝাই, বাল্কহেডগুলোর গায়ে নানা রকম

ইলেকট্রনিক কনসোল শোভা পাচ্ছে। বাইরের চেহারা দেখে কল্পনাও করার উপায় নেই, জং-ধরা জাহাজটার ভিতর এমন অত্যাধুনিক সিস্টেম থাকতে পারে।

মেইন কনসোলটা পরীক্ষা করল কমাণ্ডো দলের ডেপুটি। 'জাহাজটা পুরোপুরি অটোমেটেড,' দলনেতাকে বলল সে। 'কোনও লিভার ধরে টানা-হেঁচড়া করতে হয় না, হেলমসম্যানকে দিতে হয় না কোর্স ইন্সট্রাকশন। খেলনার মত রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালানো যায়।'

'বলতে চাইছ, এখানে কোনও ক্রু নেই?' অবিশ্বাসের সুরে বলল বেকার।

'কনসোলে রিমোট অপারেশনের সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছি,' বলল ডেপুটি। 'তা ছাড়া এখন পর্যন্ত কাউকে দেখতে পাইনি আমরা।'

'তা হলে রেডিওতে সাহায্য চাইছে কে?'

ঝট্ করে কমিউনিকেশন রুমের দিকে ফিরল সবাই। দরজাটা বন্ধ। কাছে গিয়ে কান পাতল ওরা, আবছা একটা কণ্ঠ শোনা গেল ওপাশে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল বেকার, তারপর দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল কমিউনিকেশন রুমে। হাতের অস্ত্র সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে, সেফটি ক্যাচ অফ্ করা, গুলি ছুঁড়তে প্রস্তুত।

এই কামরাটাও খালি। তবে জ্যান্ত হয়ে আছে রেডিও ট্রান্সমিটার, আলো জ্বলছে ওতে। মাইক্রোফোনের সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছে একটি টেপ-রেকর্ডার, স্পিকারে বেরিয়ে আসছে পরিচিত কণ্ঠ... 'মে- ডে! মে-ডে!!'

'হোয়াট দ্য...' গাল দিয়ে উঠল এক কমাণ্ডো।

'তামাশা করছে কেউ আমাদের সঙ্গে!' বলল ডেপুটি।

বেকারের মাথার ভিতরে ততক্ষণে এগারো নম্বর

মহাবিপদসঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে। 'না!' ফিসফিসাল সে। 'ঠাট্টা না... এটা একটা ফাঁদ।'

'ফাঁদ!'

'কুইক!' চেঁচিয়ে উঠল বেকার। 'গেট ব্যাক, এভরিবডি! জাহাজে ফিরে চলো এখুনি!'

কমিউনিকেশন রুম থেকে বের হতে না হতে শোনা গেল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার... অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল সবার। পরমুহূর্তে ব্রিজের দু'পাশের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়ল হুইলহাউসে। পাঁই করে ঘুরল বেকার, ভাবনা-চিন্তা করল না, রিফ্লেক্সের বশে শটগান তুলে ট্রিগার চাপল। আর্তনাদ করে একটা মূর্তি আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে হামলা করল বাকি শত্রুরা। সংখ্যায় তারা অগণিত। কমাণ্ডোদের চিৎকার আর গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গেল তাণ্ডবের মাঝখানে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল বেকার, ঘটনার আকস্মিকতায় তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে। চকিতের জন্য কেবল লম্বা-সাদা চুল, হলুদ শ্বদন্ত, রক্তলাল চোখ আর লোমশ দেহের ঢল দেখতে পেল।

হাত থেকে শটগান কেড়ে নেয়া হলো, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কমাণ্ডো-নেতা। ওর বুকের উপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল বিশাল একটা দেহ। পচা, বোটকা গন্ধে দম আটকে এল বেকারের। খসখসে, লোমশ, শক্তিশালী দুটো হাত চেপে ধরল তার গলা। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

বিশ

কাঁচা রাস্তায় ধুলো ওড়াচ্ছে একটি অ্যান্টিক গাড়ি—*রোলস রয়েস সিলভার ক্লাউড।* ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। সামনে ফরাসি সীমান্তের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি। ছোট-খাট বেশ কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদী জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। এলাকাটা কৃষিপ্রধান। ড্রাইভ করছে, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে রানা—জায়গাটা অপূর্ব। দিদিয়ের দেশমের কাছ থেকে ধার করে আনা গাড়িটাও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গেছে খুব। ছবির মত এই দৃশ্যে আধুনিক যানবাহন বিসদৃশ ঠেকত।

রানার পাশে বসে আছে লুনা। খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসা উদ্দাম বাতাসে ওর সুন্দর চুল উড়ছে। দুর্ধর্ষ সঙ্গীর ঠোঁটে হালকা হাসি দেখে জানতে চাইল, 'হাসছ যে?'

'আমি কত ভাগ্যবান, তাই ভেবে,' বলল রানা। 'তাকিয়ে দেখো, কত সুন্দর জায়গা! ভ্যান গগের পেইন্টিঙেও এমন দৃশ্য দেখা যায় না। এর মাঝ দিয়ে দামি, অ্যান্টিক একটা গাড়ি চালাচ্ছি; পাশে অপরূপা এক সঙ্গিনী... ভাগ্য আর কাকে বলে!'

'ভাগ্য না, বলো নিয়তি,' ঠোঁট বাঁকাল লুনা। 'বেড়াতে আসিনি এখানে, কাজে এসেছি। যদি দু'জনে এখানে হারিয়ে

যেতে পারতাম, তা হলে নাহয় নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবতাম।'

'হারিয়ে যেতে কে মানা করছে?' রানা ভুরু নাচাল। 'একটু আগে চমৎকার একটা সরাইখানা পেরিয়ে এলাম। হাতের কাজ শেষ করে ওখানে ফিরে আসতে পারি আমরা। শুধু তুমি আর আমি... কয়েকটা দিন...

'লোভ দেখিয়ো না,' কপট মিনতি করল লুনা। 'পরিচয়ের পর থেকে এমনিতেই ডিনারের লোভ দেখিয়ে ঘোরাচ্ছ আমাকে। কই, এখনও তো নিলে না!'

'আরে... সেটাই তো বলছি। ওই সরাইখানায় ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট... সবকিছুই সারা যাবে।'

'ভাবার সময় দাও আমাকে,' হাসল লুনা। কোলের উপর রাখা ম্যাপে চোখ বোলাল। 'সামনে একটা চৌরাস্তা পড়বে, ওখানে ডানে মোড় নিয়ো।'

'জী, ম্যাডাম।'

একটু পরেই সরু একটা সাইডরোডে নেমে গেল সিলভার ক্লাউড। কিছুদূর এগোতেই দু'পাশে আঙুরের বাগান চোখে পড়ল—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, যেন শেষ নেই। মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তা। মিনিট পনেরো চলার পর একটা চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের দেখা পাওয়া গেল। সাইনবোর্ড ঝুলছে ফেন্সের গায়ে:

প্রাইভেট প্রপার্টি।

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

কয়েকটা ভাষায় লেখা আছে কথাটা। ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ নেই।

গেট রয়েছে একটা, সেটা হাট করে খোলা। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল রানা। দু'পাশ থেকে আঙুরের বাগান অদৃশ্য হলো, সেখানে উদয় হলো ঘন অরণ্য। জানা-অজানা নানা জাতের গাছ

শোভা পাচ্ছে, ঘন পাতার আচ্ছাদন পেরিয়ে সূর্যের আলো ঠিকমত ঢুকতে পারছে না। তাপমাত্রা কমে গেল ঝপ্ করে। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল লুনা।

'শীত লাগছে?' ব্যাপারটা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'জানালার কাঁচ তুলে দিই?'

'না, থাক,' মাথা নাড়ল লুনা। 'সবুজ প্রান্তর আর ক্ষেত-খামার দেখতে খুব ভাল লাগছিল। আচমকা জঙ্গলে এসে ঢুকব, তা ভাবতে পারিনি। কেমন যেন ভুতুড়ে পরিবেশ!'

একমত হলো রানা। সামনে গাছগাছালির ভাঁজে ভাঁজে আঁধারের রাজত্ব... অজানা কোনও বিপদ যেন ওঁৎ পেতে আছে। স্বস্তির আশায় হেডলাইট জ্বেলে দিল, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কিছুদূর যেতেই আলোকরশ্মিকে যেন গিলে খাচ্ছে অন্ধকার। দিনে-দুপুরে এমন ঘটতে পারে, তা ভাবাই যায় না।

কিছুক্ষণ পর দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করল। রাস্তা চওড়া হয়ে এল, দু'পাশে বুনো গাছপালার বদলে সযত্নে লাগানো ওক গাছের সারি। শাখা-প্রশাখাগুলো একে-অন্যের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে গেছে অনেকদূর উপরে গিয়ে—প্রাকৃতিক এক টানেলের সৃষ্টি করেছে। এ পথে মাইলটাক যাবার পর রাস্তা উঁচু হতে থাকল, এক পর্যায়ে গাড়ি বেরিয়ে এল গাছপালার আড়াল থেকে। সামনে ভেসে উঠল বিশাল এক প্রাসাদের অবয়ব—খোলা মাঠের মাঝখানে নিচু এক টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন রূপকথার বইয়ে আঁকা কোনও ছবি!

'মন দিউ!' মাতৃভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করল লুনা।

উঁচু প্রাচীর, গার্ড টাওয়ার আর টারেটের গায়ে আটকে গেছে রানার দৃষ্টি। বলল, 'মনে হচ্ছে টাইম মেশিনে চেপে মধ্যযুগের ট্রানসিলভ্যানিয়ায় পৌঁছে গেছি।'

'যা-ই বলো, প্রাসাদটা অদ্ভুত সুন্দর! দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই

আভিজাত্যের ছটা আছে।'

'ক্যাসল ড্রাকুলা সম্পর্কেও লোকে একই কথা বলত।' ঠাট্টা করল রানা।

মাঠ পেরিয়ে শ্যাতোর সীমানায় পৌঁছুল সিলভার ক্লাউড। অতিথিদের গাড়ি নিয়ে ভিতরে যাবার নিয়ম নেই, তাই বাইরে পার্কিঙের জায়গা রাখা হয়েছে। বৃত্তাকার একটা ড্রাইভওয়ে, নুড়িপাথর বিছানো, মাঝখানে একটা ভাস্কর্য—ঢাল-বর্ম পরা একদল যোদ্ধা মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। নিখুঁত শিল্প—নিষ্প্রাণ মূর্তির মুখে হিংসা, ক্রোধ আর বেদনার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গাড়ি পার্ক করল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে বেরিয়ে এল, তাকাল ভাস্কর্যের দিকে। 'চমৎকার!'

'চমৎকারের কী দেখলে?' প্রতিবাদ করল লুনা। 'জঘন্য! অতিথিদের এমন ভাস্কর্য দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানায় কেউ?'

'ক্যাসল ড্রাকুলা কি আর এমনি এমনি বলেছি?'

হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। ওদের জন্য ড্র-ব্রিজ নামিয়ে রাখা হয়েছে, ওটা ধরে পার হলো পরিখা। চকিতের জন্য নীচে তাকাল রানা। গাঢ়-সবুজ পানিতে ভরে আছে পরিখা, জলাভূমিতে যে-ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়, তেমন একটা গন্ধ ভাসছে।

গেটে কাউকে দেখা গেল না। হেঁটে আঙিনা পেরুল ওরা, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল সদর দরজার সামনে। পাল্লার গায়ে একটা ভারী লোহার কড়া ঝুলছে—কলিং বেলের বিকল্প। ভিতরে সঙ্কেত দেবার আগে নকশাকাটা দরজাটা ভাল করে দেখল রানা। মাঝখানে পারিবারিক প্রতীক খোদাই করা হয়েছে। ওটার দিকে ইঙ্গিত করে লুনাকে বলল, 'চিনতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল আর্কিয়োলজিস্ট। 'তিন-মাথা ঈগল। হেলমেট

আর বিমানের গায়ে আমরা যেমন দেখেছি।'

কড়া নাড়ল রানা। গুরুগম্ভীর একটা শব্দ ভেসে গেল বাড়ির ভেতরে। ও বলল, 'পিঠে কুঁজঅলা একজন বামন যদি দরজা খোলে, তা হলে খুব মানানসই হবে।'

'অমন কিছু ঘটলে আমি উল্টো ঘুরে দৌড় দেব,' বলল লুনা।

'দিয়ো, তবে আমার পথ আটকিয়ো না,' হাসল রানা।

ওদের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে সুস্থ-সবল এবং লম্বা-চওড়া এক যুবক দরজা খুলল। মাথা-ভর্তি সোনালি চুল, পরনে সাদা রঙের টেনিস পোশাক। সম্ভবত খেলতে যাচ্ছিল।

'আপনি নিশ্চয়ই মসিয়ো মাসুদ রানা,' হাত বাড়িয়ে দিল যুবক।

'জী,' হ্যাণ্ডশেক করল রানা। লুনাকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'আমার অ্যাসিসটেন্ট... ইসাবেলা দুঁমো।'

'আমি ফিলিপ বুভারি,' নিজের নাম বলল যুবক। 'নাইস টু মিট ইউ। শ্যাতো বুভারিতে স্বাগতম। কষ্ট করে প্যারিস থেকে এসেছেন বলে ধন্যবাদ। আমার মা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আসুন, প্লিজ।'

প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল রানা আর লুনা। কার্পেটে মোড়া একটা হলওয়ে ধরে ওদেরকে নিয়ে চলল ফিলিপ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আশপাশ দেখল দুই অতিথি। হলওয়ের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা রকম পেইন্টিং আর অ্যান্টিক শো-পিস। ছাত থেকে নেমে আসা শেকলের হুকে ঝুলছে বহুমূল্য ঝাড়বাতি। পায়ের নীচের গালিচা যেন নরম দূর্বাঘাস, তাতে নানা ধরনের নকশা উঁকি দিচ্ছে।

বড় একটা দরজার সামনে গিয়ে থামল ফিলিপ। নক করে ভেতরে ঢুকল, সঙ্গে রানা-লুনা। বিশাল এক কামরায় ঢুকল

ওরা। সাজসজ্জায় প্রাইভেট স্টাডির মত দেখাচ্ছে। এক প্রান্তে, ঘষা কাঁচের জানালার পাশে চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধা, বই পড়ছেন।

'মা,' কাছে গিয়ে বলল ফিলিপ, 'তোমার অতিথিরা এসেছেন। মসিয়ো রানা, আর ওঁর অ্যাসিসটেন্ট... মাদমোয়াজেল দুঁমো।'

মাথা ঘুরিয়ে হাসল আইরিন বুভারি, হাতের বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। লম্বা, একহারা দেহটা অবাক করল রানাকে—বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না। পঞ্চাশ হতে পারে, ষাট-সত্তর হওয়াও বিচিত্র নয়। ধূসর চুল, আর মুখের চামড়ায় সামান্য বলিরেখা ছাড়া বয়সের কোনও ছাপ নেই শরীরে। পরনে বিজনেস সুট আর স্কার্ফ, চলনে-বলনে আভিজাত্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। ব্যালেরিনার মত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে এল দুই অতিথির দিকে, হাত মেলাল। অবাক হয়ে রানা লক্ষ করল, মহিলার মুঠো অত্যন্ত শক্তিশালী।

'প্লিজ, বসুন,' সোফা দেখিয়ে বলল মাদাম বুভারি। ছেলের দিকে ফিরল। 'অনেকদূর থেকে এসেছেন ওঁরা। আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো।'

'নিশ্চয়ই, আমি বলে দিচ্ছি,' বলল ফিলিপ।

কয়েক মিনিট পরই ট্রলি-ভর্তি নাশতা আর পানীয় নিয়ে হাজির হলো এক ভৃত্য। খেতে রাজি হলো না রানা-লুনা, শুধু কফি নিল।

'আপনারা এখানে এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মসিয়ো রানা,' ভৃত্যকে বিদায় করে দিয়ে বলল মাদাম বুভারি।

শান্ত চোখে এখনও মহিলাকে জরিপ করে চলেছে রানা। চোখদুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর—তাতে অদ্ভুত এক প্রাণশক্তির আভাস পাওয়া যায়। টের পাওয়া যায়, চোখের মালিক অত্যন্ত

বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠুর। মিষ্টি করে হাসে মাদাম বুভারি, কিন্তু হাসিতে মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ পায় না; এক ধরনের রহস্য খেলা করে। বয়সের তুলনায় কণ্ঠস্বর যথেষ্ট ভরাট। কথা বলে শুদ্ধ ইংরেজিতে, কোনও আঞ্চলিক টান নেই।

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই, মাদাম,' বলল ও। 'বরং এত অল্প সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন বলে আমরাই কৃতজ্ঞ। আপনি তো খুব ব্যস্ত মানুষ।'

'কী যে বলেন! যে-বিষয়ে আপনি দেখা করতে চেয়েছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আছে নাকি? সত্যি বলতে কী, ভরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশটা আমার গ্রেট-আঙ্কল থিয়োডর বুভারির হতে পারে... এ-খবর শোনার পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আল্পসের উপর দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি আমি, কখনও ভাবতে পারিনি, নীচের বরফে আমার পূর্বপুরুষের কবর থাকতে পারে। ইয়ে... লাশটা যে থিয়োডরের, সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু নিশ্চিত?'

'লাশ আমি দেখিনি, তাই নিশ্চয়তা দিতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তবে গ্লেশ্যাল লেকে পাওয়া বিমানের সিরিয়াল নাম্বার ট্রেস করে মসিয়ো বুভারির খোঁজ পেয়েছি। অবধারিতভাবে লাশটা ওঁরই বলে মনে হচ্ছে।'

'হুম, হতে পারে,' চেয়ারে হেলান দিল মাদাম বুভারি। যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে। আপনমনে কথা বলতে থাকল। 'থিয়োডর হবারই সম্ভাবনা বেশি। ১৯১৪ সালে নিজের বিমান নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। উড়তে ভালবাসতেন, ফ্রেঞ্চ মিলিটারি ফ্লাইং স্কুল থেকে ট্রেইনিং নিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ পাইলট... অথচ কী দুর্ভাগ্য দেখুন! নিশ্চয়ই ফুয়েল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল বিমানটা।'

'এখান থেকে ভরমেয়ার গ্লেসিয়ার তো অনেক দূরে,' বলে

উঠল লুনা। 'ভদ্রলোক আল্পসে কী করছিলেন বলে মনে হয় আপনার?'

রহস্যময় হাসিটা ফিরে এল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'থিয়োডর একটু পাগলাটে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর সব কাজের ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনার ব্যাপারে কিছুটা খোঁজখবর নিয়েছি আমি। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট, নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর... রিয়েলি ইম্প্রেসিভ! বিশেষ করে সাবমেরিনের সাহায্যে যেভাবে উদ্ধার-অভিযান চালিয়েছেন ডরমেয়ারে, সেটার প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে।'

'আমার একার কোনও কৃতিত্ব নেই,' রানা বলল। 'বহু লোক সাহায্য করেছে ওখানে।'

'হুম, আরেকটা বিশেষণ যোগ করতে হবে দেখছি—বিনয়ী! যা হোক, ওখানকার ঘটনা পত্রিকায় পড়েছি আমি। বিজ্ঞানীদের উপর কে যেন হামলা করেছিল, তাই না? কে ওই লোক, কিছু জানা গেছে?'

'জী না। এখনও ওটা রহস্য। শুধু এটুকু বোঝা গেছে, লাশের রিকভারি ঠেকাতে গিয়েছিল সে। একটা স্ট্রংবক্সও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওখান থেকে।'

'স্ট্রংবক্স? কীসের?'

'খোলার সময় পাওয়া যায়নি। ভিতরে কী ছিল, কে জানে!'

'ইশ্‌শ্‌... ওটা পেলে হয়তো জানা যেত, থিয়োডর বুভারি আল্পসে কী করছিলেন।'

'আপনাদের পরিবারে কেউ কিছু জানত না?'

'উঁহুঁ,' একটু যেন বিব্রত হলো মাদাম বুভারি। 'আসলে... ওঁর সঙ্গে অদৃশ্য একটা দূরত্ব ছিল সবার। মানুষ হিসেবে থিয়োডর বুভারি ছিলেন... ইয়ে... ডিস্টার্বড্‌।'

'অসুস্থ?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

'মনের টানাপড়েনকে যদি অসুখ বলা যায় আর কী!' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম রুচির মানুষ—শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী। অন্য কোনও পরিবারে জন্ম নেয়া উচিত ছিল ওঁর। *মৃত্যুর সওদাগর* নামে পরিচিত পরিবারে কখনোই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি থিয়োডর।'

'সমস্যাটা বুঝতে পারছি,' বলল রানা।

'এরচেয়েও খারাপ নামে ডাকা হয়েছে আমাদেরকে, বিলিভ মি! নিয়তির সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস কী, জানেন? সূক্ষ্ম রুচির পাশাপাশি থিয়োডর বুভারি ছিলেন একজন জাত-ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধির সঙ্গে শুধুমাত্র একজন জাত-শিল্পীর তুলনা করা চলে। ওঁর হাতে আমাদের পারিবারিক ব্যবসার প্রচুর প্রসার ঘটেছে।'

'ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না? মননশীল ও বিবেকবান একজন মানুষ কেন অস্ত্রের ব্যবসার প্রসার ঘটাবে?'

'ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করতেন থিয়োডর, অস্ত্রকে নয়। তা ছাড়া একটা সমঝোতা করে নিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে। অস্ত্র যদি তিনি তৈরি না করেন, তা হলে অন্য কেউ করবে... ঠেকাবার উপায় নেই। তাই ব্যবসা চালিয়ে গেছেন, পাশাপাশি ব্যবসা থেকে আয় করা টাকা ঢেলেছেন শান্তিবাদী আন্দোলনে। ওঁর ভাষায়... এটা ছিল ব্যালান্স অভ ন্যাচারাল ফোর্স।'

'এভাবে নিজেকে কতদিন ধোঁকা দেয়া সম্ভব?'

'খুব বেশিদিন নয়। এক পর্যায়ে পাগলামি দেখা দেয় ওঁর মধ্যে... নিখোঁজ হবার অল্প কিছুদিন আগে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে। মাথামোটা গোঁয়ার রাজনৈতিক নেতারা সেই যুদ্ধ বাধাবার জন্য দায়ী; তবে হয়তো শুনেছেন, ওদেরকে উসকে দিয়েছিল অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা। টাকা কামানোর

সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পাচ্ছিল ওরা।'

'কাদের কথা বলছেন? বুভারি আর ক্রুপ পরিবার?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রানা।

যেন পচা জিনিসের গন্ধ পেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে ফেলল মাদাম বুভারি। 'ক্রুপ-দের সঙ্গে এক কাতারে ফেলে দয়া করে অপমান করবেন না আমাদেরকে। ওরা হলো সুযোগসন্ধানী ছোটলোক, অন্যের ঘাম আর রক্তের উপর নিজেদের সাম্রাজ্য গড়েছে। সত্যিকার অর্থে ঐতিহ্য বা বংশের মর্যাদা বলে কিছু নেই ওদের। অথচ বুভারি পরিবার ওদের চেয়ে কয়েকশ' বছরের পুরনো। অনাদিকাল থেকে হাতিয়ার তৈরির ব্যবসা করছে। আমাদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি, মসিয়ো রানা?'

'খুব বেশি না। শুনেছি নিজেদেরকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করেন আপনারা।'

হাসল মাদাম বুভারি। 'যে-ধরনের ব্যবসা করি আমরা, সেখানে গোপনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়।' উঠে দাঁড়াল সে। 'আসুন, আপনাদের একটা জিনিস দেখাই। বুভারি পরিবার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবেন... হাজার কথা বলা ছাড়াই!'

পথ দেখিয়ে আরেকটা কামরায় দুই অতিথিকে নিয়ে গেল মহিলা—দরজায় যথারীতি তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক।

'এটা শ্যাতোর আর্মারি, বা অস্ত্রাগার,' ভিতরে ঢুকে বলল মাদাম বুভারি। 'বুভারি সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড।'

বিস্মিত চোখে বিশাল কামরাটার ভিতর নজর বোলাল রানা আর লুনা। ক্যাথেড্রালের মত করে সাজানো হয়েছে অভ্যন্তর। সারি বেঁধে বসানো হয়েছে নিচু টেবিল, তাতে রাখা হয়েছে নানা ধরনের অস্ত্র। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে আইল। দেয়ালে প্রমাণ সাইজের খোপ আছে, সেখানে সেইন্টদের মূর্তির বদলে শোভা

[illegible] নানা ধরনের বর্ম। একেবারে সামনে, যেখানে বেদি থাকার কথা, সেখানে রয়েছে চারটে লাইফ-সাইজ ম্যানিকিন। ঘোড়ার পিঠে বর্ম পরা চারজন অকুতোভয় নাইট। হাতে ঝকঝকে ঢাল-তলোয়ার... হামলা করার ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে। এমনকী ঘোড়াগুলোর মাথা-ঘাড় আর দেহের আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা। অদ্ভুত সুন্দর!

প্রফেশনাল ভঙ্গিতে পুরো কালেকশন দেখছে লুনা। প্রশংসার সুরে বলল, 'আপনার এই সংগ্রহ তুলনাহীন। দুনিয়ার যে-কোনও বিখ্যাত মিউজিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।'

ঘোড়ায় চড়া নাইটদের সামনে গিয়ে থামল মাদাম বুভারি। বলল, 'এরা হচ্ছে সে-আমলের আর্মি-ট্যাঙ্ক। নিজেকে প্রাচীন যুগের পদাতিক সৈন্যের জায়গায় কল্পনা করে দেখুন। কোমরে এক টুকরো নেংটি, আর হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন। হঠাৎ যদি এই ভদ্রলোকদের ছুটে আসতে দেখেন, তা হলে কী অবস্থা হবে? উল্টো ঘুরে দৌড় দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন?'

'হুঁ, নিঃসন্দেহে চমৎকার জিনিস,' বলল লুনা। 'তবে অপরাজেয় বলা যাবে না। প্রযুক্তি আর রণকৌশলের উন্নতির সঙ্গে বর্মের কার্যকারিতা কমে গিয়েছিল। শক্তিশালী তীর দিয়ে যে-কোনও আর্মার ফুটো করা যেত। ডাবল ব্লেডের তলোয়ার দিয়ে সপাটে কোপ বসালেও বর্ম-শিরোস্ত্রাণ কোনও কাজে আসে না। সবচেয়ে বড় কথা, ফায়ার-আর্মসের বিরুদ্ধে এই লোহার পোশাক একেবারেই অচল।'

'আমাদের ব্যবসার চাবিকাঠিই ধরতে পেরেছেন আপনি, মাদমোয়াজেল,' বলল মাদাম বুভারি। 'উন্নতি এবং উন্নয়ন। আলটিমেট ওয়েপন বলে কিছু নেই। প্রতিদিনই নিত্যনতুন প্রযুক্তি কিংবা কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে... আগের প্রযুক্তিকে টেক্কা

দেয়ার জন্য! কাজেই আমাদের ব্যবসা কখনও থেমে থাকে না।' বাঁকা চাহনি নিক্ষেপ করল সে লুনার দিকে। 'আপনি তো দেখছি অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে অনেককিছু জানেন।'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লুনা। মিথ্যে অজুহাত দেখাল, 'আমার ভাই এসবের পাগল। ওর কাছ থেকে শিখেছি অল্প-স্বল্প।'

'অল্প বলে তো মনে হচ্ছে না। এনিওয়ে, এখানে যা দেখছেন, সবই বুভারি পরিবারের সৃষ্টি। এই-ই আমাদের ঐতিহ্য... আমাদের লিগেসি। বলুন, কেমন লাগছে?'

পাশের একটা টেবিলে রাখা হেলমেটের সারি দেখল লুনা। বলল, 'ক্র্যাফটস্‌ম্যানশিপে কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ডিজাইন তো অনেক পুরনো। মনে হচ্ছে দু'হাজার বছর...'

'ব্রাভো, মাদমোয়াজেল!' প্রশংসা করল মাদাম বুভারি। 'ঠিক আন্দাজ করেছেন। হেলমেটগুলো প্রি-রোমান যুগের।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনাদের পরিবার সে-আমলেও ছিল? কই... কেউ বলেনি তো!'

'এতেই অবাক হচ্ছেন?' ঠোঁট বাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কেউ যদি প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে আমাদের বানানো ছুরি-বর্শার ছবি আবিষ্কার করে, তাতেও চমকাবার কিছু নেই।'

'প্রাগৈতিহাসিক গুহা থেকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছুলেন কী করে, জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রাচীন সাইপ্রাসের কামার। মেডিটারেনিয়ানের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওখানে। আউটপোস্ট তৈরির জন্য ক্রুসেডার-বাহিনী পৌঁছায় সাইপ্রাস দ্বীপে, স্থানীয় কামারদের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়। নানা ধরনের অস্ত্র বানাতে দেয় ওদেরকে। শেষ পর্যন্ত সেরা কামারদেরকে নিয়ে আসে তাদের সঙ্গে। ওভাবেই সাইপ্রাস

থেকে ফ্রান্সে আসি আমরা। এখানে আসার পর অস্ত্র-নির্মাতাদের একটা সংগঠন গড়ে তোলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। সংগঠনের পরিবারগুলো পরস্পরের মধ্যে বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে একত্র হয়ে যায়, পরে জোট বাঁধে আরও দুটো সংগঠনের সাথে।'

'এ কারণেই আপনাদের প্রতীকে তিন-মাথা ঈগল?'

'আপনার নজর বেশ চোখা, মসিয়ো রানা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। তবে এখন আর তিন সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। বুভারি পরিবার বাকিদেরকে পিছনে ফেলে সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, প্রতীকটা শুধু বদলানো হয়নি ঐতিহ্যের কথা ভেবে।'

'হুম। তিন সংগঠন এক হবার পর কী ঘটল?'

'সারা ইয়োরোপের সেরা অস্ত্র-নির্মাতারা একত্র হলে কী ঘটে? একচেটিয়া ব্যবসা। চাহিদার শেষ ছিল না। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকায় কখনোই মন্দায় পড়তে হয়নি আমাদেরকে। নেপোলিয়নের ত্রিশ বছরের লড়াই, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ, তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ... লটারির টিকেটেও এমন কপাল খোলে না কারও।'

'থিয়োডর বুভারিও কী একই ধারায় চিন্তা করতেন?'

'না। আগেই বলেছি, যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন আমার গ্রেট আঙ্কল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। চেয়েছিলেন অস্ত্রের ব্যবসা থেকে পরিবারকে সরিয়ে আনতে। ততদিনে অনেকদূর এগিয়ে গেছি আমরা, *এম্পায়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ* নামে সারা দুনিয়ায় শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ফেলেছি। এমন একটা ব্যবসা মুখের কথায় বন্ধ করে দেয়া যায় না, কেউ তাতে রাজিও ছিল না। তা ছাড়া আমরা সরে এলেই যে যুদ্ধ থেমে যেত—এমনও তো নয়। লেনিনের ভাষায় ইয়োরোপ তখন বারুদভর্তি পিপেয় পরিণত হয়েছিল।'

ইতিহাস স্মরণ করল রানা। 'গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দের

হত্যাকাণ্ড ফুলকির মত সেই বারুদে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাই না?'

'ফার্দিনান্দের মৃত্যুকে ফুলকি না বলে অজুহাত বলাই ভাল। যুদ্ধটা যে করেই হোক, বাধানো হতো। ইন্টারন্যাশনাল আর্মস ইণ্ডাস্ট্রির মধ্যে গোপন চুক্তি হয়েছিল তখন—প্রতিটি গুলিবর্ষণ, কিংবা বোমা বিস্ফোরণের ফলে লাভবান হতো তারা। জার্মানদের লড়াইয়ে লাভ হয়েছে ক্রুপ-দের; আর মিত্রবাহিনীর লড়াইয়ে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রি-র। সজ্ঞানে এ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাননি থিয়োডর। কে জানে, ওঁর পরিণতির পিছনে হয়তো আত্মগ্লানি দায়ী।'

'বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা করেছেন থিয়োডর বুভারি?'

'প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো বটেই,' চেহারায় কাঠিন্য ভর করল মাদাম বুভারির। 'আমার গ্রেট-আঙ্কল ছিলেন একজন অপরিণামদর্শী আদর্শবাদী, মসিয়ো রানা। তার বিনিময়ে অকালমৃত্যু জুটেছে তাঁর কপালে। এতে কী লাভ হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়া লক্ষ লক্ষ সৈনিকের? একটা মৃত্যুও কি ঠেকাতে পেরেছেন তিনি? পর পর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, অর্থনীতির উত্থান-পতন ঘটেছে। আমরা যদি থিয়োডরের আমলে ব্যবসা গুটিয়ে নিতাম, তা হলে পথে পথে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরতে হতো এখন।'

'মৃত্যুর ব্যবসাকে এভাবেই জায়েজ করে নিচ্ছেন?' খোঁটা দিল রানা।

'এই দুনিয়া একটা কুরুক্ষেত্র,' মসিয়ো রানা,' উত্তেজিত গলায় বলল মাদাম বুভারি। '...আর যুদ্ধের ময়দানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। যার শক্তি বেশি, সে-ই টিকে থাকবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। আর শক্তির জন্য অস্ত্রের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। আমাদেরকে অপমান করার চেষ্টা

কারে লাভ নেই কোনও। পরিবারের এই ব্যবসার জন্য আমরা লজ্জিত নই, গর্বিত! পৃথিবীতে যতদিন হানাহানি আর হিংসা-বিদ্বেষ টিকে থাকবে, ততদিন আমরাও মাথা উঁচু করে থাকব।'

'মানে অনন্তকাল,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কেয়ামতের আগে হানাহানি থামবে না মানুষের মাঝে।'

'একজ্যাক্টলি,' হাসল মাদাম বুভারি। 'বুঝতেই পারছেন, চমৎকার একটা বাণিজ্যিক সেক্টর বেছেছি আমরা। সহজে যার পতন ঘটবে না। প্লিজ, ওভাবে তাকাবেন না। আমরা শুধু অস্ত্র তৈরি করি, কারও উপর সেগুলো ব্যবহার করি না। সত্যি বলতে কী, থিয়োডর বুভারির আদর্শ এখনও ধরে রেখেছি আমরা। চ্যারিটি আর মানবকল্যাণে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ যে-পরিমাণ টাকা খরচ করে, তা ছোটখাট অনেক রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেটের চেয়ে বেশি।'

'রূঢ় আচরণ করে থাকলে দুঃখিত,' ভদ্রতা রক্ষার সুরে বলল রানা। 'কাউকে অপমান করার ইচ্ছে নেই আমার। বরং নিঃসংকোচে পরিবারের ইতিহাস প্রকাশ করার সৎসাহস দেখানোয় আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ো রানা,' মাথা নোয়াল মাদাম বুভারি। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। লেকের তলা থেকে থিয়োডর বুভারির বিমানটা কি উদ্ধার করা যাবে?'

'একটু কঠিন, তবে যোগ্য একজন স্যালভেজারের জন্য অসম্ভব নয়। আপনি চাইলে আমি কয়েকজনের নাম দিতে পারি।'

'জী, অবশ্যই। অমন একটা পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন পানিতে ফেলে রাখা যায় না। আপনারা কি আজই প্যারিসে ফিরে যাবেন?'

'তোমাদের ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে, চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই।'

ভিন্ন একটা দরজা দিয়ে রানা-লুনাকে বের করে আনল মাদাম বুভারি। পোর্ট্রেট-গ্যালারির ভিতর দিয়ে নিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। পথিমধ্যে হঠাৎ থেমে গেল সে, শান্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল একটি তৈলচিত্রের দিকে। লম্বা লেদার-কোট পরা একজন ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে ওতে।

'আমার গ্রেট-আঙ্কল... থিয়োডর বুভারি,' বলল মহিলা।

পেইন্টিঙের মানুষটি অত্যন্ত সুদর্শন, এয়ার-মিউজিয়ামে দেখা একটা বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় প্রাচীন শিরোস্ত্রাণ—যেটা ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া গেছে!

বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল লুনার মুখ দিয়ে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। জানতে চাইল, 'কোনও সমস্যা, মাদমোয়াজেল?'

'না।' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল লুনা। 'আমি হেলমেটটা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। ওটা আপনার কালেকশনে আছে?'

শীতল দৃষ্টি ফুটল মাদাম বুভারির চোখে। 'না, নেই।'

তাড়াতাড়ির প্রসঙ্গটা ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা। বলল, 'ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে আপনার, বা আপনার ছেলের খুব একটা মিল দেখছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কারণ আমরা পূর্ণাঙ্গ বুভারি নই। আমার পিতামহ বাইরের মানুষ ছিলেন, থিয়োডরের বোনকে বিয়ে করে ওদের পদবী নেন। থিয়োডর গায়েব হয়ে যাবার পর পারিবারিক সাম্রাজ্যের হাল ধরতে হয় তাঁকে।'

'ইন্টারেস্টিং!' বলল লুনা।

গম্ভীরভাবে ওকে দেখল মাদাম বুভারি। তারপর বলল, 'চমৎকার একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। আপনারা

ডিনার পর্যন্ত থেকে যান না কেন? এমনিতেই কয়েকজন গেস্ট আসার কথা, পুরনো দিনের মত একটা কস্টিউম পার্টি হবে আজ রাতে। আপনারা তাতে যোগ দিলে খুব খুশি হব।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করল রানা। 'আমাদের সঙ্গে কোনও কস্টিউম নেই। তা ছাড়া ডিনারের পর রওনা দিলে প্যারিসে পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'তা হলে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান... আমার অতিথি হয়ে! কস্টিউম নিয়ে ভাববেন না, বাড়িতে দু'চার সেট বাড়তি পোশাক এমনিতেই রাখি আমরা। প্লিজ, অমত করবেন না। করলেও আমি শুনতে রাজি নই। আপনাদের সঙ্গ খুব ভাল লেগেছে আমার।'

'আপনার অনেক দয়া,' বলল লুনা। 'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল মাদাম দুভারি। 'আপনারা থাকছেন, দ্যাটস্ ফাইনাল। আমি যাই, রাতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি গে। নীচতলায় যত খুশি ঘুরে বেড়ান, মজার মজার অনেক কিছু দেখতে পাবেন। উপরে আমাদের লিভিং কোয়ার্টার। বিশ্রাম নিতে চাইলে কাউকে বলবেন, আপনাদের গেস্ট রুমে নিয়ে যাবে। গুড বাই।'

দুই অতিথিকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না মহিলা, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল। গ্যালারিতে দু'জনে একা হয়ে যেতেই সঙ্গিনীর দিকে ফিরল রানা। বলল, 'কী ঘটল ব্যাপারটা, বলতে পারো?'

''আমার প্ল্যান কাজে লেগেছে, মিস্টার!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল লুনা।

'প্ল্যান! কীসের প্ল্যান?'

'এখানকার আনাচে-কানাচে ঢুঁ মারার প্ল্যান। আর্মারিতে রাখা কারো প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের উপর নিজের এক্সপার্টিজ

দেখিয়েছি আমি। কৌতূহলী করে তুলেছি মহিলাকে। ফলাফল দেখতেই পাচ্ছ। আমাদেরকে থাকতে বলল সে। তদন্ত করার জন্য সময় পেলাম।'

'এই-ই তোমার প্ল্যান? বাঘের গুহায় ঢুকে নিজেকে টোপ বানানো?'

'কেন? অসুবিধে কী? তুমিই তো বলেছিলে, গ্লেসিয়ারের লাশ আর হেলমেট নিয়ে যতকিছু ঘটেছে, তার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে বুভারি পরিবারে। খালি হাতে ফিরে যেতে পারি না আমরা! অন্তত কাজে লাগার মত কোনও সূত্র তো পেতে হবে।'

'তুমি নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ, সেটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধে। পোর্ট্রেট দেখে যেভাবে চমকে উঠলে, তাতে মাদাম বুভারি বুঝে ফেলেছে—হেলমেটটা তুমি দেখেছ আগে।'

'ওটা ভুল হয়েছে, স্বীকার করছি। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে আসা চলে না। ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার, তা ছাড়া কস্টিউম পার্টিতে কী এমন ঘটবে? বাইরের লোকের সামনে আমাদের কোনও ক্ষতি করার সাহস পাবে না ওরা।'

'পার্টির পরেও ফিরতে পারছি না আমরা। সারারাত থাকতে হবে... সেটা ভুলে গেছ?'

'ওফ্! খালি নেগেটিভ কথাবার্তা! পরিস্থিতি খারাপ মনে হলে বাকি গেস্টদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব আমরা। কে বাধা দেবে? মাদাম বুভারিকে মোটেই ভয়ানক মানুষ বলে মনে হয়নি আমার। অন্তত সবার সামনে জোর খাটাতে পারবেন না আমাদের উপর।'

কনভিন্স হলো না রানা। অভিজ্ঞতা কম নয় ওর, মানুষ চিনতে জানে। বুঝতে পারছে, আইরিন বুভারির নম্র-ভদ্র খোলসের তলায় ধূর্ত ও নিষ্ঠুর আরেকটি সত্তা লুকিয়ে আছে। থিয়োডর বুভারির পোর্ট্রেটের সামনে লুনার প্রতিক্রিয়া দেখে

খানিকের জন্য সেই সত্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। কোনও সন্দেহ নেই, ভয়ঙ্কর মহিলাটির মাথায় কোনও একটা পরিকল্পনা রয়েছে ওদেরকে নিয়ে, সেজন্যেই ওদেরকে যেতে দেয়নি। মাদাম বুভারিকে লুনা ফাঁদে ফেলতে পারেনি, উল্টো নিজেই আটকা পড়েছে ফাঁদে।

মেয়েটাকে এ-মুহূর্তে আতঙ্কিত করতে চাইল না রানা। আরেকটু নিশ্চিত হওয়া দরকার। তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো শ্যাতোটা ঘুরে-ফিরে দেখি।'

পুরো নীচতলা দেখতে ঘণ্টাখানেক লাগল। নামেই দেখা; কারণ অর্ধেকের বেশি কামরার দরজা তালাবদ্ধ, ওরা খুলতে পারেনি। হতাশ না হয়ে প্রতিটি করিডোরে ঢুঁ মারল রানা, মনে মনে শ্যাতোর ম্যাপ তৈরি করবার চেষ্টা করল। পরে সেটা কাজে লাগতে পারে।

এক ঘণ্টা পর ওরা যখন সদর দরজার সামনে ফিরে এল, তখন রানার মনে খটকা লেগে গেছে। লুনাকে বলল, 'ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। এতবড় একটা প্রাসাদ... মেইনটেন করার জন্য অনেক স্টাফ থাকার কথা। অথচ দুই বুভারি, আর আমাদের নাশতা দিয়ে যাওয়া এক চাকর ছাড়া কাউকে দেখলাম না। অস্বাভাবিক লাগেনি তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, লেগেছে,' স্বীকার করল লুনা। 'কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। বন্ধ কামরাগুলোর ভিতরে হয়তো কাজ করছে ওরা।'

'ওটা আরেকটা অসঙ্গতি। দরজাগুলো বন্ধ কেন? বন্ধ কামরায় কী এমন কাজ করতে পারে ওরা, যা আমাদের দেখা বারণ? পরিবারের কালো ইতিহাসের বেশিরভাগটাই ফাঁস করে দিয়েছেন মাদাম বুভারি, সেটাও পছন্দ হয়নি আমার। আগ বাড়িয়ে ওসব বলে না লোকে।'

'আমরা সেই ইতিহাস বাইরে আর ফাঁস করতে পারব না, এমনটাই আশঙ্কা করছ তুমি?'

'আমার ভাবাভাবিতে কিছু যায়-আসে না। ওই মহিলা কী ভাবছে, সেটাই আসল কথা।'

'তোমার ধারণা ভুল না ঠিক, সেটা দেখতে হয় তা হলে।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল লুনা। হাতল ঘোরাতেই পাল্লা খুলে গেল। 'দেখলে? দরজায় তালা নেই, চাইলেই আমরা চলে যেতে পারি।'

'চলো দেখি, আসলেই পারি কি না দেখা যাক।'

শ্যাতো থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। আঙিনা পেরিয়ে মূল ফটকের সামনে গিয়ে থামল। ড্র-ব্রিজটা এখনও পরিখার উপর, কিন্তু আঙিনার প্রবেশপথে নামিয়ে রাখা হয়েছে মোটা গ্রিলের পাল্লা। বেরুনোর পথ রুদ্ধ। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা, ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা।

'কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। আঙুল তুলল ড্রাইভওয়ের দিকে।

ওদের গাড়িটা গায়েব।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পরিস্থিতি বড়ই নাজুক।
শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য পাতালে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা,
সেইসঙ্গে, জানা কথা, আছেন আপনিও।
ওকে যমের বাড়ি পাঠানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন।
ওদিকে বন্দি হয়েছে বিজ্ঞানী দম্পতি
আসিফ আর তানিয়া রেজাও। স্কটিশ উপকূলের
এক নির্জন দ্বীপে পুরো রহস্যের জড় খুঁজে পেয়েছে ওরা।
দেখা পেয়েছে মনুষ্য আকৃতির জলজ্যান্ত একদল পিশাচের।
নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।
কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, পাঠক, আপনি রানার সঙ্গে আছেন।
আপনি জানেন, চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি নয় ও,
রাজি নয় প্রিয় বন্ধুদেরকে মরতে দিতেও।
তাই এবার তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের জন্য।
কথা দিচ্ছি, দম ফেলবার ফুরসত পাবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০